রবীন্দ্র নজরুল-শরৎ স্মৃতি মাল্য

ভাষান্তর

সুজিত কুমার নাগ

কল্পনা সাহিত্য মন্দির
১৮, রজনী গুপ্ত রো
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :

হরেন্দ্রনাথ রায়

১৮, রজনী গুপ্ত রো,

কলিকাতা-৯

শুভ রথ যাত্রা, ১৩৯৫

জগদ্ধাত্রী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জ্যোতির্ময়ী পান

৩৭/১/২, কানেল ওয়েষ্ট রোড

কলিকাতা-৪

এতে যা আছে

১। নজরুল স্মৃতি মাল্য

২। শরৎ স্মৃতি মাল্য

৩। রবীন্দ্র স্মৃতি মাল্য

রবীন্দ্র নজরুল-শরৎ স্মৃতি মাল্য

উৎসর্গ

এপার বাংলা ওপার নরনারীদের কাছে
নজরুলের জীবন গাঁথা অমর হয়ে থাক সেই
উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই সংকলন গ্রন্থ।

॥ এই প্রসঙ্গে ॥

বিদ্রোহী কবি নজরুল আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অমর নাম। যে নামের আড়ালে একটি মহান পুরুষের সারা জীবনব্যাপী ত্যাগ আর নিষ্ঠার সাধনা।

রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য কবি নজরুল একদা বাংলা সাহিত্যের কমল বনে শতদল ফুটিয়েছেন। তার সৌরভ দিক থেকে দিগন্তে ছড়িয়েও এশিয়ার এপার প্রান্ত থেকে ওপার প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হয়ে আমাদের ভারতকে ধন্য করেছে।

কবি নজরুল, মানুষ নজরুল, ত্যাগী নজরুল, বিদ্রোহী নজরুল। সর্বোপরি নজরুলকে যাঁরা এতদিন ধরে দেখেছেন, মিশেছেন, অন্তরঙ্গ হয়েছেন তাঁদের স্মৃতির মালা নিয়েই 'নজরুল স্মৃতিমাল্য'! আমার সম্পাদনায় ইতিপূর্বে 'নজরুল স্মৃতিকথা' নামক একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল তখন কবি ছিলেন বাংলাদেশে আমাদের মধ্যে। আজ তিনি নেই, তাঁরই নামে নিবেদিত এই সংকলন গ্রন্থ। বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রেই জানেন যে, মলাটের রঙই বইয়ের আসল নয়, তারও একটা দিকে চিহ্নিত হয়। এই সংকলন বৈচিত্র্যময় ও বিচিত্রতর হয়ে সেই দাবী করতে পারে।

এই জাতীয় সংকলন গ্রন্থ সম্পাদনা করতে গিয়ে আমাকে নানা গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা থেকে সাহায্য নিতে হয়েছে এই সুযোগ তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা রইল।

এই সংকলন গ্রন্থে আমাকে নানাভাবে নানাদিক দিয়ে সাহায্য করেছেন শ্রদ্ধেয় বসুমতী সম্পাদক শ্রীগোপাল ভৌমিক, সাংবাদিক ও তরুণ সাহিত্যিক শ্রীভূপেন ভট্টাচার্য, বন্ধুবর শ্রীদেবকুমার দত্ত ও শ্রীমতী তাপসী নাগ, এজন্যে প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

যাঁদের জন্য এ সংকলন তাঁদের ভাল লাগলেই আমার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে মনে করব।

নববর্ষ ১লা বৈশাখ, ১৩৯৪ — সুজিতকুমার নাগ

—ঃ যাঁদের উদ্ধৃতি আছে ঃ—

বিদ্রোহী কবি	সুভাষচন্দ্র বসু
নজরুল ইসলাম	ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
নজরুলকে মনে রেখে	মুজফ্‌ফর আহমদ
নজরুল	সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
একটি স্মৃতি	নলিনীকান্ত সরকার
কবি নজরুল	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
স্মরণের তীর্থ পথে	আব্বাসউদ্দিন আহ্‌মদ
সৈনিক কবির কথা	ইব্রাহিম খাঁ
প্রকবি মানস	নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
প্রতিভার অভিশাপ : নজরুল প্রসঙ্গে	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
নজরুলের সঙ্গীত-চিন্তা	রাজ্যেশ্বর মিত্র
মানুষের কবি	কাজী মোতাহারা হোসেন
বিদ্রোহী কবি	প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়
কবির স্মৃতি তরঙ্গ	বেগম শামসুন্ নাহার মাহমুদ
কাজী সাহেব	নারায়ণ চৌধুরী
স্মৃতিচারণ	বুদ্ধদেব বসু
নজরুলের জীবনের শেষ কয়েকদিন	দাউদ হায়দার
আমার কাছে নজরুল	নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
বন্ধু নজরুল	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সৈনিক কবি	ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়
কবি কথা	গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

॥ প্রকাশকের নিবেদন ॥

বাংলা সাহিত্যে সুজিতকুমার নাগ প্রতিভাবান সাহিত্যিক ও সংকলন সম্পাদক হিসাবে তাঁর একটি বিশিষ্ট দান আছে। ইতিপূর্বে তাঁর সম্পাদিত সংকলন গ্রন্থগুলি পাঠক সমাজের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করছে। 'নজরুল স্মৃতিমাল্য' সংকলন গ্রন্থখানি সুজিতকুমার নাগের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল। এ সংকলনের যাবতীয় লেখা তিনিই সংগ্রহ করেছেন, এজন্যে তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বিদ্রোহী কবি

—সুভাষচন্দ্র বসু

কবি নজরুল যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে কবিতা লিখেছেন। নিজে বন্দুক ঘাড়ে করে যুদ্ধ করেছিলেন, কাজেই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সব কথা লিখেছেন। আমাদের দেশে ঐরূপ ঘটনা খুব কম, অন্য স্বাধীন দেশে বেশী। এতেই বুঝা যায় যে, নজরুল একজন জীয়ন্ত মানুষ।

কারাগারে অনেকে যাই, কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেই জেল-জীবনের প্রভাব কম দেখতে পাই। তার কারণ অনুভূতি কম। কিন্তু নজরুল যে জেলে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যে অনেক স্থানে পাওয়া যায়। এতেও বুঝা যায়, তিনি একজন জ্যান্ত মানুষ।

তাঁর লেখার প্রভাব অসাধারণ। তাঁর গান পড়ে আমার মতো বেরসিক লোকেরও জেলে বসে গাইবার ইচ্ছা হতো। আমাদের প্রাণ নেই, তাই আমরা এমন প্রাণময় কবিতা লিখতে পারি না।

নজরুলকে 'বিদ্রোহী' কবি বলা হয়। তাঁর অন্তরটা যে বিদ্রোহী, তা বুঝা যায়। আমরা যখন যুদ্ধে যাবো, তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাবো, তখন তাঁর গান গাইবো।

আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্বদাই ঘুরে বেড়াই। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'র মতো প্রাণমাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না।

কবি নজরুল যে-স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয়—সমগ্র বাঙালী জাতির স্বপ্ন।

নজরুল ইসলাম

—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

কবি নজরুল ইসলামের কবিতা দ্বারা বাংলা সাহিত্যে একটা নূতন সুর বেজে ওঠে। তিনি কবিতা ও প্রবন্ধ দ্বারা বাংলা সাহিত্যে নূতন ভাবধারা আনয়ন করেন। তাঁর সাহিত্যের তিনটি যুগ : প্রথমটি, জাতীয়তাপূর্ণ সাহিত্য; দ্বিতীয়টি, সাম্যবাদীয় সাহিত্য; আর তৃতীয়টি, তৎপরবর্তীকালের সাহিত্য, যাহা গজল প্রভৃতি গান-প্রধান সাহিত্য।

তিনি বলেছেন, 'অনেকই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছেন, 'ধূমকেতু'র পথকি? ···নীচে মোটামুটি 'ধূমকেতু'র পথনির্দেশ করছি। সর্ব প্রথম, 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ-টরাজ বুঝি না। কেননা ও কথাটার মানে বিভিন্ন মহারথী বিভিন্ন রকম করে থাকেন। পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে প্রথমে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সব কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে। আর এই বিদ্রোহ করতে হলে—প্রথম নিজেকে চিনতে হবে।' এ স্থলে কবির জাতীয়তাবাদীর রূপের পার্শ্বে সামাজিক-বিপ্লববাদী রূপ প্রকাশ পায়।

সাধারণতঃ যাকে 'জাতীয়তাবাদ' বলে তাঁর লক্ষ্য নয়। তাঁর এই আদর্শ 'ভারত—ভারতবাসীর জন্য' এই বুলিতে পর্যবসিত হয় নি। তাঁর লক্ষ্য মানবের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি। এইজন্য তিনি কেবল রাজনৈতিক পরিবর্তন চান নি, সমাজকেও সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত করতে চেয়েছেন।

সম্ভবতঃ তিনি কোন কোন ভূতপূর্ব বৈপ্লবিকেশ সহিত পরিচিত হন এবং তাঁদের অতীত দিনের কার্যের কাহিনী শ্রবণ করেন। যখন ৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী' প্রকাশিত হয় তখন কবির পুস্তক হইতেছে 'কুহেলিকা'। এই পুস্তক অতি উচ্চ স্তরের সাহিত্য। এই নভেলে লেখক তথাকথিত হিন্দু সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিকের সঙ্গে মুসলমান যুবকেরও দেশপ্রেমনিত ত্যাগের অতি উচ্চাদর্শ করছেত। 'প্রথম-দা'র নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতার জন্য জমিদারপুত্র জাহাঙ্গীর প্রাণ বিসর্জন পর্যন্ত করতে দৃঢ় সঙ্কল্প ও শেষে দ্বীপান্তর

গমন, এই বর্ণনা ও যমুনার মিলনের ন্যায় সুমহান হয়েছে।

এই পুস্তকে কবি ভারতবর্ষ ও জাতীয়বাদের প্রচলিত অর্থের উর্ধে উঠেছেন। তাই তিনি বৈপ্লবিক নেতা প্রমুখের মুখ দিয়ে বলেছেন, 'আমার ভারত-মানচিত্রের ভারতবর্ষে নয় রে অনিম! আমার ভারতবর্ষ ভারতের এই মূক দরিদ্র নিরন্ন পর পদদলিত তেত্রিশ কোটি মানুষের ভারতবর্ষ। আমার ভারতবর্ষ মানুষের যুগে যুগে পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দনতীর্থ; ওরে, এ ভারতবর্ষ তোদের মন্দিরের ভারতবর্ষ নয়, মুসলমানের মসজিদের ভারতবর্ষ নয়—এ আমার মানুষের—মহামনুষের মহা-ভারত।'

নিরন্ন পদদলিত, শোষিত লোকদেরই দিয়ে যে ভারতবর্ষ, তা পরের যুগের কবির সাহিত্যে আরও পরিস্ফুট হয়। এই সময়ে কবিকে শোষিত সর্বহারা-দেরর প্রতিভূরূপে দেখতে পাই। তাঁর বীণায় নূতন ঝঙ্কার ধ্বনিত হয় তাই তিনি বলেছেন:

'সাম্যের গান গাই—

আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।'

পুনঃ এইরূপে তিনি 'কিষাণের গান,' 'শ্রমিকের গান,' 'সাম্যবাদের গান' প্রভৃতি তখনকার দিনে নব প্রতিষ্ঠিত 'লাঙল' পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। এসব গানে তিনি গণ-শ্রেণীদের দুঃখের কথা, তাদের উপর উচ্চশ্রেণীদের শোষনের কথা ওজস্বিনী ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এসব গানগুলি আজ সারা বাংলার সম্পত্তি। এতদ্ব্যতীত তিনি বুর্জোয়া সমাজের মাপকাঠি দ্বার পাপ-পুণ্যের বিচার করাকে ঘৃণা করে বলেছেন।

'যত পাপীতাপী সব মোর বোন, সব হয় মোর ভাই

অন্যের পাপ গণিবার আগে নিজেদেরে পাপ গোণো।'

তিনি আবার চোর-ডাকাতদের সম্বোধন করে বলছেন:

'কে তোমার বলে ডাকাত বন্ধু, কে তোমায় চোর বলে।

চারিদিকে বাজে ডাকাতি ডঙ্কা, চোরেরি রাজ্য চলে।

ছোটদের সব চুরি করে আজ বড়রা হয়েছে বড়

যারা যত বড় ডাকাত দস্যু, দাগাবাজ,

তারা তত বড় সন্ন্যাসী গুণী-জাতি-সঙ্ঘেতে আজ।'

এই সময়ে সাম্যের গান গাইবার কালে তিনি গেয়েছেন:

'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহীয়ান।

যাহারা আনিল গ্রন্থ কেতাব
সেই মানুষেরে মেরে পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল।
মূর্খরা সব শোনো, মানুষ এনেছে গ্রন্থ,
গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।'

এস্থলে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষার বড় কবি চণ্ডীদাসের সেই অমর বাণী 'শুনহে মানুষ ভাই, সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই' তারই সাহিত্যে আবার সেই ধ্বনি উত্থিত হয়। চণ্ডীদাসের সময়ের পর, বাংলা সাহিত্যের কত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে : কত ভাব-বন্যার স্রোত তাতে এসেছে, কিন্তু বর্তমান গণসমূহের কবি নজরুল ইসলাম যে নূতন রূপ সাহিত্যে প্রদান করেছেন তা অতুলনীয় ও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

নজরুলকে মনে রেখে

—মুজফ্‌ফর আহমদ

নজরুলের বাড়ীর অঞ্চলে সাধারণ মানুষের ভিতরে গানের ও নাচের দল ছিল। সেই সকল দলের প্রভাবে সে পড়েছিল। সে নিজে এই রকম দলে যোগও দিয়েছিল। এইভাবে তার সঙ্গীত-চর্চার আরম্ভ। জীবনে কোনো সময়ে সে এই চর্চা ছেড়ে দেয়নি। এম আবদুর রহমান সংগৃহীত তথ্য হতে জানা যায় যে, শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে পড়ার সময়ে নজরুল ইসলাম তার সঙ্গীতের জ্ঞানকে উন্নততর করার সুযোগ পেয়েছিল। এই স্কুলের সহকারী শিক্ষক শ্রীসতীশচন্দ্র কাঞ্জিলাল একজন সাহিত্যানুরাগী ও সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। নজরুলের সঙ্গীতানুরাগে পরিচয় পেয়ে তিনি তাকে মাঝে মাঝে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। কোনো কোনো সময়ে তিনি বাড়ীতেও নজরুলকে এইজন্য ডেকে নিয়ে যেতেন। এই মাস্টার মহাশয়ের নিকট হতে সে সঙ্গীতবিদ্যায় অপেক্ষাকৃত উচ্চ জ্ঞানলাভের সুযোগ পেয়েছিল।

জমাদার শম্ভু রায়ের পত্র হতে আমরা জানতে পারি যে, পল্টনের ব্যারাকে

ও নজরুলের সাহিত্য ও সঙ্গীতের চর্চা কোনদিন থামেনি। সেখানেও ভালো বাদ্যযন্ত্র পেয়ে সে বাজানোটাও বিশেষভাবে আয়ত্ত ক'রে নিতে পেরেছিল। সেখানেও সে সাহায্য করার লোক পেয়ে গিয়েছিল। যেমন, জমাদার শম্ভু রায় হুগলী শহরের হাবিলদার নিত্যানন্দ দে'র নাম করেছেন। তিনি নজরুলকে অরগ্যান্ বাজানো শিখিয়েছেন। সৈনিক ব্যারাকে গানের মজলিস আবার বসত নজরুলের ঘরের সামনে। তাতে সৈনিকরা 'চালাও পানসী বেলঘরিয়া,' ঘি চপচপ্ কাবলীমটর' ও 'দে গরুর গা ধুইয়ে' প্রভৃতি ক'রে আনন্দে ভেটে পড়তেন।

পল্টন হতে ফিরে আসবার পরেও নজরুল তার গানের চর্চা অবিরাম চালিয়ে গেছে। শুধু বুদ্ধিজীবি ও শিক্ষিত মহলে জনপ্রিয় না হয়ে সে জনসাধারণের ভিতরেও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তার গানই তার প্রধান কারণ। শ্রীযুক্তা মোহিনী সেনগুপ্তা একজন বয়স্কা ব্রাহ্ম মহিলা ছিলেন। তিনি পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের দু'একটি কবিতায় সুর দিয়ে তার স্বরলিপি প্রকাশ করেছিলেন। সে সময়ে বহু পত্রিকায় শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তার স্বরলিপি ছাপা হতো। আমি নজরুলের ফৌজ হতে ফিরে আসার দু'তিন মাসের ভিতরকার কথা বলছি। একদিন শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তার নিকট হতে নজরুল একখানা পত্র পেলো। তাতে তিনি তাকে অনুরোধ করেছিলেন যে, সে যেন গানের কায়দা-কানুনের কঠামোর ভিতরে গান লেখে। অর্থাৎ আস্থায়ী, অন্তরা সঞ্চারী ও আভোগ এই চারটি ভাগে ভাগ ক'রে গান রচনা করার কথা তিনি তাকে বলেন। এইভাবে গান রচনা করলে সেই গানের সুরারোপে ও স্বরলিপি তৈয়ার করার সুবিধা হয়, এই কথাও তিনি পত্রে লিখেছিলেন। তখনও তাঁর সঙ্গে নজরুলের মুখোমুখি পরিচয় হয়নি। সে যখন সত্যকার গান রচনা করেছিল তখন সম্ভবত শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তার উপদেশ সে মেনে চলেছিল। সম্ভবত বলছি এই কারণে যে সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার কোনো বিদ্যা নেই।

৮।১, পানবাগান লেনের বাড়ীতে নজরুল যখন বাস করতে এলো (১৮২৮ সালের শেষাশেষি হবে, মাসটা মনে করতে পারছিনে) তখন সে সঙ্গীতে সুপ্রতিষ্ঠিত। তার রচিত গান তারই দেওয়া সুরে সুর-শিল্পীরা তখন সর্বত্র গাইছেন। তার নূতন রচিত গজল গানগুলির জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বেশী। কিন্তু সঙ্গীতে নজরুল ইসলাম যতই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, ব্রিটিশ গ্রামোফোন

কোম্পানীর নিকটে সে ছিল সম্পূর্ণরূপে বর্জিত। যে ব্যক্তি রাজনীতিতে (রাজনীতি মানেই তখন ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম) যোগ দিয়েছে, তার জন্য জেল খেটেছে, তার সঙ্গে কি ক'রে ব্রিটিশ কোম্পানী যোগস্থাপন করতে পারে?

কিন্তু দেশের আবহাওয়া বদলে গিয়েছিল। গ্রামোফোন কোম্পানীও ছিল একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। ১৯২৮ সালে এই কোম্পানীর নিকটে চারিদিক হতে জিজ্ঞাসা আসতে লাগল যে, তাদের রেকর্ডে কাজী নজরুল ইসলামের গান নেই কেন? এই রকম জিজ্ঞাসা আসা খুবই স্বাবাভিক ছিল। সুর-শিল্পীরা যাঁরা গান দেশের সব জায়গায় গেয়ে বেড়াচ্ছেন, তাঁর গান গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে উঠবে না এটা কেমন কথা? কোম্পানীর টনক নড়ল। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, কাজী নজরুল ইসলামকে এড়িয়ে চলার মানেই হবে ব্যবসায়ের দিক হতে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া। কোম্পানীর কর্মকর্তারা এই অবস্থায় যখন নজরুলের ঠিকানা যোগাড় করতে যাচ্ছিলেন, তখনই তাঁরা খবর পেলেন যে, তাঁদের রেকর্ডের দু'টি গান তার লেখা। সুবিখ্যাত গায়ক শ্রীহরেন্দ্র ঘোষ নজরুলের দু'টি কবিতার অংশবিশেষ সুর দিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে গেয়েছিলেন। তখন তিনি কোম্পানীকে জানতে দেননি যে, এই দুটি গানের রচয়িতা কে? জানতে দিলে কোম্পানীর কর্তারা গান দুটি তাঁকে গাইতে দিতেন না। এখন কিন্তু খবরটি জানতে পেরে কোম্পানীর কর্তারা খুশীই হলেন। সঙ্গে সঙ্গে রচয়িতার পাওনা রয়্যালটির হিসাব ক'রে দেখা গেল যে, নজরুলের কয়েক শ'টাকা (কত টাকা আমার মনেনেই) পাওনা হয়েছে। এই টাকাটা তাঁরা লোক মারফতে সোজাসুজি নজরুলের নিকটে তার পানবাগান লেনের বাড়ীর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলেন। কোম্পানীর দ্বারা সে আমন্ত্রিতও হলো তার গান যেন গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে গাইতে দেওয়া হয়। এইভাবেই গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে স্থাপিত হয়েছিল নজরুলের প্রথম নূতন দিগন্ত। নজরুল বারবার গান গেয়েছে। গান সে লিখেও যাচ্ছিল। যতটা মনে করতে পারছি—তার গানের পুস্তক 'বুলবুল' তখন ছাপা হয়েছিল। বই হতে সে টাকা পেল এই প্রথম। তার সামনে একটা নূতন দিগন্ত খুলে গেল বই কি!

ক্রমশ একান্তভাবে সুরের রাজ্যে নজরুল তো প্রবেশ করছিলই, গ্রামোফোন কোম্পানীর নিমন্ত্রণে তার প্রেরণা আরও বেড়ে গেল। তখনই তার মনে এসেছিল যে, ওস্তাদ জমির খানকে তার বাড়ীতে দেখা গেল। একদিন তাঁর

সঙ্গে আমার পরিচয়ও নজরুল করিয়ে দিয়েছিল। তাঁর নামে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ১লা আশ্বিন (খ্রীঃ ১৬ই কিংবা ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২) তারিখে গানের পুস্তক 'বন-গীতি' উৎসর্গ করিতে গিয়ে নজরুল লিখেছে :

'ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত কলাবিদ আমার গানের
ওস্তাদ জমিরউদ্দীন খান সাহেবের দস্ত্ মোবারকে।'

এর সঙ্গে সে যে কবিতাটি লিখেছে তার শেষ দু'ছত্রও আমি এখানে তুলে দিলাম :

'সুর শা' জাদীর প্রেমিক পাগল হে গুণী তুমি
মোর 'বন-গীতি' নজরানা দিয়া দস্ত চুমি।'

'মোবারাক' আরবী ভাষার শব্দ। তার মানে শুভ। 'দস্ত' পারসী ভাষার কথা, মানে হাত। নজরুল যখন ১৯২৯ সালের শুরুতে ওস্তাদ জমির-উদ্দীনানের নিকট হতে গানের শিক্ষা নিচ্ছিল তখন তিনি গ্রামোফোন কোম্পানীতে সঙ্গীতের 'ট্রেনার'ও ছিলেন।

১৯২৮ সালে ২০শে মার্চ তারিখে ধরা পড়ে আমি যখন আবার জেলে গেলাম তখন দেখে গেলাম যে, কাজী নজরুল ইসলাম সম্পূর্ণ রূপে সুরের রাজ্যে প্রবেশ করেছে।

নজরুল ইসলাম একসঙ্গে গায়ক, সঙ্গীতের রচয়িতা ও সুর সংযোজনকারী। এই তিন গুণের সমন্বয়ে উনিশ শ' ত্রিশের দশকে আমাদের দেশকে সে অপূর্ব অবদান দিয়ে গেছে। সুরের সৃষ্টিতে সে অভূতপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। সঙ্গীত রচনায় তার তুলনা নেই নারায়ণ চৌধুরী লিখেছেন যে, নজরুল ইসলাম রচিত সঙ্গীতের সংখ্যা তিন হাজার। ১৯৬৪ সালে একজন বন্ধু শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর নিকট হতে শুনে এসে আমায় বলেছিলেন যে, নজরুল রচিত গানের সংখ্যা তিন হাজার নয়, চার হাজার। আমার যতটা মনে পড়ে নজরুল নিজেও একদিন তার গানের সংখ্যা আমায় তিন হাজার বলেছিল। ১৯৩৬ সালের শেষাশেষিতে কিংবা ১৯৩৭ সালের শুরুতে নজরুল আর আমি তার বাড়ীতে একদিন এক সঙ্গে খেতে বসেছিলাম। বহু বৎসর কলকাতা হতে আমায় অনুপস্থিত থাকতে হয়েছিল বলে আমি অনেক কিছুই জানতাম না। সেইজন্য খেতে বসে আমি নজরুলকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'তোমার লেখা গানের সংখ্যা কত, এক হাজার দেড় হাজার হবে?' নজরুল উত্তরে বলেছিল, 'প্রায় তিন হাজার।' শুনে আশ্চর্য হয়ে আমি তাকে আবার

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'বলছ কি তুমি? রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশী?' সে উত্তর দিয়েছিল, 'হ্যা'। আমি কোথাও রবীন্দ্রনাথের লেখায় পড়েছিলাম যে তাঁর লেখা গানের সংখ্যা আড়াই হাজার। যদি আমি ভুলে না গিয়ে থাকি তবে এই সময়ে নজরুল ইসলাম গ্রামোফোন কোম্পানীর গানের 'ট্রেনার ও হেড্‌ কম্পোজার' ছিল। ওস্তাদ জমিরউদ্দীনখানের মৃত্যু হওয়ার পরে সে-ই এই কাজে নিযুক্ত হয়েছিল।

নজরুল

—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবার সময় তেমন বড়লোককেও সমীহ করে যেতে দেখেছি,—অতি বাক্‌পটুকেও ঢেঁাক গিলে কথা বলতে শুনেছি—কিন্তু নজরুলের প্রথম ঠাকুর বাড়ীতে সে যেন ঝড়ের মত। অনেকে বলত 'তোর এসব দাপাদাপি চলবে না জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে, সাহসই হবে না তোর এমনভাবে কথা কইতে।'

নজরুল প্রমাণ করে দিলেন যে, তিনি তা পারেন। তাই একদিন সকাল-বেলা—'দে গরুর গা ধুইয়ে' এই রব তুলতে তুলতে তিনি কবির ঘরে গিয়ে উঠলেন—কিন্তু তাঁকে জানতেন বলে কবি বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্ট হলেন না

নজরুল ধর্মের চেয়ে মানুষকে বড করে দেখেছেন সব সময়, তাই ধর্ম-নির্বিশেষে নজরুলকে ভালবাসতে কারো বাধেনি।

কতদিন আমাদের বাড়ীতে গানের মজলিস বসেছে, খাওয়া-দাওয়া করেছি আমরা একাসে, গোঁড়া বামুনের ঘরের বিধবা মা, নজরুলকে নিজের হাতে খেতে দিয়েছেন, নিজের হাতে বাসন মেজে ঘরে তুলেছেন, বলেছেন, 'ও ত আমারই ছেলে—ছেলে বড় না আচার বড়?'

এই যে নজরুল আপানাকে সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেলেন তাঁর প্রাণের প্রাবল্যে, হৃদয়ের মাধুর্যের এই তো মানুষের সবচেয়ে বড় ধর্ম, বড় আদর্শের কথা।

একটি স্মৃতি

—নলিনীকান্ত সরকার

স্বার্থবিমুখ নজরুল কোনদিনই পারর্থপরতায় পরাঙ্মুখ ছিলেন না। মাত্র একটি ঘটনার কথা বলি।

দক্ষিণ কলকাতা একটি দুঃস্থা কন্যার বিবাহ। কোনরূপে দায় নির্বাহ করার আয়োজন চলছে।

কন্যাপক্ষ নজরুলের পরিচিত।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে নজরুল তার গাড়ী নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত। এসে বললেন, 'তোমার এখন কোন কাজ আছে? একটু এসো না আমার সঙ্গে।'

'কোথায় যাচ্ছো?'

নজরুল প্রথমে কিছুই ভাঙলেন না।

গাড়ী সটান চৌরঙ্গী অভিমুখে চলে থামলো 'বেঙ্গল-স্টোরস্'-এর সামনে। বেঙ্গল-স্টোরস্-এ নেমে তখন তিনি সমস্ত কথা প্রকাশ করলেন আমর কাছে।

হিন্দু-বিবাহের লৌকিক ব্যাপারের সঙ্গে নজরুলের বিশেষ পরিচয় ছিলো না, এইজন্য আমাকে সঙ্গে নিয়ে আসা।

'বেঙ্গল-স্টোরস্' থেকে নজরুল ফুলশয্যার তত্ত্বের বহু জিনিস কিনলেন। গাড়ী বোঝাই সেই সকল সামগ্রী কন্যার বাড়ীতে পৌছে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি।

কবি নজরুল

—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

পুত্র বুলবুলের মৃত্যুতে উন্মাদপ্রায় নজরুল। সে কী মৃত্যু কেন? অকাল মৃত্যু কেন? চারিদিকে এতো উৎসব-উজ্জ্বল জীবন সমারোহের মাঝে কেন এই অকাল-নির্বাপণ? এই শীতল সমাপ্তি? এই প্রাণোচ্ছ্বল সদানন্দ শিশু কি মরবে বলে এসেছিলো? প্রদীপটি স্থির শিখায় জ্বলতে না জ্বলতে কে তাতে নিঃশ্বাস ফেললো? কে সমস্ত কিছু নিবিয়ে দিলে এক ফুঁয়ে? কে সে? কোথায় সে? তার দেখা পাওয়া যায়? আমাকে সে পথের সন্ধান কে দেবে?

সহসা একদিন দেখলাম 'পথহারার পথ' নামে বইটির ভূমিকায় লিখেছে নজরুল: 'নিমন্ত্রিতা গ্রামে বিবাহ সভায় সকলে বর দেখছে, আমার ক্ষুধাতুর আঁখি দেখছে আমার প্রলয়-সুন্দর সারথিকে। সেই বিবাহ সভায় আমার বধূরূপিণী আত্মা তার চিরজীবনের সাথীকে বরণ করে নিল। অন্তঃপুরে মুহু মুহু শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনি হচ্ছে। শ্বেতচন্দনের শুচি সুরভি ভেসে আসছে, নহবতে সানাই বাজছে—এমনি শুভক্ষণে আনন্দবাসরে আমার সে ধ্যানের দেবতাকে পেলাম, তিনি এই গ্রন্থ-গীতার উদগতা শ্রীবরদাচরণ মজুমদার। তিনি বহু সাধকের পথ প্রদর্শক। সাধন-পথের প্রতিটি পথিক তাঁকে চেনে। কিন্তু যেদিন আমি তাঁকে দেখি, তখনও তিনি বিশিষ্ট কয়েকজন ছাড়া অনেকের কাছেই ছিলেন অপ্রকাশ।

আমার বহির্মুখী চিত্ত অন্তরে কার যেন অভাব বোধ করতে লাগলো। তখন ভারতে রাজনীতির ভীষণ ঝড় উঠছে—অসহযোগ আন্দোলনকে বাংলায় প্রলয়ঙ্কর রুদ্রের চেলারা ভ্রুকুটিভঙ্গে ভয় দেখাচ্ছে আমি ধূমকেতুরূপে সে রুদ্র-ভৈরবদের মশাল জ্বেলে চলেছি।

কিছুদিন পরে যখন আমি আমার পথ খুঁজছি তখন আমার প্রিয়তম পুত্রটি সেই পথের ইঙ্গিত দেখিয়ে আমার হাত পিছলে মৃত্যুর সাগরে হারিয়ে গেল। মৃত্যু এই প্রথম আমার কাছে ধর্মরাজরূপে দেখা দিলেন। ধর্মরাজ আমার হাত ধরে তাঁরই কাছে নিয়ে গেলেন, যাঁকে নিমন্ত্রিতা গ্রামে বিবাহ সভায় দেখে-

ছিলাম। ধ্যানে বসে আবিষ্টের মতো তাঁকে বাইশবার প্রদক্ষিণ করলাম। ধর্মরাজ আমার পুত্রকে—বুলবুলকে—শেষবার দেখিয়ে হেসে চলে গেলেন।'

'পথহারার পথ' শ্রীবরদাচরণ মজুমদারের লেখা। পথহারার পথ অর্থ যোগ-সাধনার পথ। কালক্রমে নজরুল আবার সেই পথের পর্যটক। নজরুল তাই শুধু যোদ্ধা নয়, সে আবার যোগী। তার যোগ আর যুদ্ধ একসঙ্গে। সে যুদ্ধযোগী, যোগীযোদ্ধা।

শ্রীঅরবিন্দ তাই। নেতাজী সুভাষ তাই। নজরুলও তাঁদের অনুগামী। শ্রীঅরবিন্দের মতো নজরুল আবার কবি।

লিখেছে নজরুল: 'আমি আমার আনন্দ-রস-ঘন। স্বরূপকে দেখেছি। কি দেখেছি, কি পেয়েছি আজও তা বলার আদেশ পাইনি। আজ তা গুছিয়ে বলতেও পারবো না, তবু কেবলই মনে হচ্ছে, আমি ধন্য হলাম, বেঁচে গেলাম। আমি অসত্য হতে সত্যে এলাম, তিমির হতে জ্যোতিতে এলাম, মৃত্যু হতে অমৃতে এলাম।'

ব্ল্যাক-আউটের রাতে নিবিড় অন্ধকারে একা-একা হেঁটে গিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ধ্যানে বসেছে নজরুল, আবার বিরজাসুন্দরীর অন্তিম শয্যার পাশে বসে ভক্ত হরিদাসের মত নাম কীর্তন করেছে। আর তার মুখে নাম শুনে গৌরার্পিতচিত্ত বিরজাসুন্দরী বলেছেন, 'আজিও, সংকীর্তন করে গোরা রায়। কোনো কোনো ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।' বিরজাসুন্দরী সেই ভাগ্যবতী।

স্মরণের তীর্থ পথে

—আব্বাসউদ্দিন আহ্‌মদ

১৯৩০ সনে প্রথম গান রেকর্ড করে কুচবিহারে আসি। ১৯৩১ সনে আবার কলকাতা যাই এবং স্থায়ী বসবাস শুরু করি। গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্সাল-ঘর চিৎপুর রোডে, কাজী সাহেব রোজই সেখানে যান। এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, 'কাজী সাহেব কোথায়?'

তিনি বললেন, 'পাশের ঘরে গান লিখছেন।' আমি ঢুকলাম। তিনি

মহা উৎসাহে বলে উঠলেন, 'আরে আব্বাস, তুমি কবে এলে? বস বস সর্বনাশ এ কী কাজী সাহেব! চেহারার একি পরিবর্তন! এক বৎসর আগে কুচবিহারে যে কাজী সাহেবকে দেখেছি তিনি যে এমনভাবে বদলে যেতে পারেন স্বপ্নেও ভাবিনি। তখন ছিলো ইয়া বড় গোঁফ, দোহারা চেহারা, মাথায় ঢেউ-খেলানো বাবরী। তাঁর মাথায় চুল ঠিকই আছে। কিন্তু—। চোখে আগে জ্বলতো বিদ্রোহের আগুন, এখন এসেছে শ্রাবনের জল। সামনে এগিয়ে কদমবুছি করলাম। তিনি বললেন, 'সবাই আমাকে কাজী সাহেব বলে, তুমি কিন্তু কাজীদা বলে ডাকবে। হ্যাঁ, তোমার জন্য গান লিখতে হয়। খাচ্ছা ঠিক হবে।'

'আচ্ছা ঠিক হবে' তো বললেন, কিন্তু যতবারই যাই গ্রামোফোন ক্লাবে ততবারই দেখি তাঁকে ঘিরে রয়েছেন অনেকে। আমি সঙ্কোচে কিছুই বলতে পারি না। পাশের ঘরে পিয়ারু কাওয়াল রিহার্সাল দিচ্ছেন উর্দু কাওয়ালী গানের। বাজারে সে-সব গানের কী বিক্রী! আমি কাজীদাকে বললাম, 'এমনিভাবে বাংলা কাওয়ালী গান লিখে দিতে পারেন আমার জন্যে?' গ্রামোফোন কোম্পানীর বাঙালী সাহেব বললেন, 'না না, ও ধরনের বাংলা গান বিক্রি হবে না' অবশেষে প্রায় এক বৎসর পরে সাহেব রাজী হতে কাজীদাকে বললাম, 'সাহেব রাজী হয়েছেন।' কাজীদা তক্ষুণি আমাকে নিয়ে একটা কামরায় ঢুকে বললেন, 'কিছু পান নিয়ে এসো।' পান নিয়ে এলাম! তিনি বললেন, 'দরজা বন্ধ করে বস।' ঠিক ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে লিখে ফেললেন, 'ও মন রমজানে ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ।' সুর-সংযোগ করে তখুনি শিখিয়ে দিলেন গানটা। বললেন, 'কাল এসো রেকর্ডের অপর পৃষ্ঠার জন্য আর একখানা গান লিখে দেবো।' পরদিন লিখলেন 'ইসলামের ঐ সওদা নিয়ে এলো নবীন সওদাগর।' রেকর্ড করলাম। সে গান বাংলার আকাশে-বাতাসে তুললো আলোড়ন। তারপর লিখে চললেন এইভাবে বহু ইসলামী গান।

দু'তিন বৎসর পরে একদিন রিহার্সাল রুমে বসে একা আমি দেশের একখানা পল্লী গান ভাওয়াইয়া গাইছিলাম। কাজীদা কখন এসে দরজায় দাঁড়িয়ে চুপ করে শুনছিলেন, টের পাইনি। গান শেষ করা মাত্র তিনি ঢুকে বললেন, 'আহা কী সুন্দর, কি মিষ্ট সুর! আব্বাস, আবার গাও—তো।' আমি গাইলাম:

'নদী নাম সই কচুয়া
মাছ মারে মাছুয়া
মুই মারী দিচোঙ ছ্যাকা পাড়া।'

কাজীদা বললেন, 'গাও, আবার গাও।' পাঁচ-ছ'বার গাইলাম। তিনি কাগজ কলম নিয়ে গান লিখতে বসে দশ মিনিট পরে কাগজখানা এগিয়ে দিলেন। 'দেখ তো, তোমার সুরের সাথে আমার এ গান ঠিক মিলে যায়নি?' আমি তাঁর লেখা গান গাইলাম:

'নদীর নাম সই অঞ্জনা
নাচে তীরে খঞ্জনা
পাখী সে নয় নাচে কালো আঁখি'

এর পর তিনি ভাওয়াইয়া গান শুনলে অস্থির হয়ে পড়তেন। তিনি গান শুনতে শুনতে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। আমি একটা গান লিখে একদিন কাজীদাকে গেয়ে শোনালাম:

'তোরষা নদীর পারে পারে ও
দিদি লো মানসাই নদীর পারে
আজি সোনার বঁধু গান করি যায় ও
দিদি তোরে কি মোরে কি
শোনেক দিদি ও,'

কাজীদা সেই সুরে লিখলেন:

'পদ্মদীঘির ধারে ধারে ও'

ভাওয়াইয়া সুরে লিখলেন:

'কুচ বরণ কন্যা রে তার মেঘ বরণ কেশ'
আমায় নিয়ে যাওরে নদী সেই সে কন্যার দেশ।'

পল্লী-সঙ্গীত লেখার অনুপ্রেরণা পেলেন। আমার জন্য আট-দশখানা পল্লী-সঙ্গীত লিখেছিলেন; তার মধ্যে 'বন্ধু আজো মনে পড়ে আম-কুড়ানো খেলা', 'গাঙে জোয়ার এলো ফিরে তুমি 'এলে কই', ওরে কে বলে আরবে নদী নাই', আরে ও দরিয়ার মাঝি, মোরে নিয়ে যারে মদিনা, এবং 'উঠুক তুফান পাপ দরিয়ায়, আমি কি তায় ভয় করি।'

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ। কিছুক্ষণ পরে খুব মেঘ করে বাদল এলো। কাজীদা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে কাগজ কলম ধরলেন। আধঘণ্টা পরে হারমোনিয়ামটি নিয়ে

গুন্‌গুন্‌ করে সুর ভাঁজতে শুরু করলেন। আমাকে তাঁর কাছে ডেকে বললেন, 'নাও, সুরটা তুলে নাও—বর্ষা আসছে' বর্ষার আবাহন-গীতি লিখলাম।' গান হলো :

'স্নিগ্ধ শ্যাম বেণী বর্ণ
এস মালবিকা
অর্জুনমঞ্জরী কর্ণে
গলে নীপ মালিকা
মালবিকা !!'

কাজীদার বাড়ীতে আমি বসে আছি। কারমাইকেল হোস্টেল থেকে চার-পাঁচজন ছাত্র এসে কাজীদাকে বললেন, 'কাজী সাহেব, আমাদের হোস্টেলে আসছেন তুরস্ক থেকে হালিদা এদিব হানুম, তাঁকে আমরা অভ্যর্থনা জানাবো, আপনাকে সভাপতি হতে হবে।' কাজীদা বললেন, আচ্ছা যাবো, আপনারা যান।' ছেলেরা চলে যেতে কাজীদা বললেন, 'জানো আব্বাস, এই হালিদা এদিব হচ্ছেন তুরস্কের নারী জাগরণের অগ্রদূতী। এঁর অভ্যর্থনা-সভায় নিশ্চয়ই যাবে। ওরা তোমাকে বললো না, হয়তো চেনে না, কিন্তু আমি বলছি—তুমি যাবে।' আমি বললাম, 'কাজীদা যাবো নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনি যাবেন আপনার কবিতার সওগাত নিয়ে, আমি কী নিয়ে যাবো?' তিনি বললেন, 'ও:---আচ্ছা।' তারপর কাগজ-কলম নিয়ে কী অপূর্ব গানই না লিখে দিলেন। বললেন, 'এ গানে তুমি নিজে সুর দেবে।' গান নিয়ে এলাম। কাজীদার গানে আমি সুর দেবো, এতবড়ো ধৃষ্টতা আমার নেই। অথচ তাঁর আদেশ। বাসায় হারমোনিয়াম নিয়ে বসলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমার বাসায় এলো ওস্তাদ জমিরউদ্দীন খাঁর ছেলে মরহুম আবদুর করিম খাঁ ওরফে বালী। বললাম, 'ভাই, উদ্ধার করো---এ যে বিরাট পরীক্ষা ; কাজীদার গান, আমাকে সুর দিতে বলেছেন। বালী প্রথম স্তবকে সুর সংযোগ করলো, তারপর বললো, 'এইভাবে করতে থাকো।' পরদিন সমস্ত গানটা যখন গেয়ে শোনালাম, কাজীদা শুনে তো মহা খুশী। গানটা হচ্ছে : 'গুণে গরিমায় আমাদের নারী।'

মুসলমানদের এক একটা পর্ব দিনে আমি কাজীদাকে অনুরোধ করতাম, 'কাজীদা, মোহর্‌রম মাস আসছে, মর্সিয়া লিখে দিন।' তিনি লিখেছেন ; 'মোহর্‌রমের চাঁদ এলো ঐ কাঁদাতে ফের দুনিয়ায়', 'ওগো মা ফতেমা ছুটে আয়, তোর দুলালের বুকে হানে ছুরি,' 'ফোরাতের পানিতে নেমে ফতেমা দুলাল

কাঁদে অঘোর নয়নে রে।' আসে ফাতোহা-দোহাজদাহম ; কবি লেখেন :

'নিখিল ঘুমে অচেতন সহসা শুনিনু আজান,
শুনি সে তক্‌বীরের ধ্বনি আকুল হল মম প্রাণ।
বাহিরে হেরিনু আসি বেহেশ্‌তী রোশনীতে রে
ছেয়েছে জমীন ও আসমান ;
আনন্দে গাহিয়া ফেরে ফেরেশতা হুর গেলেমান---
এলো কে---কে এলো ভূলোকে।
দুনিয়া দুলিয়া উঠিল পুলকে।

জাকাত সম্বন্ধে লিখতে বলেছি ; তিনি তক্ষুনি লিখে দিয়েছেন :

'দে জাকাত, দে জাকাত, তোরা দে রে জাকাত---
তোর দিল্ খুলবে পরে, ওরে আগে খুলুক হাত।

হজ-সম্বন্ধে লিখেছেন :

চল্ রে কাবার জিয়ারতে, চল্ নবিজীর দেশ :
দুনিয়াদারীর লেবাস খুলে পর রে হাজীর বেশ।

একদিন কাজীদা বলেন, 'আব্বাস, সুন্দর একটা গান লিখেছি, গানটা শেখো, খুব তাড়াতাড়ি রেকর্ড করতে হবে। গানটা হলো :

'ত্রাণ কর মওলা মদিনার---
উম্মত তোমার গুনাহ্‌গার কাঁদে
তব প্রিয় মুসলিম দুনিয়ায়
পড়েছে আবার গোনাহের ফাঁদে।
নাহি দান খয়রাত, ভুলে মোহ ফাঁসে
মাতিয়াছে সবে বিত্তরে বিলাসে ;
বসিয়াছে জালিম শাহী তখ্‌তে তব,
মজ্‌লুমের এ ফরিয়াদ আর কারে কব---
তলোয়ার নাহি নাহি আর
পায়ে গোলামীর জিঞ্জির বাধে।'

গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্সাল রুমে তাঁর গানের বড়ো-বড়ো খাতাগুলো পড়ে থাকতো। সেই খাতা থেকে কোনো-কোন নতুন কবি গান লিখে নিয়ে কাজীদার লাইন শুদ্ধ প্রায় হুবহু নকল করে নিজের লেখা বলে গ্রামোফোনে চালাবার চেষ্টা করতে লাগলো। কাজীদাকে বললাম সে-কথা। তিনি হেসে

বললেন, 'দূর পাগল, মহাসমুদ্র থেকে ক'ঘটি পানি নিলে কি সাগর শুকিয়ে যাবে? আর নবাগতের দল এক-আধটু না নিলে হালে পানিই বা পাবে কী করে?'

বিশ বৎসর প্রায় কাজীদার সাহচর্যে ছিলাম; এর মধ্যে একদিনও তাঁর মুখে পরনিন্দা শুনিনি।

—গেয়ে উঠলো তাঁর কণ্ঠ, দুর্গম গিরি, দুস্তর পারাবার পাপ হবার আহ্বান জানালেন তিনি—জিজ্ঞেস করলেন:

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেলো যারা
জীবনের জয়গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা,
দিবে কোন্ বলিদান?'

তারপর সত্যিকারের চারণের মতোই দুঃসাহসিক আশ্বাস দিলেন:

'এই গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর
উদিবে সে রবি আমাদের খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।'

চারণ কবি হয়ে পুনরায় ফিরে আসাই হয়তো সত্যিকারের নজরুল ইসলাম। হয়তো নজরুল ইসলামই বাংলার শেষ চারণকবি। চারণ কবির কণ্ঠ থেকেই বিদ্রোহী বিদ্রোহের সুর শিখে নেয় কবি, খুঁজে নেয় কবিতার উপাদান, রক্ত নেচে ওঠে সৈনিকের ধমনীতে। আর তারই স্মৃতি বহুদিন; বহু যুগ ঘুরে বেড়ায় আমাদের মনে।

সৈনিক কবির কথা

—ইব্রাহিম খাঁ

—প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। ইংরেজ-ফরাসী ইটালী-আমেরিকার রণক্লান্ত সৈন্যরা গৃহে ফিরেছে: পথে ঘাটে, হাটে মাঠে, শহরে-বন্দরে, বিজয়-অভিনন্দনে তাদেরকে অভ্যর্থনা করা হচ্ছে। দীর্ঘ-দিনের আশা-উন্মেষ বুক নিয়ে প্রতীক্ষমান এই উপমহাদেশ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চেয়ে আছে: হিন্দু-মুসলমান মিলে জগতের দিকে-দিকে লড়াইয়ের বিভিন্ন ময়দানে ইংরেজ পক্ষে জয়ের জন্য যে-অর্থ, যে-রক্ত যে প্রাণ দিয়েছে তার বিনিময়ে চায় তারা দেশের স্বাধীনতা—

ষোল আনা না হয় অন্ততঃ আংশিক। আর মুসলমানরা আরো চায় যে, তুর্ক সাম্রাজ্য রাখা হোক অক্ষুণ্ণ---যেমন জবান দেওয়া হয়েছিলো। ইংরেজ এর কোনটাতেই রাজী হতে পারলো না। তখন ধূমায়িত শুরু করলো দেশের স্বাধীনতা-সাধকদের অসন্তোষের অনির্বাণ বহ্নি।

দেশের এই ক্ষুব্ধ মুহূর্তে সহসা নজরুল ইসলামের কলমে নবজীবনের বাণী মূর্ত হয়ে উঠলো। মনে আছে, আমাদের বিদ্যালয়ের এক হিন্দু পণ্ডিত একদিন মহোল্লাসে এসে আমাকে বললেনঃ দেখুন দেখুন, একটা নতুন রকমের কবিতা—এ যেন রামধনুর বিচিত্র রূপসজ্জার জায়গায় জলন্ত পাখা-প্রহারে ঝিলিক দিয়ে বেড়াচ্ছে এক প্রদীপ্ত বিদ্যুতের দুরন্ত বলাকা! দেখলাম, তিনি 'শাত্তিল আরব' কবিতাটি নিয়ে দারুণ উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠেছেন। আমারও কাছে ও কবিতা তখন অদ্ভুতই লেগেছিলো। তখন সাকুল্য কবিতাটাই মুখস্থ হয়ে গেছিলো। এখনও দু-চার লাইন মনে পড়েঃ

'শাত্তিল আরব! শাত্তিল আরব! পূতঃ যুগে যুগে তোমার তীর
শহীদের লহু, দিলীরের খুন ঢেলেছে যেখানে আরব বীর।'
শমশের হাতে আঁসু আঁসু হেথা মূর্তি দেখেছি বীর নারীর।

আগুনের ভাষায় আমাদেরই এক ভাই মুসলমানের নিত্যব্যবহার্য শব্দ দিয়ে অপরূপ সুন্দর করে লিখতে পারে। মুসলমানের অতীত কীর্তি মহিমার কথা রক্তাশ্রুময় দরদ দিয়ে লিখতে পারে। এই একটি কবিতায় তা প্রমাণিত হলো। সেদিন এ কবিতার বিজলী জীবনের তরুণ পাতায় আগুনের অলিখিত আখেরে যা লিখেছিলো তা কি আজ সম্পূর্ণ মুছে গেছে? সবখানি যে মুছে যায়নি তা মনে করি এই জন্য যে আজো তো এ কবিতা পড়লে মন নেচে ওঠে, আজো কবির সাথে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলি আর বলিঃ

'শহীদের দেশ! বিদায় বিদায়! এ অভাগা আজ নোয়ায় শির।'

তরীকুল আলাম বলে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 'কোরবানী'কে বর্বর যুগের চিহ্ন বলে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তরীকুল আলাম ভালো লেখাপড়া জানতেন এবং পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁর দাবীও ছিলো, গর্বও ছিলো। অতি আধুনিকদের ভাষায় কোরবানী সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে তাতে তিনি যা বলেছিলেন, যতদূর মনে হয়, তার মর্ম এই যেঃ কোরবানী বর্বর যুগের হত্যারীতির চিহ্ন বই আর কিছুই নয়; আল্লাহ দয়াময়, তিনি এ হত্যায় খুশী হতে পারেন না। এ প্রবন্ধ পড়ে নজরুল ইসলামের কলম গর্জে উঠলো, নব্য তুর্করা তখন স্বাধীনতার জন্ত

অকাতরে জান কোরবান করছিলো। সেই ব্যাপারের সাথে মিলিয়ে তিনি লিখেছেন :

'ওরে হত্যা নয়, আজ সত্যাগ্রহ, শক্তির উদ্বোধন
দুর্বল ভীরু চুপ রহে, অহো খামখা ক্ষুব্ধ মন !!
ধ্বনি ওঠে রণি' দূর-বাণীর
আজিকার এ খুন কোরবানীর
দুম্বা-শির
রুম-মাসীর
শহীদের শির সেরা আজি---রহমান কি রুদ্র মন ?
ব্যাস, চুপ খামোশ রোদন।
এইদিন মীনা ময়দানে
পুত্র-স্নেহের গর্দা নে
ছুরি হেনে খুন ক্ষরিয়ে নৈ
রেখেছে আবা ইব্রাহীম সে পাওনা রুদ্র পণ ;
ছি ছি, কেঁপো না রুদ্র মন।'

এই জোরের কথা, এই যে প্রচণ্ড শক্তির ভাষায় ইসলামের অনুষ্ঠানের সমর্থন, আধুনিক বাংলা ভাষায় এ নতুন। এ কবিতাটি পড়তে পড়তে আমায় মুখস্থ হয়ে গেছিলো। আমার 'কামাল পাশা' নাটকে তলোয়ারধারী তুর্ক বালকের মুখ দিয়ে আমি সমর-সঙ্গীতরূপে এই গান গাইয়েছি।

'এলো তার পর 'খেয়াপারের তরণী।' পড়লাম :
'কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা ;
দাঁড়ী মুখে সারি গান 'লা শরীক আল্লাহ !'

আমি মুগ্ধ হলাম। যে পড়লো সে-ই মুগ্ধ হলো। ইসলামী শব্দকে বাংলা ভাষায় এমন চমৎকার রকমে হীরোর টুকরোর মতো বসিয়ে দেওয়া যায়,এ যেন কারো ধারণাই ছিলো না।

নজরুলের লেখায় এমনিভাবে বিস্ময়ের পর বিস্ময় দেখা দিয়ে তরুণ মুসলিম বাংলার মনকে মুগ্ধ করে ফেললো :

'নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া,
আম্মা লাল তেরী খুন কিয়া খুনিয়া'

এ উর্দু না বাংলা? আর এতো সুন্দর এ! তারপর চললো—

'বাজিয়ে নাকাড়া, হাঁকে নকীরের তূর্য,
হুঁশিয়ার ইসলাম, ডুবে তব সূর্য!'

অজ্ঞাতসারে পাঠকের কণ্ঠে উচ্চারিত হলো: মারহাবা নজরুল, মারহাবা।

'ওমর ফারুক,' 'খালেদ,' 'কামাল পাশা,'—কবিতার স্রোত বয়ে চললো। খালেদের শেষ লাইন মনে আছে; মনে থাকবে:

'খোদার হাবিব বলিয়া গেছেন: আমিবেন ইশা ফের,
চাই না মেহ্‌দী, তুমি এসো বীর হাতে লয়ে শমশের।'

তাঁর গজল, তাঁর গান, তাঁর কাব্যময় বক্তৃতা; তাঁর সাম্যবাদ, তাঁর কারাবরণ---এসমস্তই সে-আমলের মুসলিম যুবকদের মনে করেছিলো সুস্পষ্ট রেখাপাত। আমার মনের পাতায়ও যে তার ছায়া পড়েনি কেমন করে বলবো?

কবি মানস

—নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

খিলাফৎ আন্দোলন-কালে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব একাধিক কারণে স্মরণীয়। আত্মবিস্মৃত জাতি বহুদিন পরে শুনলো তার আশা-আকাঙ্খার কথা। নতুন করে পেলো তার ঐতিহ্যের পরিচয়।

স্বতন্ত্র তমদ্দুনের যে বৈপ্লবিক দাবীতে পাকিস্তান আন্দোলন সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অভিনন্দিত হয়েছিলো তার গোড়া পত্তন হয় এ সময় থেকেই।

বহু শতাব্দী ধরেই বাঙালী মুসলমান আরবী-ফরাসী মিশ্রিত যে বাংলা জবান গড়ে তুলেছিলো, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ষড়তন্ত্র যে ভাষার কণ্ঠরোধ করেছিলো কাজী নজরুলের বলিষ্ঠ লেখনীতে তার প্রকাশ দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলেন শিক্ষিত সমাজ। এমন কি জনসাধারণের মধ্যেও এই সাড়া পৌছোতে দেরী হলো না।

ইসলামের মরমীবাদ ও সুফীবাদ থেকে কাজী নজরুল যে উত্তরাধিকার

পেয়েছিলেন সেই ঐতিহ্যের প্রাণ-শক্তিই দেশের দুর্গত জনসাধারণকে বিপুল বেগে আকর্ষণ করলো মঞ্জিলের পথে।

'নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া
আম্মা! লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।'

অথবা :

'আবুবকর' উসমান, উমর, আলি হায়দার
দাঁড়ি যে তরণীর, নাই ওরে নাই ডর।
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি-মাল্লা,
দাড়ী মুখে সারীগান—লা শরীক আল্লাহ।'

কবির কাব্য যেমন আশ্বাসের বাণী করে আলো, তেমনি সে উদ্বুদ্ধ করলো জাতিকে নতুন চেতনায়। সেই সঙ্গে ইসলামের মানবতাবোধ, সাম্য ও সামাজিক ন্যায়-বিচার কবি-চিত্তে যে চেতনার স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করলো তার কাহিনী খিলাফৎ আন্দোলনের একটি অধ্যায়কে যেমন প্রাণবন্ত করে তুলেছিলো; বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও তেমনি জেহাদী ফরমান শুনিয়েছিলো।

এই অগ্নি-গীতির সঙ্গে গজল ও কাব্য-গীতি মধুর রসে জনসাধারণের চিত্তে অভিসিঞ্চিত হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামের গীতোচ্ছ্বাস একটি অচেতন জাতিকে ফিরিয়ে দিয়েছে তার হারানো সম্বিৎ।

বঙ্গ-ভঙ্গ, খিলাফৎ, অসহযোগ ও সন্ত্রাসবাদের পটভূমিতে যে কবি মানস গঠিত হয়েছিল, তার অশান্ত মনের প্রতচ্ছায়া দেখেছি আমরা তাঁর রচনায়। বাংলা সাহিত্যের একটা বিশেষ অধ্যায়ে রয়েছে তাঁর দ্বন্দ্ব-মুখর মনের ছাপ!

প্রতিভার অভিশাপ : নজরুল প্রসঙ্গে

—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সংসারে নির্গুণ মানুষের চাইতে গুণী মানুষের সংখ্যা বেশী। অধিকাংশ মানুষেরই কোন-না কোন থাকে বিষয়ে কিছু না-কিছু গুণপনা থাকে। কারো গানের গলা চমৎকার, কারো ছবি আঁকায় হাত, কেউ নৃত্যকুশলী, কেউ খেলা-ধুলায় পারদর্শী কেউ গল্প লেখেন। এমন কি কথাবার্তায়, আচার ব্যবহারে যে

মানুষকে খুবই সাধারণ মনে হয়, একটু খোঁজ করলে দেখা যাবে তিনিও নানা হাতের কাজে রীতিমতো ওস্তাদ। গুণের মধ্যে আবার স্তর-ভেদ আছে। গুণ এবং গুণপনা সমগোত্রের হলেও ঠিক সম-স্তরের নয়। গুণীজনরা কাউকে গুণবান বললে যতখানি বোঝায়, শুধু গুণপনা আছে বললে ঠিক ততখানি বোঝায় না, কথাটা একটু হালাকা হয়। তফাৎটা উৎকর্ষের। গুণপনার দৌড় খুব বেশী নয়----স্বল্প কাল স্বল্প পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ। গুণ একটু উঁচুদরের। সব সময়ে স্থান কালের সীমায় আবদ্ধ থাকে না, দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। একটু উচ্চাকাঙ্খীও বটে। শুধু কৃতিত্বে তার মন ওঠে না, সে চায় কীর্তি। যথার্থ গুণীজন বলতে যিনি বিশেষ কোন ক্ষেত্রে আপন গুণলভ্য—ধনবলে নয়, পদবলে নয়,ভুজবলে তো নয়ই! সে প্রতিষ্ঠার আয়ুষ্কাল গুণী ব্যক্তির জীবৎকালকে ছাড়িয়ে যায়।

বিদ্বান, পণ্ডিত, কবি, সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পি, নৃত্যশিল্প, শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবী, রাজনীতিবিদ---এঁরা সকলেই গুণীজন! উৎকর্ষের স্তরে উত্তীর্ণ হলে এঁদের সকলেরই কীর্তি এবং স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে। এঁরা শুধু কৃতী ব্যক্তি নন, এঁরা কীর্তিমান, কারণ এদের কিছু কিছু কীর্তি নিঃসন্দেহে বিনাশের হাত থেকে রক্ষা পাবে। এই যে গুনবানদের কথা বলছি এঁরা বিশেষ কোন ট্যালেণ্ট বা গুণের চর্চা করেছেন, তাতে পারদর্শিতা লাভ করেছে এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে গুণগ্রাহীদের মনে স্থান করে নিয়েছেন। চর্চা যত বাড়ছেন, কদর তত বাড়ছে। গুণগ্রাহীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ফলে গুণীর অবর্তমানেও গুণবানরা এভাবেই প্রতিষ্ঠাবান হন।

যে গুণের কথা বলা হল এও গুণের সর্বোচ্চ স্তর নয়। গুণ যখন আপনাকে বহু গুণে অতিক্রম করে যায় তখন শুধু গুণ বললে তার সবটুকু বলা হয় না। গুণের যেখানে চরম স্ফুরণ সেখানে গুণ কথাটা বড় বেশী নিরীহ নিষ্প্রাণ শোনায়। সেখানে সে একটা প্রচণ্ড শক্তিরূপে প্রকাশ পায়। সোজা কথায় গুণ সেখানে আগুন হয়ে দেখা দেয়। সমস্ত মানুষটাই একটা প্রজ্জলিত শিখার মতো জ্বলতে-থাকে। সে শিখার আভা চতুর্দিক আলোকিত করে। এই আভার নাম প্রতিভা। প্রতিভা কথাটাকে আমরা একটু ঢিলেঢালা ভাবে ব্যবহার করি। একটু উঁচু দরের ট্যালেণ্ট হলেই তা প্রতিভা বলে চালাই। ট্যালেণ্ট বা যখন স্বাভাবিকের মাত্রা ছাড়িয়ে উৎকর্ষে, বৈশিষ্ট্যে, বৈচিত্র, অভ্রভ্রান্তায় অনন্যতায়, সকলেই মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে তখন তা প্রতিভার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছোয়।

প্রতিভা জিনিষটা একটা আকস্মিক ফেনোমেনন-এর ন্যায়—কোন ধরা-বাঁধা বিধি নিয়মের বশীভূত নয়। এ জিনিস চর্চার দ্বারা পাওয়া যায় না। অর্জিত বিদ্যা নয়, প্রকৃতি-দত্ত শক্তি। শেক্সপীয়ার যে জ্ঞানের পরিচয়, দিয়েছেন, আমরা স্কুল-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ভাবে বিদ্যাচর্চা করে থাকি সেভাবে তা কখনই লভ্য নয়। সে জ্ঞান একমাত্র প্রতিভাবানের কাছেই ধরা দেবে। কারণ সে জ্ঞানের ভাণ্ডার যেখানে--book in brooks and sermons in stones---সেখান থেকে জ্ঞান আহরণের ক্ষমতা আমাদের নেই। সাহিত্য সংগীত, শিল্পকলায় যেখানেই অত্যুচ্চ ক্ষমতার প্রকাশ পেয়েছে, দেখা গিয়েছে সেখানে পূর্বার্জিত বিধিবদ্ধ শিক্ষার কোন প্রমাণ নেই। সেটা প্রতিভা থেকেই অর্জিত।

প্রতিভা প্রকৃতি-দত্ত শক্তি। প্রকৃতি দেবীর দানের হাত দরাজ। একমাত্র প্রতিভার বেলায় তিনি অতি মাত্রায় কৃপণ। দার্শনিক শোপেনহাওয়ার কথাটি বড় সুন্দর করে বলেছেন, প্রকৃতির আভিজাত্যবোধ বড় কড়া। মনুষ্য সমাজে আভিজাত্য সূচিত হয় বংশগৌরবে, ধনগৌরবে, পদগৌরবে---এ হেন অভিজাতের সংখ্যা শত সহস্র। কিন্তু প্রকৃতি দত্ত প্রতিভা-গৌরবে অভিজাতের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। কোটিতে একজন মেলে না। বাস্তবিকপক্ষে অনন্যসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী না হলে কোন মানুষকে ঠিক প্রতিভাবান নয় এর মধ্যে গুণের প্রকাশ যতখানি শক্তির প্রকাশ তার চাইতে ঢের বেশী। এ শক্তিটা সব সময়ে ঠিক স্বাবাবিকভাবে ক্রিয়া করে না শক্তি জিনিসটা স্বফাবতই একটু বেপরোয়া, উড়নচণ্ডী। শক্তির অধিকারী ব্যক্তি কতখানি একে আয়ত্তের মধ্যে রাখতে পারবেন, তারই উপর নির্ভর করবে এর চরিতার্থতা আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে অপচয়ের আশঙ্কা। প্রতিভার কুটিলা গতি---ও যে কখন কোন্ দিকে মোড় নেবে তার ঠিকানা নেই, অধিকারী পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। ভূতে পাওয়া মানুষ তো আর কিছু নয়—তার কার্যকলাপ অভূতপূর্ব। ইংরেজিতে এরূপ মানুষকে বলে---a man possesssed---কথাটা যে খারাপ অর্থে বলা হয় এমন নয়। বরং উল্টো---কথাটা গুণবাচক। কোন অসাধারণ শক্তির প্রেরণায় কোন মানুষ যখন অসাধ্য সাধান প্রবৃত্ত হন তখন খুব সঙ্গতভাবেই তাঁকে ঐ আখ্যা দেওয়া হয়। তবে এ শক্তির মধ্যে যে বিপদের বীজ নিহিত আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইংরেজী daemonic বা pemonic (গ্রীক মূল থেকে উদ্ভূত) শব্দটিতে এর ইঙ্গিত আছে। কোন আসুরিক শক্তির প্রাবল্যে অত্যদ্ভুত কার্য্যকলাপ সম্পর্কে শব্দটির ব্যবহার। পশ্চিমী জিজ্ঞে

ফাউস্ট কাহিনী এই অসাধ্যসাধিকা শক্তির প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। ফাউস্ট এর বিদ্যা বুদ্ধির অভাব ছিল না। কিন্তু তিনি তাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না, তিনি চেয়েছেন অসাধ্য সাধনের শক্তি। ফাউস্ট মানুষটাকে কেউ খারাপ বলবে না; কিন্তু আপন উদ্দাম শক্তিকে (প্রতিভাই বলা যেতে পারে) আয়ত্তে রাখতে পারেন নি বলে নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে এনেছিলেন। আধুনিক জীবনেও প্রতিভা যে ভয়াবহ ট্র্যাজেডি ঘটাতে পারে টমাস মান্ তাঁর ডক্টর ফাউস্টাস নামক উপন্যাসে তা দেখিয়েছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেকেই প্রতিভাকে অবিমিশ্র শুভঙ্করী শক্তি বলে মনে করেন না। তাঁদের মনে প্রতিভা কল্যাণ করে যতখানি তার চাইতে অকল্যাণ করে বেশী। অর্থাৎ প্রতিভাবানের পক্ষে প্রতিভা অনেক সময়ে অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়।

এ কথা নিশ্চিন্ত যে প্রতিভা একটা double-edged sword, এর দু দিকেই ধার; কাজেই একে ব্যবহার করতে হয় অতি সন্তর্পণে, সাবধানে; নতুবা হিতে বিপরীত হবার আশংকা। প্রতিভার দীপ্তি যেমন প্রতিভাবানের সকল কর্ম্মকে সমুজ্জ্বল করে তেমনি আবার প্রতিভার উত্তাপ প্রতিভাবানকে দগ্ধ করে ছাড়ে। নিরন্তর একটা অস্থিরতার মধ্যে থাকেন, শান্তিতে থাকতে জানেন না। স্বভাবতঃই দিধগ্রস্ত মানুষ; ছিটের মাত্রা একটু ছাড়িয়ে গেলেই মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দেয়। প্রতিভা জিনিসটা প্রকৃতপক্ষে একটা উন্মাদনার মত কাজ করে। শোপেনহাওয়ার যে বলেছেন প্রতিভাবানে এবং উন্মাদে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে সেটা মিথ্যা নয়। বহু যুগ আগেও প্লেটোও বলেছিলেন প্রতিভাবান মানুষ কখনই কথায়, কাজে নরম্যাল নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিউটনের সাময়িকভাবে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল, নীটশের পরিণতি আরো মর্মান্তিক। শোপেনহাওয়ার বলেছেন কেউ আবার আত্মঘাতীও হন ভ্যান গগ তার দৃষ্টান্ত। কেউ বা দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পড়েন পল গগ্যাঁর কথা মনে অকালমৃত্যুর দৃষ্টান্তও কম নয় শেলী, কীটস্, বায়রন দার্শনিক স্পিনোজা, আমাদের বিবেকানন্দ প্রত্যেকেই প্রতিভাবান এবং প্রত্যেকে অকালে গত। এ সূত্রে মাইকেল মধুসূদনেরও নাম করা যায়। তিনিও অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁরও অকাল মৃত্যুই বলতে হবে; তাছাড়া শেষ জীবনে দুঃসহ দৈন্য ভোগের মূলেও রয়েছে তাঁর প্রতিভা বিড়ম্বিত জীবন। অনেকদিন আগে একটি প্রবন্ধে বলেছিলাম যে ইংলণ্ডে রেনেসাঁসের প্রথম বলি মার্লো (ত্রিশ বছর পূর্ণ হবার আগেই মার্লোর অপঘাত মৃত্যু)। মধুসূদন যে বলে-

ছিলেন---আশায় ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়!' এ ছলনা প্রকৃতপক্ষে প্রতিভার ছলনা। আকাশ-চুম্বী আশা-আকাঙ্খা প্রতিভাবানের স্বভাবগত।

প্রতিভার রুদ্র মূর্তির কথাই কেবল বলছি। কিন্তু রুদ্র মূর্তির দক্ষিণ মুখও আছে এবং প্রতিভাবান মানুষরা সেই দক্ষিণ থেকে কখনই বঞ্চিত হন না। দুঃখ পান, দুর্ভোগে ভোগেন কিন্তু যখন যে অবস্থাতেই থাকুন প্রতিভাবানের অসামান্যতা কেউ স্বীকার করতে পারে না। মুখে স্বীকান করুন বা সকলেই মনে মনে জানেন যে ইনি আর সকলের মতো নন, ইনি ভিন্ন, ইনি অনন্য। তবে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে প্রতিভার স্বভাবে একটা অতিশয়তা আছে। আপন শক্তির' পরে অগাধ বিশ্বাস এবং বোধকরি নেই কারণে কথায় কাজে একটু স্পর্ধার ভাব প্রকাশ পায়। প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত বলেই প্রগলভতা প্রকাশ পেলেও সেটা খুব একটা দৃষ্টিকটু কিংবা পীড়াদায়ক হয় না। বরং বললে অন্যায় হবে না যে, প্রগলভতা এবং স্পর্ধিত স্বভাব মানুষটার আকর্ষণ খানিকটা বাড়িয়েই দেয়। আসল কথা, প্রতিভানকে ভালোমন্দ সবকিছুতেই মানিয়ে যায়। কিন্তু বিপদের আশঙ্কটা হচ্ছে প্রতিভাব একটা অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ আছে---চকিতে মনকে চমকৃত করে, লোকে নির্বিচারে তারস্বরে সব কিছুর তারিফ করতে থাকে। মাথা ঠিক রাখা দায় হয়। উর্দ্ধশ্বাসে চলে, স্পর্ধার সঙ্গে বলে, দুঃসাধ্যের প্রয়াস করে, অসাধ্যের স্বপ্ন দেখে। অতি দ্রুত চলতে গেলে অচিরে দম ফুরিয়ে যায়, ঝড়ের দুর্দমতা এক সময়ে নিস্তেজ হয়ে আসে। প্রতিভাও ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে আসে। ফাউষ্ট-এর শক্তির খেলা যে একটা সময়-সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল সেও একটা symbolic ব্যাপার---শক্তিরও যে সীমা আছে সে কথাটা স্মরণ করিয়ে দেয়।

শক্তিকে ইস্পাতের ন্যায় তাপ শৈত্যের সহনশীলতায় টেম্পার করে নিতে হয়, তবেই সে শক্তি উন্নত ধরণের কাজে ব্যবহারের উপযোগী হয়। এ না হলে শক্তির যথাযোগ্য ব্যবহার সম্ভবই নয়, অপচয়ের আশঙ্কাই থাকে বেশি। ওকে সামলে রাখাই দায়। অস্থির অশান্ত ভাবটাকে দমন করে একটু যদি শিষ্ট-শান্ত-সৌম্য ভাব এনে দেওয়া যায় তাহলেই ওর প্রসন্ন রূপটি ফুটে উঠবে। এই যে টেম্পার করে নেওয়ার কথা বলছিলাম সেই অন্যকিছুই নয়, শক্তির সঙ্গে সাধনার যোগ। সহজ নয়; কিন্তু যেখানেই যোগাযোগটি ঘটেছে সেখানেই স্থৈর্যে-ধৈর্যে-মাধুর্যে প্রতিভা যথার্থই শক্তিরূপিণী হয়ে দেখা দিয়েছে অর্থাৎ সর্বার্থসাধিকা শক্তিরূপে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এর প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। শক্তির মধ্যে

একটা বড় উচ্ছৃঙ্খল ভাব আছে ; যত বেশী শক্তি তত বেশী প্রলোভন, সেজন্য তাকে বশ মানিয়ে নিতে হয় নইলে বিপত্তি ঘটে। রবীন্দ্রনাথ তার অপরিসীম শক্তিকে আপন বশে রেখেছিলেন। অনন্ত-মন সাধনার বলেই সেটি সম্ভব হয়েছিল। শক্তি এবং সাধনার এমন শুভ সংযোগ পৃথিবীতে কমই ঘটেছে। রূপ, গুণ, ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিপত্তি সমস্তই পথে পথে প্রলোভনের ফাঁদ পেতে রেখেছিল কিন্তু তার আপন কক্ষপথ থেকে তাঁকে এতটুকু বিচ্যুত করতে পারি নি। জগৎ-জোড়া খ্যাতি লাভ করেও মতি-ভ্রম তাঁর ঘটেনি। শক্তি এবং খ্যাতি দুটি:কই তিনি সবিনয়ে গ্রহণ করেছেন। অপর শেক্সপীয়ার। মানব জীবনের নিগূঢ়তম রহস্যকে তিনি মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন, মানুষের গভীরতম দুঃখকে হৃদয়ঙ্গম করেছেন, সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছেন। একের পর এক ট্র্যাজেডি রচনা করে শেক্সপীয়ারকে একে একে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ঐ শেক্সপীয়ার যেন এক অত্যুচ্চ গিরিশিখরের কিনারায় দাঁড়িয়ে জীবন রহস্যের অতল গহ্বরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। এ যে কোন মুহূর্তে মন এবং মস্তকের ভারসাম্য হারিয়ে চরম বিপদ ঘটাতে পারত। একান্ত স্থিতধী ব্যক্তি ছিলেন বলেই ধীরে মস্তিষ্কে এ কাজ করা সম্ভব হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বেলায় যেমন ঘটেছে শেক্সপীয়ারকেও তেমনি সমব্যবসায়ীদের কাছে থেকে অনেক নিন্দাবাদ এবং কটুবাক্য শুনতে হয়েছে কিন্তু তাতে শেক্সপীয়রের বিন্দুমাত্র চিত্তবিকার ঘটেনি। বরং সমসাময়িকদের মুখে gentle shakespeare কথাটি অত্যধিক প্রচলিত ছিল। শক্তির পূর্ণ বিকাশের জন্যে যে মানসিক ধৈর্য এবং প্রশান্তির প্রয়োজন গ্যয়টে এবং টলস্টয়ের মধ্যেও তা দেখা গিয়েছে। যৌবনের চাঞ্চল্য গ্যয়টের মধ্যে কিছু কম ছিল না কিন্তু উদ্দামতাকে তিনি দমন করেছিলেন।

ক্ষেত্রবিশেষ প্রতিভা থেকে ও তার যথাযোগ্য ব্যবহার হয় না। খামখেয়ালী-পনার দরুণ অপচয় ঘটে প্রচুর। প্রতিভার মধ্যেই একটা লক্ষ্মীছাড়া অসংসারী ভাব আছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে দেশে বিদেশে বহু জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে কিন্তু তাঁর বড় দাদার মতো পণ্ডিত ব্যক্তি তিনি কমই দেখেছেন। একাধারে কবি এবং দার্শনিক কিন্তু তিনি যে প্রতিভার অধিকারী ছিলেন সে তুলনায় অতি সামান্যই তিনি দিয়ে যেতে পেরেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যায় সমান পারদর্শিতা ছিল ; কিন্তু অভিনিবেশের

অভাব তাঁর সৃজনীশক্তির যথোচিত ব্যবহার হয়নি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে এঁদের প্রতিভায় গৃহস্থালি ছিল না। এ সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে এক সময়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে প্রতিভার একটি শিখা ধূমকেতুর মত যেন তার পুচ্ছটি বুলিয়ে গিয়েছে! একই সময়ে একই পরিবারে এমন বহুবিধ গুণের সমাবেশ বিস্ময়কর মনে হয়। কিন্তু সে অগ্নিশিখায় কেউ স্বর্ণবর্ণে সমুজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছেন, কেউ আবার সে অগ্নিতাপে দগ্ধও হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের এই সহোদর ভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথ ও সোমেন্দ্রনাথ বিকৃত মস্তিষ্ক। দুই খুল্লতাত ভ্রাতা গণেন্দ্রনাথ এবং গুণেন্দ্রনাথ অকালে গত—যথার্থ বিদগ্ধ জন হয়েও দাহন কাণ্ড থেকে রক্ষা পান নি। আবার রবীন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথ সে তাপে তপ্ত হয়েই তাঁদের সৃজনীশক্তি লাভ করেছেন।

বলছিলাম শান্তি পান নি। নিজে শান্তি না পেলে কি হবে অপরকে আনন্দ দিয়েছেন প্রচুর। প্রচণ্ড আকর্ষণ শক্তি ছিল, এক সময়ে বহু লোক তাঁকে ঘিরে থেকেছে। যখন যার সঙ্গে মিশেছেন তারই মন জয় করে নিয়েছে। নিজেকে দিতেও পারতেন নিঃশেষে। সমস্তই আত্যন্তিক, বিপদটা ওখানেই—সর্বমত্যন্তম্ গর্হিতম্। বেহিসাবী উড়নচণ্ডী মানুষ, সব কিছুতেই মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছেন—নিজের ইচ্ছায় নয়, সবই হয়েছে কোন প্রবল শক্তির তাড়নায় যার উপরে তাঁর কিছুমাত্র কর্তৃত্ব ছিল না। এমন নির্ভেজাল ভালো মানুষ যে কোন কিছুকে বাধা দেবার বা ঠেকিয়ে রাখবার ক্ষমতা তার ছিল না। অজাতশত্রু মানুষ। এখানে স্বভাবতই কল্লোলগোষ্ঠির কথা মনে হবে। আমরা তখন ভাবতাম কল্লোলের আঙিনায় চমৎকার একটি সাহিত্যিক ব্রাদারহুড-এর সৃষ্টি হয়েছে। পরে দেখা গেল তাঁদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনটা বড় ঢিলে। কেউ কাউকে ছেড়ে কথা কন নি, একে অন্যের সম্পর্কে অশোভন উক্তিও করেছেন। এক নজরুল সম্বন্ধেই কারো মুখে কোন নিন্দা শোনা যায় নি, তিনিও কারো সম্বন্ধে কোন নিন্দার কথা কোন দিন উচ্চারণ করেন নি।

দোষে গুণে মিলিয়ে নজরুল এমন মানুষ ছিলেন যে, তাঁকে ভালবাসা খুব সহজ ছিল। দোষ-গুণগুলি সবই ছিল তাঁর আপন স্বভাবজাত। প্রতিভা যেমন স্বভাবজাত, প্রতিভাবানের দোষগুণও তেমনি। আগেই বলেছি, প্রতিভা জিনিসটা বিদ্যা বা পাণ্ডিত্যের ন্যায় অর্জিত ক্ষমতা নয়, শ্রমসাধ্য অধ্যবসায়ের দ্বারাও নয়। এ জিনিস প্রকৃতিদত্ত, আপন স্বভাবের মধ্যে নিহিত। সাধ্য-সাধনা করে একে পাওয়া যায় না। ঐ যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'তোরা

পারবিনে ফুল ফোটাতে / যে পারে আপনি পারে / পারে সে ফুল ফোটাতে'---প্রতিভার প্রকৃত পরিচয়টি ঐ। প্রতিভাবানের পক্ষে যা সহজসাধ্য, বিদ্বান বা পণ্ডিতের পক্ষে তা শুধু দুঃসাধ্য নয়, অসাধ্য। কারণ, প্রতিভা তার কল্পনার ডানা মেলে গিয়ে যেখানে দিয়ে পৌঁছোতে পারে, পাণ্ডিত্য বেচারা পায়ে হেঁটে (তাও আবার পুঁথির ঝাঁকা মাথায় করে) কখনো সেখানে গিয়ে পৌঁছোতে পারে না। ব্যাপারটা বারো আনাই স্বতঃস্ফূর্ত কিন্তু বাকি চার আনার জন্যে একটু-আধটু সাধ্য সাধনার প্রয়োজন আছে বই কি, নইলে শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয় না। নজরুলের প্রতিভা পরিণতি লাভ করেনি। কবি জীবনের প্রারম্ভে যে প্রতিশ্রুতি দেখা গিয়েছিল ক্রমবিকাশের-পথে তা আর বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে নি। অর্ধপথেই গতি স্তব্ধ হয়েছে। যৌবনের দৌড় বড় বেশী দূর নয়। প্রতিভাবানদের বিষয়ে বলতে গিয়ে পশ্চিমী লেখক বলেছেন, Youth gives brilliance...যৌবনের দান চমক ঝলক। Age gives fullness to that brilliance---প্রতিভার পূর্ণবিকাশ পরিণত বয়সের দান।

নজরুলের সঙ্গীত-চিন্তা

—রাজেশ্বর মিত্র

'বেলা গেল বন্ধু ডাকে ননদী
চল জল নিতে যাবি লো যদি
কালো হয়ে আসে সুদূর নদী
নাগরিকা সাজে সাজে নগরী
বসিয়া বিজনে কেন একা মনে
পানিয়া ভরণে চললে গোরী।'

নদীর জলে প্রদোষের কালো ছায়া ঘনীভূত হচ্ছে; ননদী দ্রুত আহ্বান জানাচ্ছে জল ভরে নিয়ে আসবার জন্য---অপরদিকে নগর দীপমালায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে, নায়িকারা সজ্জিত হচ্ছে প্রিয়তমের প্রত্যাশায়, কিন্তু নিরালায় একাকিনী একটি বধূর মন এই সন্ধ্যায় কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। এই যে দৃশ্য—এ যেন কেমন একটা মায়াচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে কবির দেওয়া সুরে এবং গানটি গতিভঙ্গিমায়। এই অনুভূতিকেই কি আমরা মিষ্টিক অনুভূতি বলি?

গজলের এই ধারাকে নিয়ে এসে কিন্তু তিনি আরও উচ্চতর ভাবাদর্শে স্থাপন করতে সচেষ্ট হননি, শীঘ্রই তাঁর গানের মোড় অন্যদিকে ঘুরল। গত শতাব্দীতে যাঁরা টপ্পা রচনা করেছিলেন তাঁরা বাংলা টপ্পাকে একটা বিশেষ আর্টে পরিণত করেছিলেন। নজরুলও তেমনি গজল পর্যায়ের বাংলা গানকে এক বিশেষ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করবার জন্য সচেষ্ট হয়নি। তিনি কয়েকটি এক্স-পেরিমেণ্ট করেই থেমে গেছেন? ফার্সীতে গজল মানিয়ে গেছে সেদেশের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, ভাষার স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতির সঙ্গে উর্দুতে সেই রীতি সমানভাবে অপ্রযোজ্য। তাই উর্দু গজলের সঙ্গে ফার্সী গজলের যেমন মিল আছে তেমনি তফাৎও বহু। ক্রমে উর্দু সঙ্গীতসাহিত্য গজলকে নিজের নিয়মে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে নিয়েছে এবং এদিকে তাদের প্রয়াস চলেছে গভীরভাবে। বাংলার জীবনযাত্রায় সুরা, সাকী,

সরাইখানা, বিচিত্র পেয়ালায় পানশালায় বসে একত্রে পানভোজন ইত্যাদি ব্যাপার একেবারেই বিজাতীয়, তাই ঠিক সেই ধারায় রচনা করলে নতুনত্বের একটা আশ্চর্য স্বাদ পাওয়া যায়, কিন্তু তার বেশী কিছু স্থায়ী হবে না। নজরুলের ক্ষেত্রে এটাই প্রধানতঃ ঘটেছে তাই নজরুলের গতি যেন খানিকটা প্রবাহিত হয়েই অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। অথচ বহু ইস্‌লামী ভাবধারা তো আমাদের সঙ্গীতে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। যার মধ্যে একটি হচ্ছে সুফী ভাবধারা। সেগুলি এসেছে স্বাভাবিক চিন্তা ও প্রয়োগের মাধ্যমে। তাদের সঙ্গে আমাদের বহু সম্প্রদায়েরও ভাবদর্শের দিক থেকে মিল ছিল। তথাপি নজরুলের এই বিচিত্র পুষ্টির মূল্যও কম নয়। আর্টের দিক থেকে এর একটা বিরাট স্বীকৃতি সর্বদাই থাকবে এবং এই যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি করেছিলেন তা অসধারণ সম্ভাবনার পরিচায়ক। বাংলায় গজলকে গভীরতর পর্যায়ে নিয়ে যাবার অবকাশ যে প্রচুর আছে এটা আমরা আজ বলতে পারি নজরুলের প্রয়াসের উপর ভিত্তিস্থাপন করে।

অজ্ঞাত দাদরা, কার্ফাতেও নজরুল নিয়ে এলেন নানান ধরনের চিত্তাকর্ষক ঢং। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি গানের উল্লেখ করছি। যেমন, 'সখি বোলে বঁধুয়ারে নিরজনে', 'এ আঁখিজল মোছ পিয়া', 'ভুলি কেমনে যে মনে', 'কেন দিলে এ কাঁটা', 'বউ কথা কও' ইত্যাদি। এসব গানে দেখি ফার্সী, উর্দু কাব্যের গতি প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের চিরপরিচিত আড়-খেমটার সংযোগ হয়েছে। কিন্তু এ রীতিকে আড়খেমটা বলা যাবে না, কেননা আসলে এটি বিশেষ গায়কী। 'সখি বোলো বঁধুয়ারে নিরজনে'---এ রোমান্টিক গানটি অনেকে শুনেছেন,---তারই শেষ কলি হচ্ছে---

> 'ওপথে চোরকাঁটা সখি তায় বলে দিয়ো
> বেঁধে না বেঁধে না লো যেন তার উত্তরীয়
> এ বনফুল লাগি না আসে কাঁটা দলি
> আপনি যাব আমি বাঁধুয়ার কুঞ্জগলি
> বিকাব বিনিমূলে ও চরণে।'

তালের দিক থেকে এটা আড়খেমটা। কিন্তু গাইতে গেলে দেখা যাবে এটি ঐ তালে চলছে না : এর ভঙ্গি ঠুংরির মত যা দাদরা কার্ফায় দেখা যায়। এই চাল নজরুলই আমাদের গানে নিয়ে এলেন। অতুলপ্রসাদের একাধিক গানে এই চাল দেখা যায়। নজরুল এর অনুশীলন করেছিলেন আরও গভীরভাবে।

কিন্তু এখানেও দেখা যায় নজরুল এসব গানকে কাব্যমূল্যে আরও উৎকৃষ্টতর ও উচ্চতর আর্টে পরিণত করতে সচেষ্ট হননি। রবীন্দ্রনাথ আড়-খেমটা তালে অতুলনীয় কাব্যসঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন। কারণ স্বভাবতই তিনি তাঁর যে-কোন সৃষ্টির মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। কিন্তু নজরুল তাঁর স্বাভাবিকত্বে রচনা করে তার চটুল পরিবেশ প্রাণভাগ উপভোগ করেছেন—নিছক প্রমোদমূল্যটুকুই যেন এক্ষেত্রে তাঁকে অভিভূত করেছে। তথাপি তিনি যে স্টাইলের প্রবর্তন করেন তা এইভাবে বাংলা গানে কেউ অর্পণ করেন নি। হয়ত যারা অধিকতর পরিশীলন পছন্দ করেন এইসব গান তাঁদের প্রত্যাশাকে সম্পূর্ণভাবে পূরণ করবে না, কিন্তু বাংলা গানের একটা স্টাইল হিসেবে এ গান যে-কোন কনফারেন্সেও গাওয়া যায়। প্রোফেশনাল গায়কেরা গানে যে অবকাশ প্রত্যাশা করেন নজরুল তার সুযোগ রেখেছিলেন প্রচুরভাবেই। নজরুলের পূর্ববর্তী যুগে যে ধরণের গান রচিত হয়েছে তার আঙ্গিক ভিন্ন ধরনের, তা অনেকটা চিরায় রীতিনীতির সামিল, একটু বেশী সীরিয়াস, কিন্তু নজরুল যেন মনটাকে হাল্কা করে দেবার জন্য কোনও ফরম্যালিটি মেনে চলেন নি, কারোর ভ্রুকুঞ্চনেরও তোয়াক্কা করেন নি, অত্যন্ত সোহাগে আদরে প্রিয়জনের কাছে লঘুভাবে নিজেকে সম্পূর্ণ ব্যক্ত করে দিয়েছেন। তাঁর এই ধরনের গানে আর একটি রীতি ফার্সী বা উর্দু গজলে মিল আছে। সেটি হচ্ছে এই গানের প্রত্যেকটি কলিই স্বয়ংসম্পূর্ণ। একটি অপরের পরিপূরক নয়, অথচ কোথায় যেন সেন্টি-মেন্টের একটা ঐক্যসূত্র অনুভব করা যায়।

নজরুল আমাদের সঙ্গীতে 'শেয়র' সুরসহযোগে কাব্যপাঠ প্রবর্তন করেন। এই সুরের ভঙ্গীর সঙ্গে আমাদের কথকতার ভঙ্গীর অনেক তফাৎ; এটা লিরিক বা কাব্যবন্ধেরই একটা অঙ্গ। কল্পনোক্ত মতই এর সুরের সঞ্চরণ এবং প্রকৃতি খানিকটা আলাপ ঘেঁষা। এই রথভঙ্গীতে সুর করে আবৃত্তি করবার পর তালের প্রয়োগ এবং ছন্দের ঝোঁক একটি অপরূপ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। উদাহরণে নজরুলের দুটি বিখ্যাত গানের উল্লেখ করা যায়, একটি 'দাঁড়ালে দুয়ারে মোর কে তুমি ভিখারিণী' অপরটি 'পানসে জোছানাতে কে চলে গো পানসি বেয়ে'। তিনি কিভাবে "শেয়র" প্রয়োগ করেছেন নিম্নোক্ত 'পানসে জোছনাতে' গানটির দ্বিতীয় কলি থেকে স্পষ্ট হবে।

ওপারে লুকিয়ে আধার গভীর ঘন ঘনছায়া
আকাশে এলায়ে দেহ পাহাড় আলসে ঘুমায়

দূরে নিঝুম সে কোন গ্রাম বাসরে পল্লীবধূর প্রায়
এপারে ধূ ধূ বালুচর---নদীর আঁচল লুটায়।

এই চিত্রটি তিনি তুলে ধরছেন সুরের চমৎকার আবৃত্তির মাধ্যমে, তালে সেই চমৎকারিত্বকে কিছুতেই তিনি ব্যক্ত করতে পারতেন না। এই প্রয়োগগুলি যেন তাঁর সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে, আধুনিক গানের বিবিধ কলাকৌশলের মাঝখানে এই সব বাচনভঙ্গীর সাক্ষাৎ মেলে না। উর্দু বা হিন্দী কাব্যপাঠে এবং গানে এই ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

অপরাপর সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও নজরুল ইসলামের প্রচেষ্টা বহুধা এবং ব্যাপক কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তার স্বকীয়তা বিস্ময়ের উদ্রেগ করে না। এসব গানে তিনি চিরাচরিত রীতি অবলম্বন করে গেছেন। তাঁর রীতি ছিল বলিষ্ঠ এবং আবেদন প্রত্যক্ষ। বাংলা সঙ্গীতে এই রীতি ছিল একমাত্র দ্বিজেন্দ্রলালের। কিন্তু তাঁর গানেও এক ধরনের রোমান্টিসিজম ছিল যা নজরুলের ছিল না। যেমন "আমরা এমনিই এসে ভেসে যাই" বা 'আমরা মলয় বাতাসে ভেসে শুধু,--ভাবধর্মী গান নজরুলের মধ্যে পাওয়া যেতো না, কিন্তু ইচ্ছে করলে "ছোট্ট মোদের পান্‌সি তরী" জাতীয় গান নজরুল অনায়াসে রচনা করতে পারতেন, তবে সুর প্রয়োগে দ্বিজেন্দ্রলাল যে পাশ্চাত্য স্টাইল এনেছিলেন, নজরুল সে জায়গায় অন্যভাবে রূপায়ণ করতেন। কিন্তু এমন দু' একটি গান আছে যেখানে নজরুল আশ্চর্যভাবে রোমান্টিক, যেমন "মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর" গানটি। আমার মনে হয় আমাদের সঙ্গীতে এ গানটি একটি অনন্যসাধারণ রচনা। এক নজরুল ছাড়া এ কম্পোজিশন আর কারুর পক্ষেই সম্ভব ছিল না।

রাগধর্মী গান, ভজন ও শ্যামাসঙ্গীতে নজরুল অতিকীর্তিত হয়েছেন বলেই মনে হয়। গত শতাব্দীতে এই প্রয়াস আরও গভীর হয়েছে। তবে, এযুগের উপযোগী কয়েকটি বৈচিত্র্য বিশেষভাবে আনতে চেয়েছিলেন কিন্তু একটা প্রোফেশনাল ধরনের রীতি কাব্যের সঙ্গে খাপ খায়নি বলেই আমাদের ধারণা হয়। নজরুল এই পর্যায়ের বেশ কিছু গান রচনা করেছেন সত্যি, কিন্তু তিনি এই মানসিকতার কম্পোজার ছিলেন না, এই সব গান যেন বার বার আমাদের করিয়ে দেয়। তাঁর ভজন রচনা সম্বন্ধে অতিরিক্ত কিছু বলবার নেই, কিন্তু শ্যামাসঙ্গীতকে তিনি একধরনের কাব্যসঙ্গীতেই উত্তীর্ণ করেছেন, যেমন "কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন"। দ্বিজেন্দ্রলালের দু'একটি শ্যামাসঙ্গীতে এ রকম প্রচেষ্টা অবশ্য পূর্বেই দেখা গেছে। তারও আগে

গিরিশচন্দ্র এজন ও ভক্তিগীতিকে সামগ্রিকভাবে অবলম্বন করে নানা-পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চালিয়ে গেছেন তাঁর প্রযুক্ত সুরকারদের সহায়তায়। অতএব যাঁরা বলেন রামপ্রসাদের পর নজরুল ইসলাম একমাত্র শ্যামাসঙ্গীত রচনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁরা বাংলা গানের ইতিবৃত্ত অনুশীলন করে মত প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি।

সব মিলিয়ে নজরুলের গান এত জনপ্রিয় কি করে হল সে প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে। সাধারণ শ্রোতারা ভেবেচিন্তে, সমালোচনা করে কোনও সুরকারকে গ্রহণ করেন না, তাঁরা এমন একটি বস্তু তাঁদের কম্পোজিশনে পান যা মনকে স্বভাবতই আকৃষ্ট করে। নজরুলের মধ্যে তা ছিল। তাঁর রচনা সহজ, সরল, বলিষ্ঠ অথচ নমনীয়; কোনটির মধ্যেই কৃত্রিমতা নেই। এত বহু বিচিত্র প্রয়োগ তাঁর নানান গানে বিভিন্ন মনোভাবের ব্যক্তিকে বিভিন্নভাবে আকৃষ্ট করেছে। এক-একজন কম্পোজার আছেন যাঁরা মামুলি হয়েও অনেকক্ষেত্রে অসাধারণ। তাঁর কারণ এমন এক একটা "কোয়ালিটি" তাদের অতি সাধারণ রচনাতেও পাওয়া যায় যা তাঁদের জনপ্রিয়তাকে বহুদিন অক্ষুণ্ণ রাখে। গিরিশচন্দ্র ছিলেন এই ধরণের গীতিকার। তাঁর অনেক মামুলি গানও এই রকম পশ্চ-নিহিত কয়েকটি গুণের জন্য এক শতকের অধিককাল সমাদৃত হয়েছে। কিন্তু সেই "কোয়ালি"র যদি অভাব থাকে তাহলে নানা সফিষ্টিকেশনেও জনচিত্তকে বেশীদিন আকৃষ্ট করতে পারে না। আমাদের আধুনিক গানের ক্ষেত্রে এই অভাবই অনেককে ব্যাপক স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত করেছে। নজরুল চিরকাল গ্রামোফোন, থিয়েটার প্রভৃতি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সহায়তার জন্যই গান রচনা করে গেছেন কিন্তু বিদ্রোহী কবি সঙ্গীতে অকারণ নূতনত্ব, যা একান্তভাবে স্বীয় দায়িত্বে এনেছেন তার রসমাধুর্য সম্বন্ধে কদাচ উদাসীন ছিলেন না, যদিচ অধিকতর পরিমার্জনার দায়িত্বটুকু কোন কোন ক্ষেত্রে এড়িয়ে গেছেন তাঁর স্বভাবগত চাঞ্চল্যের প্রেরণায়।

মানুষের কবি

—কাজী মোতাহার হোসেন

সকল কবিই তো মানুষের জন্য কাব্য লিখে থাকেন, তাহলে আর 'মানুষের কবি' বলে কবিকে বিশেষিত করবার তাৎপর্য কি? প্রথমেই এ-কথাটা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। আমরা সামাজিক কারণে মানুষকে নানা ভাগে ভাগ করে থাকি। যেমন—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ভারতীয়, পাকিস্তানী, ইংরাজ, ধনী, বণিক, শ্রমিক, আশরাফ, আতরাফ, হানাফী, শাফেয়ী হাম্বলী, রাজা প্রজা উজির নাজির ইত্যাদি। কোনো কোনো কবি এইসব শ্রেণীর এক বা একাধিক বিশেষ শ্রেণীকে লক্ষ্য করে বা মনে মনে প্রধান বলে গণ্য করে কাব্য লিখে থাকেন। এঁরা হচ্ছেন শ্রেণী বিশেষের কবি। আর যাঁরা শ্রেণী বিশেষকে প্রাধান্য না দিয়ে সকল মানুষের জন্য কাব্য লেখেন তাঁদেরকে মানুষের কবি বলা যায়। নজরুল ইসলাম শ্রেণী প্রাধান্য স্বীকার করেননি। তিনি সকল মানুষের সমান অধিকার ও সম্ভাবনার দিকে জোর দিয়েছেন এবং মানুষের চিরন্তন আশা-আকাঙ্খা, সুখঃ-দুঃখ, যৌবন-প্রেম, বীর-ধর্ম প্রভৃতি নিয়ে কবিতা লিখেছেন। এজন্য তাঁকে 'মানুষের কবি' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

নজরুল ইসলাম জীবনে জাত-বিচার মানেন নি। সাম্যের দিকেই তাঁর প্রধান আকর্ষণ। জাতের বিচারের ক্ষুদ্রতাকে বিদ্রূপ করে তিনি লিখেছেন:

'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছো জুয়া।
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া॥
হুকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবলি এতেই জাতির প্রাণ।
তাইতো বেকুব করলি তোরা এক জাতিকে একশো খান॥'

ইসলামী শিক্ষার বিধান তিনি উদাত্ত সুরে ঘোষণা করেছেন।

'আজি ইসলামী ডঙ্কা গরজে ভরি জাহান্—
নাহি বড়ো ছোটো—সকল মানুষ এক সমান,
রাজা প্রজা নয় কারো কেহ।
কে আমীর তুমি নওয়াব বাদশা বালাখানায়?
সকল কালের কলঙ্ক তুমি, জাগালে হায়
ইসলামে তুমি সন্দেহ॥'

এখানে যে-সব ভাগ্যবান সচরাচর নিজেদের 'বড়ত্ব' নিয়ে ছোটদের ঘৃণা করে, তাদের বিরুদ্ধে কবির তিক্ত বাণী উচ্চারিত হয়েছে। প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় যে বড়ত্বের বড়াই নেই, কবি সেই বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

আবার যে ভাগ্যবান বড়ো হয়েও বড়াই করেন না তাঁদের প্রতি নজরুলের অপরিসীম শ্রদ্ধার নমুনা দেখুন:

'মানুষের তুমি করছো বন্ধু; বলিয়াছ ভাই, তাই
তোমারে এমন চোখের পানিতে স্মরি গো সর্বদাই।
বন্ধু গো প্রিয়, এ হাত তোমারে সালাম করিতে গিয়া
উঠে না ঊর্ধ্বে, বক্ষে তোমারে ধরে শুধু জড়াইয়া।'

ওমর ফারুকের মানব-প্রীতি কবিকে কী অপরূপভাবে মুগ্ধ করেছে এবং উপরের কবিতায় কী অপূর্বভাবে তা প্রকাশ হয়েছে। হৃদয়ের মাধুর্য দিয়ে নজরুল সব উঁচু-নীচু সমান করে দিতে চান। তাঁর ধর্মই হৃদয়ের প্রেম-ধর্ম, যে প্রেমানুষের কল্যাণে উৎসারিত হয়ে উঠে। তাই তিনি লিখেছেন:

'তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব, সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা, খুলে দেখ নিজ প্রাণ।
এই বন্দরে আরব দুলাল শুনিতেন আহ্বান,
এইখানে বসি' গাহিলেন তিনি কোরাণের সাম গান।
মিথ্যা শুনি নি ভাই—
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই।'

মানব-প্রেমের ক্ষেত্রে সমস্ত ধর্ম এসে হৃদয়-বন্দরে মিলিত হয়েছে—বিশ্ব সেখানে কোলাকুলি করে। এই হচ্ছে কবির বাণী এবং ইসলামের ধর্মের রূপ।

আমাদের দেশের একটি প্রধান দোষ হচ্ছে সামাজিক বা কুল-মর্যাদার মিথ্যা অহঙ্কার। কবি এই ভেদাভেদ মিটিয়ে দিতে চান তিনি 'যুগবাণী'তে লিখেছেন, 'সমাজ বা জন্ম লইয়া এই বিশ্রী উঁচু-নিচু ভাব তাহা আমাদিগকে জোর করিয়া ভাঙিয়া দিতে হইবে। আমরা মানুষকে বিচার করিব মনুষ্যত্বের দিক দিয়া, পুরুষকারের দিক দিয়া। এই বিশ্ব মানবতার যুগে যিনি এমনি করিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন তাঁহাকে আমরা বুক বাড়াইয়া দিতেছি।'

এখানে মনুষ্যত্বের অর্থ হচ্ছে, মানব প্রীতি আর পুরুষকারের অর্থ বীর-ধর্ম। নজরুলের মধ্যে আমরা একাধারে প্রেমের কোমলতা আর বীরত্বের দৃঢ়তার পরিচয় পাই। ইসলামের ভিতর কবি দেখেছেন এক বিশ্বব্যাপী আজাদীর

আহ্বান। তাই তিনি বলেছেন:

'অন্যেরে দাস করিতে কিংবা নিজ দাস হ'তে' ওরে
আসেনি ক' দুনিয়ায় মুসলিম ভুলিলি কেমন করে?
ভাঙিতে সকল কারাগার, সব বন্ধন, ভয় লাজ?
এলো যে কোরাণ, এলো যে রে নবী, ভুলিলি সে-সব আজ?

কোরাণের এই মুক্তিবাণী—তৌহিদের যা কর্মকথা সেই দিকে কবি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন। আমার মনে হয় অন্য কোনো কবিই তৌহিদের এই 'অবন্ধন রূপ' এত স্পষ্ট করে অনুভব করতে পারেন নি। এইটি নজরুলের একটি বিশেষ দান। বন্ধন-লাজ ভয় জয় করবার সাধনা যাঁরা করছেন সেই বীরদের গান নজরুল গেয়েছেন:

'গাহি তাহাদের গান
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান।
সেদিন নিশীথ বেলা
দুস্তর পারাবারে যে যাত্রী একাকী ভাসালো ভেলা,
আঁখি মুছি আর রচি গান আমি আজিও নিশীথ জাগি'।
আজো বিনিদ্র গাহি গান আমি চেয়ে তারি পথ-পানে,
ফিরিল না প্রাতে যে জন সে-রাতে উড়িল আকাশে যানে,
নব-জগতের দূর সন্ধানী অসীমের পথচারী,
যার ভয়ে জাগে সদা-সতর্ক মৃত্যু দুয়ারে দ্বারী।'

নজরুল বর্তমানকে যা পেয়েছেন তার থেকে এক উন্নততর নতুন বর্তমান গড়ে তুলবার প্রয়াসী। মানবতার কল্যাণ-রথ সর্বদা সামনের দিকে চালাতে হবে, পিছে তাকিয়ে হা-হুতাশ করে কোন লাভ নেই। তাই তিনি বলতে পেরেছেন:

'যাক্ রে তখ্‌ত তাউস, জাগরে বেহুঁশ
ডুবিল রে দেখ্ কতো পারস্য, রোম, গ্রীক রুশ,
জাগিল তারা সকল, জেগে ওঠ্ হীনবল,
আমরা গড়িব নূতন করিয়া ধুলায় তাজমহল।'

নজরুল আশার কবি—শুধু বৈষয়িক ক্ষেত্রে নয় প্রেমের ক্ষেত্রেও নজরুলের প্রেমিকা হচ্ছেন এক 'শাশ্বত প্রতীক্ষমানা অনন্ত সুন্দরী।' সর্বদা তার মিলনের

অন্ত কবি অগ্রসর হচ্ছেন, এর কূলে নৌকা না ভিড়লেও আর এক কূলে ভিড়তে পারে। সকল কূলই সেই এক প্রেমময়ীর। নজরুলের একটা গান আছে:

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে অতীত দিনের স্মৃতি
কেউ দুখ লয়ে কাঁদে কেউ ভুলিতে গায় গীত॥
কেউ শীতল জলদে হের অশনির জ্বালা,
কেউ মুঞ্জরিয়া তোলে তার শুষ্ক কুঞ্জ বীথি॥
কেউ জ্বালে না আর আলো তার চির দুঃখের রাতে
কেউ দ্বার খুলি' জাগে চায় নব চাঁদের তিথি॥'

এখানে আশাবাদী নজরুলের মনের টান কোন দিকে তা সহজেই বোঝা যায়।

এই ভেদাভেদ চূর্ণকারী মানবতার কবিকে আমরা ভালোবাসি। কবি বহুবার বলেছেন, শ্রদ্ধা আমি অনেক পেয়েছি, কিন্তু ভালোবাসাই দুর্লভ।

তাঁর আশা ধ্বনিত হয়েছে পূজারিণীর কয়েকটা লাইনে:

ভেবেছিনু বিশ্ব যারে পারে নাই, তুমি নেবে
তার ভার হেসে
বিশ্ব-বিদ্রোহীরে তুমি করিবে শাসন অবহেলে,
শুধু ভালোবেসে।'

কবির এ-আশা পূর্ণ হয়েছে কিনা জানি না, কিন্তু অন্য যে-কোনো কবির চেয়ে মানুষের কবি নজরুলকে যে তার গুণে-ভরা স্বদেশবাসী অনেক বেশী অন্তরঙ্গ বলে অনুভব করে থাকেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বিদ্রোহী কবি

—প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়

১৯২৩ সালে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের এক বৎসর সশ্রম কারাবাস হয়। ঐ সময় রাজনৈতিক কয়েদীদের কোনো শ্রেণী-বিভাগের নিয়ম ছিলো না। যাকে পারতো তাকেই ধরে নিয়ে এসে বন্দী করতো। পরে বিচার-প্রহসনের দ্বারা দণ্ড দিয়ে কয়েদীর ছাপ দিয়ে দিতো। বিচারক সুইন-হো নিজে কবি হয়েও বিদ্রোহী কবির বেলাতেও কোনো শ্রেণী-বিভাগ না করেই তাঁকে সাধারণ কয়েদীরূপে গণ্য করেছিলো। ডোরাকাটা হাফ্ পাঞ্জাবী, উক্ত কাপড়ের ইজের, আর ঐ কাপড়েই গামছার মতো গা-মোছা চাদর, বিষম কুটকুটে খোঁচা-খোঁচা লোমের কম্বল সহ এই অপরূপ পোষাকে জেল কর্তৃপক্ষ বাংলার জাতীয় জাগরণের কবিকে সাজিয়ে কয়েদীর গাদীতে ছেড়ে দিলো।

কবি কলকাতার জেল থেকে হুগলী জেলে এলেন। কবিকে আনা হয়েছিলো কোমরে দড়ি বেঁধে। জেলখানায় ঢুকেই উদাত্ত স্বরে গাইলেন 'দে গরুর গা ধুইয়ে'। রাজনৈতিক বন্দীরা সচকিত হয়ে শুনলো বিদ্রোহী কবি নজরুল হুগলী জেলে পদার্পণ করেছেন। সকলেই কবির আগমনে বন্দীদশার একঘেয়েমিতে বৈচিত্র্যের আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

বিভিন্ন জেলার অহিংস, বিপ্লবী যুব ও ছাত্রসমাজ বিশেষ করে হুগলীর যুব ও ছাত্রসমাজের একটা বড়ো অংশ তখন আন্দোলনের সৈনিকরূপে 'হুগলী বিদ্যামন্দির' স্বেচ্ছাসেবকরূপে সমবেত হয়েছিলো। হুগলী জেল তখন বিভিন্ন জায়গার রাজনৈতিক বন্দীর সমাগমে গম্‌গম্ করছিলো। কবি নজরুলকে পেয়ে বন্দীরা গানে, আবৃত্তিতে, হাসির হুল্লোড়ে খুব হৈ-চৈ করে কাটাতো। বাইরে থেকে ছাত্রের দল হুগলী ব্রীজের উপর উঠে জেলের কয়েদীদের দেখতো এবং নানারকমে উৎসাহিত করতো। বিপ্লবী তরুণ নেতা সিরাজল হক তাঁদের দল নিয়ে হুগলী ব্রীজের উপর থেকে তাক বুঝে কাপড়, গামছা, তোয়ালে, সাবান, বিড়ি-সিগারেট, খবরের কাগজ প্রভৃতি ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দিতেন। কবি সুবোধ রায়, সিরাজুল হক্, হামিদুল হক্, জনার্দন প্রভৃতি এইসব কাজের নতুন-নতুন উপায় উদ্ভাবন করতেন। কারণ এ ব্যাপরটা যাতে করতে না পারে তার জন্ম জেল

কর্তৃপক্ষ নানারূপ বাধার সৃষ্টি করতো। বন্দীরাও তাঁদের খবরাখবর পাঠাবার জন্য চিঠি প্রভৃতি ঢিলের সঙ্গে জড়িয়ে ছুঁড়ে এদিকে পাচার করতেন। তাই জেল কর্তৃপক্ষ যখন প্রায় মানলো তখন সাদা পোশাকে পুলিশের আকাঠি নিযুক্ত করতে বাধ্য হলো, কারণ জেলের অনেক গুপ্ত তথ্য প্রকাশ হয়ে যাচ্ছিলো। এইভাবে বাইরের লোকের সঙ্গে বন্দীদের যোগাযোগ তখন ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, বাধা দেবার শত চেষ্টাতেও কাজটি সমানেই চলেছে, বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ তখন ব্রীজের উপরে বন্দুকধারী পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করলো। কিন্তু দুঃসাহসী ছেলেদের এতেও ঠেকানো গেলো না। সেজন্য ব্রীজের দক্ষিণ-দিকের অনেকটা জায়গা ঢেউ-টিন দিয়া খুব উঁচু করে বেড়া দিয়া ঢেকে দিলো। তবুও দুর্দান্ত কয়েকটি ছেলে জীবন বিপন্ন করে চেষ্টা করে, কিন্তু বিদ্যামন্দিরের নেতাদের নিষেধে তারা হাত গুটিয়ে নিলো।

যতগুলো জেল আছে তার মধ্যে হুগলী জেলটা সবচেয়ে ওঁচা। এর 'জেলর' যেমনি অভদ্র তেমনি অশিক্ষিত হতো। চোর, ডাকাত, পকেটমারদের সঙ্গে যে ব্যবহার করতো, বিশিষ্ট ও সম্মানিত রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গেও সে লোকটা সেই ব্যবহার করতো। চিঠি লেখার কাগজ, খবরের কাগজ তো দিতই না, কলম-পেন্সিল অফিসে জমা নিয়ে নিতো তারা জোর করে। এই ব্যাপারে কবি নজরুলের মনটা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলো। এই সময় হুগলী জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন এক ইংরেজ। নাম তার 'আস্‌টন'।

রাজনৈতিক বন্দীদের দেখলেই কারণে অকারণে সে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতো। বন্দীরাও মজা দেখবার জন্য তাকে চটাবার আয়োজন করে রাখতো। কবি নজরুল এই ইংরেজ সুপারটির নাম রেখেছিলেন হর্সটেন (Horsetone) মানে পিচেশ-কণ্ঠি। কবি একে চটাবার জন্য 'সুপার-সুন্দনা' নামে একটি গান লেখেন। গানটি :

'তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে
তুমি ধন্য ধন্য হে।
আমারি গান তোমারি ধ্যান
তুমি ধন্য ধন্য হে।
রেখেছো সান্ত্রী পাহারা দোরে
আঁধার কক্ষে জামাই আদরে
বেঁধেছো শিকল প্রণয় ডোরে।
তুমি ধন্য ধন্য হে।

আকাড়া চালের অন্ন লবণ
করেছো আমার রসনা লোভন
বুড়ো ডাঁটা 'লপ্‌সী শোভন
তুমি ধন্য ধন্য হে।
ধরো ধরো খুড়ো চপেটা মুষ্টি
খেয়ে গয়া পাবে সোজা সন্তুষ্টি,
ওল-ছোলা দেহ ধবল কুষ্ঠ
তুমি ধন্য ধন্য হে।

কবি রবীন্দ্রনাথের 'তোমারি গেহে পালিছো স্নেহে' গানটির লালিক অর্থাৎ প্যারডি। 'বুড়ো ডাঁটা ঘাঁটা' কথাটির একটা ব্যাপার আছে, যে, হুগলী জেলে কি সাধারণ কয়েদী কি রাজনৈতিক কয়েদীদের দিয়ে খুব বড়ো করে একটা তরকারীর বাগান করা হয়েছিলো, শুনেছি এখনও হয় (বোধহয় রাজনৈতিক কয়েদীদের আর খাটতে হয় না) কিন্তু তখনকার দিনে ভালো-ভালো তরকারী, ভালো-ভালো ফুলের থোকাগুলো জেল কর্তৃপক্ষের ঘরে চলে যেতো; আর বুড়ো ডাঁটা কপির শুকনো পাতা, ফুটে যাওয়া ফুলকপি, দরকচা-ধরা বেগুন, ঝিঙে, আধপচা লাউ, কুমড়ো আর তরকারীর খোসা প্রভৃতিতে কয়েদীদের রসনা তৃপ্তির ব্যবস্থা হতো। সপ্তাহে একদিন মাছ, একদিন মাংসের বরাদ্দের মধ্যে কাঁটা ও হাড় দেখা যেতো, বাকী বস্তুর গতি যে কী হতো তা কয়েদীদের সবাই বুঝতো। আর তরকারীর খোসা, ক্ষুদ ও ধানের 'কুন' মিশিয়ে সেদ্ধ করে ভোরের দিক সান্‌কি থেকে সান্‌কিতে ঢেলে দিয়ে যেতো ফালতুরা, তার রং ছিলো, কালো আস্বাদের তো কোনো বালাই ছিলো না। জেল জীবনে হুগলীর কয়েদীদের ঐটাই ছিলো পরম পদার্থ 'লপ্‌সী'। কবি নজরুল ঐ অ-পদার্থকেই 'বুড়ো ডাঁটা ঘাঁটা লপসী শোভন বলছেন। সুপার আর্সটনের চেহারাটা ছিল লিক্‌লিকে, গায়ের রংটা ছিল বিশ্রী রকমের সাদা। কবি একটা লাইনের ভিতর তাঁর অনবদ্য ভাষায় লিখেছিলেন 'ওল-ছোলা দেহ ধবল কুষ্ঠ'। যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তাঁরা এর রসটা বেশ ভালো করেই নিতে পারবেন। এই গানটি শুনলেই সাহেবপুঙ্গব খ্যাপা কুকুরের মতো কি করবে ঠিক করতে পারতো না।

'ভাঙার গানে' এই গানই আছে। তার ফুটনোটে কবি এই কথা কয়টি লিখেছেন।

'হুগলী জেলে কারারুদ্ধ থাকাকালীন জেলের সকল রকম জুলুম আমাদের উপর দিয়ে পরখ করে নেওয়া হয়েছিলো। সেই সময় জেলের মূর্তিমান জুলুম বড়োকর্তাকে দেখে এই গান গেয়ে অভিনন্দন করতাম।'

কয়েদীরা খবরের কাগজ পড়ে তবু মনকে সান্ত্বনা দিতো কারণ বন্দীদের কাছে 'দৈনিক আনন্দবাজার' কী যে কদর ছিলো এখনকার লোকেদের তা বোঝানো অসম্ভব। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের (তখনকার 'আনন্দবাজার পত্রিকার' সম্পাদক ছিলেন) বলিষ্ঠ সম্পাদকীয় স্তম্ভ ছিলো আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার স্টার্টারস্বরূপ। সহস্র বিপদ মাথায় করেও বিদ্যামন্দিরের স্বেচ্ছাসেবকরা জেলের মধ্যে উক্ত পত্রিকাকে সরবরাহ করতো। বন্দুকধরে পুলিশ পাহারার চাপে শেষে কাগজ তো বন্ধ হলোই নিত্যব্যবহার্য সাবান-সোডা ইত্যাদিও বন্ধ হয়ে গেলো।

দেশভক্ত বন্দীদের প্রাণ হাঁপিয়া উঠলো। সরকার মনোনীত পত্রিকাগুলোর ও বন্ধ করে দিলো আর্সটন। আগেই আহারের সম্বন্ধে বলেছি, এবার বিহারের অর্থাৎ বেড়ানোর কথা বলবো। পূর্বে যারা নতুন নতুন বন্দী আসত তাদের সকালে বিকালে জেলের উঠোনে; মাঠে বেড়াতে দিতো। কিন্তু পরে তাও বন্ধ করে দিতে বন্দীদের মধ্যে প্রাণবন্ত যারা ছিলো তাদের এক-একটা ঘরে কোথাও দু'জনকে, কোথোয় একজনকে আটকে রেখে সমস্ত রকম অধিকার হরণ করে নিলো। বেড়ানো বা বাইরে হাওয়া লাগানো বন্ধ হয়ে তো গেলই; এক বন্দীর সঙ্গে অন্য বন্দীরা কথা বলতে পারতো না। কবি নজরুল গান না গেয়ে থাকতে পারতেন না, তিনি গান ধরতেন :

'কারার ঐ লৌহ কপাট।
ভেঙে ফেল কর রে লোপাট
রক্ত জমাট
শিকল পূজার পাষাণ দেবী
ওরে ও তরুণ ঈশান
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশান
উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদী।'

গানটি শুনে বিক্ষুব্ধ বন্দীদের শিরদাঁড়া সোজা হয়ে উঠতো। তারা জেল কর্তৃপক্ষের এই অত্যাচারের উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য প্রস্তুত হতো। কবি

এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট বন্দীকে হাত-কড়া ও পায়ে বেড়ি দিয়ে 'সেলে' বন্দী করে অন্যান্য কয়েদী থেকে দূরে সরিয়ে রেখে দিলো। কবি তখন 'শিকল পরার গান' রচনা করে হাত কড়া সেলের লোহার গরাদের সঙ্গে ঘা দিয়ে বাজিয়ে গাইলেন :

'এই শিকল পরা ছল্ মোদের এ শিকল পরা ছল,
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবো রে বিকল।
তোমার বন্দী কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন ভয়,
এই বাঁধন পরেই বাঁধন ভয়কে করবো জয়,
এই শিকল বাঁধা পা নয়, এ শিকল ভাঙা কল।'

বন্দী-জীবনে ভয়শূন্য হবার জন্য কবি প্রপূর্ব যুক্তিপূর্ণ কথাগুলো গানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। কাগজ নেই, কলম, পেন্সিল—তাও নেই, কবি শূন্য হাতে শুধু স্মৃতিশক্তির জোরে এই সব গান শত বাধা সত্ত্বেও রচনা করে সুর ও দরদ দিয়ে ভাবাবেগের সঙ্গে গেয়েছেন প্রতিরোধের জন্য, প্রতিকারের জন্য, উপযুক্ত প্রতিবাদের জন্য আগুনকে সংক্রামিত করে যেতে লাগলেন বন্দীদের প্রাণে প্রাণে। এই সময় বিখ্যাত 'সেবক' কবিতাটি রচনা করেন তিনি। উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করে বন্দীদের সংগ্রাম-শক্তি বাড়িয়ে তুলেছিল। কবির সান্নিধ্যে এসে সধারণ কয়েদীরা পর্যন্ত দেশকে ভক্তি করতে শিখেছিলো। তিনি লেখেন :

'সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যাচারীর খাঁড়ায়,
নাই কিরে কেউ সত্য-সেবক বুক ফুলিয়ে আজ দাঁড়ায়?
শিকলগুলো বকিল করে পায়ের তলায় মাড়ায়,
বজ্রহাতে জিন্দাদের (জেলখানার) এই এই ভিত্তিটাকে নাড়ায়?'

এই প্রশ্নগুলি বারে বারে বন্দীদের কাছে তুলে ধরলেন স্বয়ং কবি নজরুল ইসলাম। ক্রমশ: জেলের অবস্থা খুব ঘোরালো হয়ে উঠতে লাগলো। যতরকম কন্দীই সকল বন্দীদের উপর প্রয়োগ করতে লাগলো জেলের জেলর আর জেল সুপার। অনমনীয় বন্দীরা, অনমনীয় বিদ্রোহী কবি, অনমীয় সাধারণ কয়েদীরাও এরই প্রতিবাদের জন্য মিলিতভাবে সবাই অনশন ধর্মঘটের প্রস্তাব দৃঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। ধীরে ধীরে সকলে প্রস্তুতির দিকে এগিয়ে চললেন।

বোধহয় এই সময় কবি নজরুল 'মরণ-বরণ' গানখানি রচনা করেত। গানটি হচ্ছে :

'এসো এসো ওগো মরণ
এই মরণ- ভীতু মানুষ মেয়ের ভয় করো গো হরণ।
না বেরিয়ে পথে যারা পথের ভয়ে ঘরে
বন্ধ করা অন্ধকারে মরার আগেই মরে
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাদের বুকের' পরে
ভীম রুদ্রতালে নাচুক তোমার ভাঙন ভরা চরণ ॥'

এই সময় কবি 'বন্দী বন্দনা' নামে আর একটি গান লেখেন। ভোর বেলায় রাজনৈতিক বন্দীদের 'ফাইলে' দাঁড়াতে হতো। স্কুলে ড্রিলের সময় প্রথমে এসেই যেমন দাঁড়াতে হয় সেই রকম দাঁড়ানোকে ফাইল বলে। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, বন্দীদের রাম দুই করে হেড জমাদার গুনতো। গোনা শেষ হয়ে গেলে জেলর তার বিরাট ভুঁড়ি গুলিয়ে মূর্তিমান নির্বোধের মতো সেখানে ঢুকতো! আর সঙ্গে সঙ্গে জমাদর বীভৎস চীৎকার করে বলে উঠতো, 'সরকার সেলাম'। এই 'সরকার সেলাম'টা কবি ও অন্যান্য বন্দী-বন্ধুরা বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে একটি করে তাঁদের ঠ্যাং সামনের দিকে তুলে দিতেন। পরে এই নিয়ে অনেক মারপিটও হয়ে গেছে!—ভোরবেলার এই ব্যাপারটির সঙ্গে উপরিউক্ত 'বন্দী-বন্দনা' গানটির যোগাযোগ ছিলো। এই প্রভাতী গান গেয়ে কবি নজরুল সকলকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন গানটি এইরূপ :

'আজ রক্ত-নিশি ভোরে
একি এ শুনি ওরে
মুক্তি কোলাহল বন্দী শৃঙ্খলে,
ঐ কাহারা কারাবাসে
মুক্তি হাসি হাসে
টুটেছে ভয় বাধা স্বাধীন হিয়া তলে।
ওরা দু'পায়ে দলে গেলো মরণ শঙ্কারে
সবারে ডেকে গেলো শিকল ঝঙ্কারে,
বাজিল নভ-তলে
বিজয়-সঙ্গী বন্দী গেয়ে চলে,

বন্দীশালে মাঝে ঝঞ্ঝা পড়ে ছেয়ে
উতল কলরোল।
আজি কারার সারা দেহে মুক্তি ক্রন্দন
ধ্বনিছে হা-হা- স্বরে ছিঁড়িতে বন্ধন
নিখিল দেহ যথা বন্দীকারা, সেই
কেন রে কারাত্রাসে মরিবে বীর দলে?
'জয় হে বন্ধন' গাহিল তাই তারা
মুক্ত নভ-তলে।'

এর পর শুরু হলো অনশন ধর্মঘট এবং বন্দীরা জোর গলায় জানিয়ে দিলেন, সম্মানজনক অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আমাদের চলা থামছে না—থামবে না প্রথম প্রথম এই ধর্মঘটের কথা বাইরে প্রকাশ হয়নি। তারপর পরিস্থিতি চরমে পৌঁছালো। কর্তৃপক্ষ আর আঁচল দিয়ে আগুন চেপে রাখতে পারলো না! সেই আগুন ছড়িয়ে গেলো সবখানে। এই অনশন ধর্মঘট নিয়ে সারা বাংলাদেশ ও নিখিলভারতের নরম-চরমপন্থী নেতারা, ছাত্র-যুবকেরা, এমন কি সাধারণ লোকেরাও ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। এমন কি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। কবি নিজে সৈনিক পুরুষ, একরোখা লোক, যা করবেন তা কিছুতেই তাঁকে রোখা যেতো না। এই অনশনের সময় সমস্ত বন্দীরই অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। বন্দীদের হাত-পা-মাথা চেপে ধরে চামুণ্ডার দল জোর করে নল দিয়ে খাওয়ানোর জন্যই বেশীর ভাগ বন্দীরা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, শুধু তাই নয় কারুর জীবনসংশয়ও হয়েছিলো। সকল বন্দীদের জন্য বিশেষ করে বিদ্রোহী কবির জন্য দেশবাসী উদ্বেগে অধীন হয়ে ওঠে। সভাসমিতি—প্রস্তাব পাশ—নানারকম চেষ্টা চলতে থাকে। কবিকে দেশের বড়ো বড়ো নেতারা অনশন ত্যাগের অনুরোধ করে পাঠান। কবি 'মরণ-বরণ' গান লিখে সকলকে মৃত্যু-ভয়শূন্য হয়ে অনশনের পথে ডেকেছেন, তিনি হয় সকলকে নিয়ে মরবেন, নয় সকলকে নিয়েই সাফল্যের মধ্য দিয়ে অনশন ত্যাগ করবেন—এই তাঁর মস্ত বড় জিদ। পরে স্বয়ং বিশ্ব কবি তার বার্তায় জানালেন Give up hunger strike, our leterature claimsy ou—Rabindranath.

এবার কবি একটু বিচলিত হলেন। কবি নজরুলের বাংলা সাহিত্যের জন্য এবং ভারতের ভবিষ্যতের জন্য বেঁচে থাকা দরকার এ-কথা বিশ্বকবি স্বীকার

করলেনও তৎকালীন অন্যান্য সাহিত্যিকরা না করে দেশসেবকদের কাছে হেয় হয়েই আছেন। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটকখানি কবি নজরুলকে উৎসর্গ করেন এবং নজরুল-বন্ধু শ্রীপবিত্র বন্দোপাধ্যায়কে দিয়ে হুগলী জেলে পাঠিয়ে দেন পুস্তকখানি নিয়ে পবিত্রবাবু হুগলীতে আসেন।

পবিত্রবাবুর হাত থেকে 'বসন্ত' নাটকখানি হাতে নিয়ে নজরুল দেখলেন, কবিগুরু বসন্ত নাটকের উৎসর্গ পৃষ্ঠায় ছাপা অক্ষরে 'শ্রীমান কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কল্যাণীয়েষু' লিখে নীচে তাঁর নাম কালি দিয়ে সই করেছেন।

কবি নজরুল বিশ্বকবির তারবার্তা ও 'বসন্ত' নাটকসহ আশীর্বাদ পেয়ে একটু চিন্তিত হলেন! জেলের সাথীরাও মাঝপথে থমকে দাঁড়ালেন—অবশ্য অনশন-ধর্মঘট চালু রেখে। এমন সময় বাইরের আন্দোলনের চাপে ও রবীন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপে বন্দীদের দাবী মেনে নেবে বলে সরকার স্বীকার করলো। তখনও চির-অবিশ্বাসী বৃটিশ সরকারকে বন্দীরা বিশ্বাস করতে পারলেন না। অনশন-ধর্মঘট চলছে, এমন সময় একদিন কলকাতা থেকে পবিত্রবাবুর সঙ্গে বিরজাসুন্দরী দেবী, গায়ক নলিনীকান্ত সরকার, কবি সুবোধ রায়, হুগলী বালির ৺চারুশীলা মিত্র প্রভৃতি হুগলী জেলের গেটে এসে উপস্থিত হলেন। বিরজাসুন্দরী দেবীকে কবি মা বলে ডাকলেন। 'সর্বহারা' নামক শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থখানি কবি উৎসর্গ করেছিলেন এঁকেই। তাতে লিখেছিলেন :

> 'সর্বংসহা সর্বহারা জননী আমার!
> তুমি কোনদিন কারো করোনি বিচার,
> করেও দাওনি দোষ। ব্যথা-বারিধির,
> কূলে বসে কাঁদো মৌনা বন্যা ধরণীর
> একাকিনী? যেন কোন্ পথ-ভুলে আসা
> ভিন্-গাঁর ভীরু মেয়ে—কেবলি জিজ্ঞাসা
> করিতেছ আপনারে, 'এ আমি কোথায়?'—

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তারবার্তায় ও বিরজাসুন্দরীর বহু সাধ্য সাধনায় এবং সরকার পক্ষের দাবী মিটাবার স্বীকৃতিতে মায়ের হাতে লেবুর রস পান করে কবি কাজী নজরুল ইসলাম অনশন ভঙ্গ করলেন।

অনশন ভঙ্গ হবার পর কর্তৃপক্ষ বন্দীদের সমস্ত দাবীই মেনে নিয়ে বিবাদ মিটিয়ে দিলো, কিন্তু সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠা কেটে তারপর পড়তে দিতো।

এরপর কবি কাজী নজরুল ইসলাম বহরমপুর জেলে বদলি হয়ে যান। কবি উক্ত জেলে যেতেই জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীবসন্ত ভৌমিক একটি হারমোনিয়াম তাঁর পাঠিয়ে দেন। হারমোনিয়াম পেয়ে কবি ও গায়ক নজরুলের আর আনন্দ ধরে না। নাওয়া-খাওয়া ভুলে দিনরাতই প্রায় গান গাইতেন, আর মনের সুখে কবিতা, প্রবন্ধ লিখতেন। হুগলী জেলের সংগ্রামের পর নজরুল বহরমপুর জেলে বেশ আনন্দেই ছিলেন।

কবির স্মৃতি তরঙ্গ

—বেগম শামসুন্নাহার মাহ্‌মুদ

নজরুলের আবির্ভাব অত্যন্ত আকস্মিক প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার পাতায়-পাতায় তাঁর আগুন-ঝরানো লেখা হঠাৎ চমক লাগালো বাঙালী পাঠকসমাজের মনে। কে এই সৈনিক কবি?… উঃ কী আগুন বৃষ্টি! আর কী ভয়ানক শব্দ গুড়ুম দ্রুম—দ্রুম। একটুও আকাশ নীল দেখা যাচ্ছে না যেন সমস্ত আসমান জুড়ে আগুন লেগে গেছে। বাস্তবিক এ গোলা বারুদের রঙে আসমান-জমীন লালে লাল হয়ে গেছে! সবচেয়ে বেশী লাল, ঐ বুকে বেয়োনেট-পোরা হতভাগাদের বুকের রক্ত। এই ধরনের লেখা সৈনিক-কবি হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের চমক-লাগানো লেখা প্রায়ই দেখা যেতে লাগলো মাসিক পত্রিকার পাতায়। বাঙালী ধাক্কা লাগলো তাঁর মর্মভেদী স্বর…ওরে আয়, ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হতে ঘন রণভেরী শোনা যায়।'

মহাযুদ্ধের শেষে ফিরে এলেন নজরুল। তাঁর রচনা তখন পুরোদমে চলেছে আর আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে যেন বাঙালীর মনে। 'মোসলেম ভারতে' মাসের পর মাস বেরুতে লাগলো 'বিদ্রোহী" 'কামাল পাশা' প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতা। বাঙালীর ঘরে ঘরে ধ্বনিত হলো :

'বল বীর—বল উন্নত মম শির।
শির নেহারি আমারি, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!'…
'ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই
অসুরপুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই।'

যেখানেই গেছেন যে কাজেই হাত দিয়েছেন নজরুল, ঝরেছে প্রাণের প্রাচুর্য। তাঁর প্রচণ্ড প্রাণশক্তি দিয়ে তিনি সজীব করে তুলেছেন চারিদিক। জেলখানায় বসে তিনি গান রচনা করতেন, গাইতেন, দল গড়তেন। তাঁর আশপাশে এসে জুটতেন ঘরছাড়া রাজনৈতিক বন্দীর দল। তাঁদের হাত-পায়ের শিকল

ঝন্ঝনিয়ে বাজতো। নজরুলের সুরে সুর মিলিয়ে মহ উন্মাদনায় তাঁরা গাইতেন :

'শিকলপরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল,
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবো রে বিকল।'

এভাবে কয়েদখানার আবহাওয়াকে কি করে তাঁরা উতরোল করে তুলতেন, অতিষ্ঠ করে তুলতেন জেল কর্তৃপক্ষকে—এ-সব গল্প আমরা নজরুলের মুখে শুনেছি। তাঁর ১৯২৯ সালের চট্টগ্রাম সফরের কথা বলছি। আমাদের বৈঠকখানায়'দাদার (জনাব হবীবুল্লাহ্ বাহার) সঙ্গী ছাত্রদল, অন্যান্য সাহিত্যিক ও সাহিত্যমোদীদের মজলিস জমজমাট করে তুলতেন নজরুল—তাঁর গান, গল্প ও অবৃত্তি দিয়ে।

দেখতে দেখতে 'অগ্নিবীণা', ভাঙার গান' প্রভৃতি পুস্তকের গান ও কবিতা দেশের মাঠে-ঘাটে ছড়িয়ে পড়লো। দেশের মুক্তি আন্দোলনে একটা প্রেরণার উৎস সৃষ্টি করলো নজরুলের সাহিত্য ও জীবন। রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়ালেন ঐটুকুই বিদ্রোহী কবির সব নয়। তাঁর বিদ্রোহ শুধু বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধেই নয়। সমাজের মধ্যে মানুষে-মানুষে বিভেদ, অর্থনৈতিক বিভেদ ও সামাজিক মর্যাদার পার্থক্য—এখানেই খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর বিদ্রোহের মূল সুর। দেশের লাঞ্ছিত, ভাগ্যাহত, চাষীমজুর, ধীবর—সকলেই মর্যাদা পেলো তাঁর কাব্যে। তাদের করুণ কাহিনী রূপ পেলো তাঁর কবিতার ছন্দে, তাঁর গানের সুরে।

রাজনৈতিক আন্দোলনের হট্টগোলের মাঝখানে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সাম্যবাদ প্রচারের উত্তেজনার ভিতরে একই সময় পাশাপাশি বিশ্ব-প্রকৃতি কি করে তাঁকে হাতছানি দিতো তা আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। সারাদিন সভা-সমিতি, বক্তৃতা-মজলিস নিয়ে মেতে থাকবার পর রাত্রিবেলা গভীর অন্ধকারে প্রকৃতি নার রূপের ঐশ্বর্য মেলে ধরতো তাঁর কাছে। চট্টগ্রামের গিরি-নদী যেন তাঁর মনকে উতলা করে তুলছে। রাত্রির পর রাত্রি অবিরাম তিনি লিখে যেতেন 'সিন্ধু'র প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তরঙ্গ 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি'। এই সময়েই তিনি লিখেছেন' 'অনামিকা', 'গোপন প্রিয়া' প্রভৃতি 'সিন্ধু-হিন্দোল' কাব্যের শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতাগুলি। তিনি লিখেছিলেন আমাকে একটা চিঠিতে—'আমার পনেরো আনা হয়েছে স্বপ্নে বিভোর, সৃষ্টির ব্যথায় ডগমগ। আর এক আনা করছে পলিটিক্স, দিচ্ছে বক্তৃতা, গড়ছে সঙ্ঘ।

নদীর জল চলেছে সমুদ্রের সাথে মিলতে—দু'ধারে গ্রাম সৃষ্টি করতে নয়। যেটুকু জল তার ব্যয় হচ্ছে, দু'ধারে গ্রামবাসীদের জন্য—তা তার এক আনা; বাকি পনরো আনা গিয়ে পড়ছে সমুদ্রে; আমার পনেরো আনা চলেছে আর চলেছে—সৃষ্টি-দিন হতে—আমার সুন্দরের উদ্দেশ্যে। আমার যতো বলা সেই বিপুলতরকে নিয়ে—আমার সেই প্রিয়তম, সেই সুন্দরতমকে নিয়ে, রাজনৈতিক হট্টগোলের মাঝেও তিনি সেই সুন্দরের স্বপ্নে বিভোর হয়ে যেতেন।

নজরুলের অল্প কয়েক বছরের কবি-জীবন। শেষের দিকে তাঁর প্রতিভার সেই আবেগ ও উন্মাদনা অনেকটা স্থিতিলাভ করলো। এ সময় তিনি গান ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য কিছু রচনা করেন নি। গান তিনি রচনা করেছেন অসংখ্য। তার মধ্যে বহু গান সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ হয়ে থাকবার দাবী রাখে। তাঁর প্রথমবার চট্টগ্রাম অবস্থান কালে যেমন তিনি মজলিস জমাতেন স্বদেশী গান দিয়ে—তেমনি দ্বিতীয়বারে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করতেন গজলের সুরে সুরে। আমাদের বৈঠকখানায় বসতো গানের মজলিস। কবি-কণ্ঠে ঝরে ঝরে পড়তো সঙ্গীতের আনন্দ ও বেদনা।

কাজী সাহেব

—নারায়ণ চৌধুরী

…কাজী সাহেবের কবি প্রকৃতির দুই দিক প্রথমত; তিনি নির্যাতিত শোষিত সর্বহারা শ্রেণীর মানুষের প্রতি অপরিমেয় দরদ প্রকাশ করে বাংলা কবিতার প্রচলিত সংস্কারকে আঘাত করেছেন; দ্বিতীয়তঃ, তিনি কৃত্রিম বিধিনিষেধ আর অনুশাসনের নিগড় ভাঙতে চেয়েছেন। তাঁর কবিতায় প্রবৃত্তির একটা প্রচণ্ড উদ্দমতা লক্ষ্য করা যায়।

কাব্যজীবনের একটি বিশেষ পর্বে এসে কবি নজরুল ইসলাম আর বাণীরূপেই শুধু তৃপ্ত থাকতে পারেন নি, তিনি সুররূপের ধ্যানেও নিবিষ্ট হলেন। কবি অসি ছেড়ে বাঁশী ধরলেন! সুর রূপী মর্মবাঁশীর লীলা তাঁর মন কেড়ে নিলো। সে বাঁশীর সুর যে পরবর্তী অধ্যায়ে কতো বিচিত্র ভঙ্গিমায় আর ঢঙে প্রকাশিত হয়েছে তা কবি-রচিত অজস্র গানের শ্রেণী-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করলেই সুস্পষ্ট বোঝা যায়। এতো বেশী সংখ্যক গান (কাজী নজরুল ইসলাম সর্বসাকুল্যে অনুমানিক তিন হাজার গান রচনা করেছেন। পৃথিবীর সঙ্গীত রচনার ইতিহাসে এইটেই বোধহয় সর্বোচ্চ রেকর্ড। রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যা আনুমানিক আড়াই হাজার) আর এত বিচিত্র ঢঙের গান বাংলাদেশের অন্য কোন সুরকার আজ পর্যন্ত রচনা করেন নি। এ থেকে এই কথা এক প্রকার বিনা দ্বিধায় বলা চলে যে, সঙ্গীত আর কবিতার মধ্যে সঙ্গীতই নজরুলের ব্যাক্তিত্ব বিকাশের অধিক সহায়ক ছিলো, তাঁর আত্মপ্রকাশের উপযুক্ততর মাধ্যম ছিলো। সঙ্গীতে তিনি দেশপ্রেম, যৌনচেতনা, প্রেম, ভক্তি, নিসর্গ প্রীতি, নারীর মর্যাদায় বিশ্বাস,

গণমুক্তির প্রতি আস্থা প্রভৃতি বিচিত্র মনোভাবকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর কাব্যের এ সকল ভাবেরই প্রাধান্য, তবে সঙ্গীতে সে প্রকাশ অধিকতর নিপুণতার সঙ্গে সংশোধিত হয়েছে সে কথা বলা দরকার। কেননা এ ক্ষেত্রে বাণীর মাধুর্যের উপর অতিরিক্ত একটি গুণ আরোপিত হয়েছে—সুর সৌন্দর্য। বাণী আর সুরে মিলে নজরুলের অদম্য প্রাণের আবেগ অতি চমৎকার। এক সুসামঞ্জস্য শিল্পরূপ লাভ করেছে।

নজরুল সঙ্গীতজীবনের সূত্রপাত করেন বাংলা গজল রচনার দ্বারা। বাংলা ভাষায় এ জিনিস একেবারেই অভিনব।

উর্দুতে এই ধরনের গান অনেক আছে। উর্দু কবি গালিবের একাধিক গজল রচনা বিদ্যমান। কাজী নজরুল গজল গান বাংলায় বিধিবদ্ধভাবে প্রবর্তন করেন। এক সময় বাংলার আকাশে বাতাসে নজরুলের গজল গান ভেসে বেড়িয়েছে···আজ অবশ্য সে সব গান কারও মুখে শোনা যায় না, তবে এক সময়ে মুটে-মজুর, গাড়োয়ান, রিক্সাওয়ালা প্রভৃতি খেটে-খাওয়া মেহনতী মানুষের মুখেও এই সকল গানের কলি সদাসর্বদা সঞ্চরণ করে ফিরেছে। এ থেকেই গানগুলির ব্যাপক জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়—

> 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল',
> 'আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী',
> 'চেয়ো না সুনয়না, আর চেয়ো না এই নয়ন পানে',
> 'এত জল ও কাজল চোখে পাষাণী আনলে বল কে',
> 'কেন আন ফুলডোর আজি এ বিদায় বেলা',
> 'নহে নহে প্রিয়, এ নয় আঁখিজল',

প্রভৃতি হল তাঁর বহুখ্যাত গানগুলির কয়েকটি প্রথম পদ। এ সকল গান এক সময়ে দিলীপকুমার রায় ইন্দুবালা, কমলা ঝরিয়া, শচীন দেববর্মন প্রসিদ্ধ গায়কগণ জনসমাজে প্রচার করেছেন।

বাংলার জাতীয়তাবাদী মুক্তি সংগ্রামের অধ্যায়ে নজরুল রচিত 'কোরাস' গান যৌথ সংগীতের ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান যোজনা। অত্যাচারী বিদেশী

শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ জনমানষের প্রতিরোধস্পৃহা আর সংগ্রাম চেতনা এই সকল কোরাস গানের দ্বারা যে ফেলার কারণই ছিল, বুলবুলকে চোখের দেখা দেখতে পাওয়া। সেই আশায় তিনি লালগোলা স্কুলের হেডমাস্টার বরদাচরণ মজুমদারের কাছে যান নলিনীকান্ত সরকার মহাশয়কে সঙ্গে নিয়ে। সিদ্ধযোগী বলে মজুমদার মশাই-এর খ্যাতি ছিল—তবে তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন না, তিনি গৃহী যোগী। শোনা যায় যে বরদাচরণ নজরুলের এই কামনা চরিতার্থ করেছিলেন—নজরুলের চোখের সামনে বুলবুল এসে দাঁড়িয়েছিল। এর পর স্বভাবতঃই নজরুল মজুমদার মশাই-এর সঙ্গে হামেশাই দেখা করতে লাগলেন। মজুমদার মশাই শ্মশানে গিয়ে কালী সাধনা করতেন। তবে তিনি আত্মপ্রচারে বিমুখ ছিলেন এবং সাধনক্ষেত্রে অন্য কাউকে টানা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল এবং যিনি অনধিকারীকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। তাঁকে খুব কাছাকাছি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সম্পর্কে আমি তাঁর ভাগিনেয়। কবি অধ্যাত্ম সাধনামার্গে কতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, তা বলার অধিকার আমার নেই, তবে এই পথে জোর করে পা দিতে গিয়ে বরদাচরণের মাসতুতো ভাই (নিবন্ধকারের আপন মামা) হরেন সান্যাল মশাই-এর সাময়িক মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছিল, এটা আমি ছেলেবেলায় দেখেছি। হরেন মামা বরদাচরণের নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে অমাবস্যার রাতের অন্ধকারে গোপনে দাদার পিছু পিছু শ্মশান অবধি গিয়েছিলেন—তারপর কী ঘটেছিল তা কেউ জানে না, তবে তিনি দু-হাত চোখের সামনে তুলে "রক্ত—রক্ত" আর্ত চিৎকারে সকলের উচ্চারিত করে বাড়ি ফিরেছিলেন সে যা-ই হোক, নজরুল যে অধ্যাত্মশক্তি সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়েছিলেন এবং এর প্রভাব তাঁর বাস্তব জীবনকে অনেকখানি আচ্ছন্ন করেছিল এটুকু নির্ণয় করা যাচ্ছে।

১৯৪২-এর জুলাই মাসে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর প্রোগ্রামে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে টের পেলেন কবি টের পেয়ে তাঁর জিহ্বা কাজ করছে না—কথা বলতে গিয়ে গলা আটকে আসছে। তার আগে থেকেই নিজেই অসুস্থতা বুঝতে পেরেছিলেন, তবে তেমন গ্রাহ্য করেন নি। রেডিওর প্রোগ্রাম করা সম্ভব হ'ল না, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন,—কবি অসুস্থ। এরপর নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ট্যাক্সি করে তাঁকে বাড়ি নিয়ে এলেন। এই সময়ে কবি দৈনিক

'নবযুগে'-এর সম্পাদক ছিলেন। লুম্বিনী পার্কের হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসার পর মধুপুরে বায়ু পরিবর্তনের এবং বিশ্রামের জন্য পাঠানো হ'ল।

অন্যের কাছে প্রকাশ পাওয়ার অনেক আগেই নজরুলের অসুখটা দেহে আত্মবিস্তার লাভ ক'রেছিল। কাজেই যখন তাঁর চিকিৎসা শুরু হ'ল তখন তা উপশমের বাইরে চ'লে গেছে। অন্যান্য দেশে কী হয় তা আমার জানা নেই, তবে আমাদের এদেশে, শিল্পী, সাহিত্যিক শ্রেণীর মানুষদের ভাগ্যে যশ-খ্যাতি যতোই জুটুক' আর্থিক ক্ষেত্রে শতকরা নিরানব্বই- এরও বেশী জন তাঁরা উপেক্ষিত রয়ে যান—এটা অস্বীকার করা চলে না। নজরুলও তাঁর ব্যতিক্রম নন। তাঁর প্রথম বই 'ব্যাথার দান' মাত্র দুশো (?) টাকায় স্বত্ব বিক্রয় করতে হয়েছিল। হয়ত তখনকার দুশো টাকাই অনেক টাকা। 'কপিরাইট' না বেচলে হয়ত তখন তাঁর অতিবড বন্ধুও গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য হাতে নিতেন না। তাঁর দ্বিতীয় বই কপিরাইট বিক্রয়টা ঘটে ওই একই বছরে অর্থাৎ ১৯২১-এ 'রিক্তের দান' এবং আরও দুটি বই মাত্র চার-শ টাকায় স্বত্ব বিক্রয় করেন তিনি। 'অগ্নিবীণা' 'যুগবাণী' প্রথম দিকে কপিরাইট বিক্রয় করা হয় নি যাঁরা নজরুলের লেখার অনুরাগী তাঁদের মধ্যে কেউ গ্রন্থ প্রকাশের সমস্ত ব্যয় বহন করলেও, সরকারী ঝামেলার ভয়ে প্রকাশক হিসেবে নিজের নাম ছাপাতে রাজী হন নি—আর্য পাবলিশিং হাউস থেকে যুগবাণী এবং অগ্নিবীণা প্রকাশক হিসেবে নজরুলের নামাঙ্কিত হয়েই বেরিয়েছিল। পরবর্তী-কালে অবশ্য 'অগ্নিবীণা'র কপিরাইট কেনেন ডি. এম. লাইব্রেরী। ডি. এম. লাইব্রেরী নজরুলের অধিকাংশ বই-প্রকাশ করেছেন। গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তির আগে নজরুল-পরিবারের জীবনযাত্রা প্রধানতঃ তাঁর লেখার রয়্যালটির উপরেই নির্ভরশীল ছিল। তাঁর 'বিষের বাঁশী' এবং 'ভাঙার গান' সরকার থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এই বাজেয়াপ্ত বইগুলি অনেক গোপনে কিনতেন এবং সেই বিক্রয়ের টাকা নজরুল পরিবারের আর্থিক দুর্দিনে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছে। কেন না, কোনো চাকুরিতেই তিনি স্থিরভাবে বেশিদিন টিকে থাকতে পারতেন না।

অনেকের ধারণা, নজরুলের আয় ছিল প্রচুর কিন্তু ব্যয়ে হাতখানা তাঁর এমনই দরাজ যে, টাকা যেমন এসেছে তেমনি হাওয়ার আগে উড়ে গিয়েছে। এর খানিকটা অস্বীকার করে চলে না—বন্ধু-বান্ধবদের খাইয়ে অথবা তাঁদের নিয়ে বেড়ানোর পিছনে তাঁর কম খরচ হয়নি। হিসেব ক'রে চললে হয়ত স্ত্রী

প্রমীলার অসুখের সময়ে এইচ, এম, ভি'র সমস্ত গানের রয়্যাল্‌টির বন্ধক রেখে তাঁকে চার হাজার টাকা ধারও করতে হত না। এমনি আরও অনেক অসুবিধের হাত থেকে নজরুল এবং তাঁর পরিবারবর্গ নিষ্কৃতি পেলেন হয়ত—কিন্তু তাতে করে নজরুল হয়তো কবি নজরুল হতে পারতেন না, কাজীই রয়ে যেতেন হয়ত। নজরুল—নজরুলই।

———

স্মৃতিচারণ

—বুদ্ধদেব বসু

আমার বাল্যকাল কেটেছে আজ মফঃস্বলে। দেশের বৃহৎ জীবনের বহুমুখী স্রোত সেখানে পৌঁছতো না—যদি বা কখনো পৌঁছতো, সে অনেক দেরী করে এবং অনেক ক্ষীণ হয়ে। অনেকগুলি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের গ্রাহক হয়ে বালক মনের প্রবল কৌতূহল যথাসম্ভব মেটাবার চেষ্টা করতুম; ওরই ভিতর দিয়ে রাজধানীর প্রাণকল্লোলের সঙ্গে ছিলো আমার পরিচয়।

কচিৎ এমন ঘটনাও দেশে ঘটে, যার অভিঘাতে ম্লানতম মফঃস্বলে থরথর করে কেঁপে জেগে ওঠে। গান্ধীজীর প্রথম অসহযোগ আন্দোলন তেমনি একটি ঘটনা। অবাক হয়ে দেখলুম নিঃস্ব নোয়াখালিতেও প্রাণের জোয়ার। দেশসুদ্ধ লোক যেন সব খোয়াবার মন্ত্রে ক্ষেপে গেলো।

সে সময়ে আমি যদি দশ বছরের বালক না হয়ে বিশ বছরের যুবা হতুম, তাহলে নিশ্চয়ই কলেজরূপী সরকারী গোলামখানার ধুলো গা থেকে ঝেড়ে ফেলে ভাগ্যের ভেলাকে ভাসিয়ে দিতুম বিপর্যয়ের অস্থির আবর্তে। কিন্তু আমি এতই ছোট ছিলুম যে, পিকেটিং করে জেলে যাবার পর্যন্ত উপায় ছিল না আমার। যা হোক কিছু একটা করে উত্তেজনার ধারাটাকে বইয়ে দেবার কোন পথ আমার খোলা ছিলো না বলেই মনে মনে এই নেশার উচ্ছ্বাসে অকণ্ঠ ডুবেছিলুম।

ঠিক এই উন্মাদনারই সুর নিয়ে এই সময়ে নজরুল ইসলামের কবিতা প্রথম আমার কাছে পৌঁছালো। 'বিদ্রোহী পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিক পত্রে, মনে হলো এমক কখনো পড়িনি। অসহযোগের অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মন-প্রাণ যা কামনা করছিলো, এ যেন তা-ই; দেশব্যাপী উদ্দীপনার এ-ই যেন বাণী। একজন মুসলমান যুবকের সঙ্গে পরিচয় হলো,'তিনি সম্প্রতি কলকাতা থেকে থেকে এসেছেন, এবং তাঁর কাছে একখানা খাতা—কী ভাগ্য! বিস্ময়!—সেই বাঁধানো খাতায় লেখা বিদ্রোহী কবির আরো অনেকগুলি কবিতা। নোয়াখালির রাক্ষসী নদীর আগাছা- কন্টকিত কর্দমাক্ত নদীতীরে বসে সেই খাতাখানা আদ্যন্ত পড়ে ফেললুম। তার মধ্যে ছিলো 'ওরে হত্যা নয়, আজ সত্যাগ্রহ, সত্যের উদ্বোধন',

ছিলো 'কামাল পাশা', আর কী-কী ছিলো মনে পড়ছে না। সেই সব কবিতা অচিরেই ছাপার অক্ষরে দেখা যেতে লাগলো, আর তাদের প্রবলতা আমাদের প্রশংসা করার ভাবটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিলো। তাঁর নিখাদ নির্ঘোষ আমাদের মনের মধ্যে কেবলই ঢেউ তুলে ফিরতে লাগলো :

'তোরা সব জয়ধ্বনি কর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখীর ঝড়।'

নূতনের কেতন সত্যি উড়লো। নজরুল ইসলাম বিখ্যাত হলেন। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে এতো অল্প সময়ের মধ্যে এতখানি বিখ্যাত অন্য কোন কবি হননি।

কে এই নজরুল ইসলাম? তাঁর সম্বন্ধে একটিমাত্র খবর পাওয়া গেলো যে, তিনি যুদ্ধ-প্রত্যাগত। প্রথম প্রথম তাঁর নামের আগে 'হাবিলদার' এবং 'কাজী' এই জোড়া খেতাব বসানো হতো—তার মধ্যে প্রথমটি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝ'রে পড়ে, দ্বিতীয়টি বহুদিন পর্যন্ত ঝুলে ছিলো। সামরিক বেশে তাঁর ছবি বেরোলো মাসিকপত্রে—ঠিক মনে নেই এটাই সেই ছবি কিনা যাতে কবি একটা কামানের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে—তরুণ বলিষ্ঠ চেহারা, ঠোঁটের উপর পাতলা গোঁফের রেখা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। যে সব ভাগ্যবান কবিকে সচক্ষে দেখে এসেছে, তাদের মুখে কালক্রমে আরো শুনলুম, যে তিনি বেপরোয়া দিলখোলা ফুর্তিবাজ মানুষ, এবং তাঁর স্ত্রী হিন্দু কন্যা।

পটপরিবর্তন ক'রে আসা যাক দশ বছর পরে, ঢাকায় এসেছেন পল্টনে, 'কল্লোল-প্রগতির' যুগে। নজরুল ইসলাম ঢাকায় এসেছেন এবং গান গেয়ে সারা শহর মাতিয়ে তুলেছেন। 'কল্লোলে' গজল-গানের প্রথম পর্যায় বেরিয়ে গেছে—তার পরে ব'য়ে চলেছে গানের স্রোত—যেন তা কখনো ক্ষান্ত হবে না, যেন তা কখনো ক্লান্ত হবে না। সেবারে ঢাকায় সুধীজনের মধ্যে নজরুলকে নিয়ে কাড়াকাড়ি, জনসাধারণ তাঁর গান শুনে আত্মহারা, কেবল কতিপয় দুর্জয় দুর্মনের পক্ষে তাঁর প্রতিপত্তি এত দুঃসহ হলো যে, তাঁর শেষ পর্যন্ত তার উপর গায়ের জোরের গুণ্ডামি করে ঢাকার ইতিহাসে একেবারেই অনেকখানি কালিমা লেপন করে দিলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বারে এক মুসলমান অধ্যাপকের বাসা, সেখান থেকে নজরুলকে ছিনিয়ে আমরা কয়েকটি উৎসাহী যুবক চলেছি আমাদের

'প্রগতির' আড্ডায়। বিকেলের ঝকঝকে রোদ্দুরে সবুজ রমনা জ্বলেছে। হেঁটেই চলেছি আমরা, কেউ কেউ বাইসাইকেলটাকে হাতে ধ'রে ঠেলে নিয়ে চলেছে, জনবিরল সুন্দর পথ আমাদের কলরবে কলরবে মুখর, নজরুল একশো। চওড়া মজবুত জোরালো তাঁর শরীর, লাল-ছিটে-লাগা বড়ো মদির তাঁর চোখ, মনোহর মুখশ্রী, লম্বা ঝাঁকড়া চুল তাঁর প্রাণের ফুর্তির মতোই অবাধ্য। গায়ে হলদে কিংবা কমলা রঙের পাঞ্জাবি এবং তার উপর কমলা কিংবা হলদে রঙের চাদর—দুটোই খদ্দরের। 'রঙিন জামা পরেন কেন?' 'সভায় অনেক লোকের মধ্যে চট করে চোখে পড়ে, তাই।' ব'লে ভাঙা-ভাঙা গলায় হো-হো করে হেসে উঠলেন।

আমাদের টিনের ঘরে নিয়ে এলাম তাঁকে, তারপর হার্মোনিয়াম, চা পান, গান, গল্প, হাসি। আড্ডা জমলো প্রাণমন খোলা, সময়ের হিসেব-ভোলা নজরুল যে ঘরে ঢুকতেন সে ঘরে কেউ ঘড়ির দিকে তাকাতো না। আমাদের প্রগতির' আড্ডায় বার কয়েক এসেছেন তিনি, প্রতিবারেই আনন্দের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। প্রাণশক্তির এমন অসংবৃত উচ্ছ্বাস, এমন উচ্ছৃঙ্খল. অপচয় অন্য কোন বয়স্ক মানুষের মধ্যে আমি দেখিনি। দেহের পাত্র ছাপিয়ে সব সময় উথলে পড়ছে তাঁর প্রাণ, কাছাকাছি সকলকেই উজ্জীবিত করে, মনের ময়লা খেদ ও ক্লেদ ভাসিয়ে দিয়ে। সকল লোকই তাঁর আপন, সব বাড়িই তাঁর নিজের বাড়ি। শ্রীকৃষ্ণের মতো, তিনি যখন যার তখন তার। জোর করে একবার ধরে আনতে পারলে নিশ্চিন্ত, আর ওঠবার নাম করবেন না—জরুরী এনগেজমেণ্ট যাবে ভেসে। ঝোঁকে পড়ে দলে পড়ে সবই করতে পারেন! একবার কলকাতার খেলার মাঠে বুঝি মোহনবাগানের জিৎ হবো, না কি এমন আশ্চর্য কিছু ঘটলো। ফুর্তির ঝোঁকে' দলের চার পাঁচজন খেলার মাঠ থেকে শেয়ালদা স্টেশনে এবং শেয়ালদা থেকে একেবারে ঢাকায় চ'লে এলেন—নজরুলকে ধরে নিয়ে এলেন সঙ্গে। হয়তো দু' দিনের জন্যে কলকাতার বাইরে কোথাও গান গাইতে গিয়ে সেখানেই এক মাস কাটিয়ে দিলেন। সাংসারিক দিক থেকে এ চরিত্র অনুকরণযোগ্য নয়, কিন্তু এতে যে রম্যতা আছে তাতে সন্দেহ কী! সে কালে বোহিমিয়ানের চাল-চলন অনেকেই অভ্যাস করেছিলেন—মনে মনে তাঁদের হিসাবের খাতায় ভুল ছিলো না—জাত বোহিমিয়ান এক নজরুল ইসলামকেই দেখেছি। অপরূপ তাঁর দায়িত্ব-হীনতা। সেই যে গোলাম মুস্তাফা একবার ছড়া কেটেছিলেন—

'কাজী নজরুল ইসলাম
বাসায় একদিন গিছলাম।
ভায়া লাফ দেয় তিন হাত,
হেসে গান গায় দিন রাত।
প্রাণে ফুর্তির ঢেউ বয়;
ধরায় পর তার কেউ নয়।'

এর প্রতিটি কথা আক্ষরিক সত্য।

কথাবার্তার আসরে তিনি যে খুব দীপ্যমান, তা নয়। নিজের আনন্দেই তিনি মত্ত, অন্যের কথা মন দিয়ে শোনবার সময় কই? নিজে রসিকতা ক'রে নিজেই হেসে লুটিয়ে পড়ছেন। কথার চেয়ে বেশী তাঁর হাসি, হাসির চেয়ে বেশী তাঁর গান। একটি হার্মোনিয়ম এবং যথেষ্ট পরিমাণে চা এবং পান দিয়ে একবার বসিয়ে দিতে পারলে তাঁকে দিয়ে একটানা পাঁচ সাত ঘণ্টা গান গাওয়ানো কিছুই নয়—গানে তাঁর আন্তি নেই; ঘুমের সময় ছাড়া সবটুকু সময় গাইতে হলেও তিনি প্রস্তুত। কণ্ঠস্বর মধুর নয়, ভাঙা খাদের গলা, কিন্তু তার গান গাওয়ায় এমন একটি আনন্দিত উৎসাহ, সমস্ত দেহ-মনে প্রাণের এমন একটি প্রেমের উচ্ছ্বাস ছিলো যে, আমরা মুগ্ধ হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনেছি। সে সময়ে গান রচনা করতেও দেখেছি তাঁকে—হার্মোনিয়ম, কাগজ আর কলম নিয়ে বসেছেন বাজাতে বাজাতে গেয়েছেন, গাইতে গাইতে লিখেছেন। সুরের নেশায় এসেছে কথা, কথার ঠেলা সুরকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সেবারে ঢাকায় যে সব গান তিনি লিখেছিলেন সেগুলি প্রায় সবই স্বরলিপি সমেত 'প্রগতি'তে বেরিয়ে ছিলো। 'আমার কোন কূলে আজ ভিড়লো তরী', 'এ বাসরে আসিলে কে গো / ছলিতে', 'নিশি ভোর হলো জাগিয়া পরাণ পিয়', এ সব গান ঢাকায় লিখেছিলেন বলে মনে পড়ছে। এইমাত্র শেষ করা গান কবির নিজের মুখে তক্ষুনি শুনতে শুনতে আমাদেরও মনের মধ্যে নেশা ধরে যেতো।

ঠিক মনে পড়ে না কোথায় নজরুলকে প্রথম দেখেছিলাম—ঢাকায় না 'কল্লোলে'র আড্ডায়। নিরবিচ্ছিন্নভাবে বেশিদিন ধার দেখাশোনা তাঁর সঙ্গে আমার কখনোই হয়নি, কলকাতায় এসে এখানে মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে, প্রতিবারেই তাঁর প্রাণশক্তির উল্লাস মুগ্ধ করেছে। সত্যিই তিনি যেন 'চির শিশু' 'চির কিশোর।' সম্প্রতি তাঁর মুখে বয়সের ছাপ দেখে ব্যথিত

হচ্ছিলাম—এইজন্যে ব্যথিত যে, প্রৌঢ় ঋতুর প্রশান্ত সৌন্দর্য সেখানে এলেনি তাঁর মুখে যেন ক্লান্তির ছায়া, যেন নিরাশার কালিমা। শেষ বার তাঁর সঙ্গে দেখা হলো বছর চারেক আগে—সেবার অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ঢাকা কেন্দ্রের আমন্ত্রণে আমরা একদল কলকাতা থেকে যাচ্ছিলাম। ষ্টিমারে অনেকক্ষণ একসঙ্গে কাটলো—দেখলাম তাঁর চোখ মুখ গম্ভীর, হাসির সেই উচ্ছ্বাস আর নেই। কথা প্রসঙ্গে বললেন I am the greatest yogi in Inbia' যোগসাধনা আরম্ভ করে তাঁর গায়ের রং তপ্তকাঞ্চনের মতো হয়েছিলো, একবার শ্রীঅরবিন্দ সূক্ষ্ম দেহে তাঁর কাছে এসে আধঘণ্টা বসেছিলেন—এমনি নানা কথা বললেন। কেমন-কেমন লাগলো। এর কিছুকাল পরে শুনলাম, নজরুল মানসিক অসুস্থতার জন্য চিকিৎসকের নজর-বন্দী হয়েছেন।

তাঁর পরে তাঁকে আর দেখিনি। আর দেখবো কিনা জানি না। প্রার্থনা করি, তিনি রোগমুক্ত হয়ে আমাদের মধ্যে ফিরে আসুন—তার কাব্যে তাঁর গানে, তার জীবনে পরিণত বয়সের শান্ত সুষমা প্রতিফলিত হোক। আর যদি তা না হয়, যদি তা না হয়, যদি এখানেই তার সাহিত্য-সাধনার সমাপন ঘটে তাহলেও, গেলো পঁচিশ বছর ধরে তিনি আমাদের যা দিয়েছেন, সেই তাঁর অজস্র কাব্য ও সঙ্গীত বাঙালীর মনে তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে? আমরা যারা তাঁর সমকালীন—আমরা তাঁর উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধা, আমাদের প্রীতি, আমাদের কৃতজ্ঞতা মহাকালের খাতায় জমা রাখলুম।

নজরুলের জীবনের শেষ কয়েকদিন

দাউদ হায়দার

এইতো এক বছর হয়নি, নজরুল ইসলামের কাছে বসেছিলাম। কোন কথা নয় চুপচাপ। দুজনের চোখের দিকে, কখনো বা দেয়ালে, ঘরের চাতালে, আশেপাশে, উদ্দেশ্যহীন—দুজনেই তাকিয়ে।

তখন বিকেল। ঘরে ফুল সাজানো। খুব কম স্পীডে ফ্যান চলছে। জানালায় রঙিন চক্রাবক্রা পর্দা। মোজেক করা ঝকঝকে মেঝে। ঘরের সঙ্গে বাথরুম। নজরুলের খাটের পাশে টিপয়। কয়েকটি শিশিবোতল। ট্যাবলেট। আরেকটি জানালার ধারে একজন বছর পঁচিশের জীবন্ত সুন্দরী নার্স। সাদা পোষাকে উজ্জ্বল। মাথায় চৌকোনো সাদা টুপি। জানালার একটি পাল্লা খোলা। এই তিনতলার রমনার রেসকোর্স অঞ্চলের খোলা মাঠ এবং গাছগাছালি ছুঁয়ে বাতাস ঢুকছে।

নজরুল মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করছেন। কখনো উদাসীনভাবে একদৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে আছি। ইচ্ছা হল বাইরে যাই। ঘর থেকে বেরিয়ে করিডরে গিয়ে দাঁড়ালুম। আমার অদ্ভুত লাগছিল এই ভেবে যার কাছে আমি এতক্ষণ বসেছিলাম তিনি কথা বলেন না, তার কোন বোধশক্তি নেই। গোটা বাঙালী জাতির কি অসীম শ্রদ্ধা এই মানুষটিকে ঘিরে, অথচ তিনি কিছুই বুঝতে পারেন না।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার কাঁধে একটি হাত পড়ল। তাকিয়ে দেখি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন। তিনি এখন একটু পায়চারী করতে বেরিয়েছেন। নজরুলের প্রতিবেশী তিনি। নজরুল এখানে একা নয়। ডাইনে বাঁয়ে জয়নুল, জসীমউদ্দীন, মওলানা ভাসানী। আমি ঢাকার পি, জি হাসপাতালের কথা বলছি। বলছি নজরুলের মৃত্যুর মাস-দুয়েকের আগের ঘটনা।

ঢাকা ছেড়ে চলে আসব। আমার এক আত্মীয় পি, জি, হাসপাতালে আছেন। ভাবলুম ওকেও দেখতে হবে, দেখা হবে জসীমউদ্দীন নজরুলকে।

আত্মীয়-পর্ব শেষ করে আমি প্রথমে জসীমউদ্দীনের ঘরে গেছি। জসীমউদ্দীনের ছোট মেয়ে, স্ত্রী এবং কয়েকজন আত্মীয় তাঁকে ঘিরে বসে আছেন। জসীম-উদ্দীনের চোখমুখের চেহারা প্রায় কচি আম শুকিয়ে গেলে যেমন কুঁকড়ে আসে, একাধিক ভাঁজ পড়ে, তেমনি। আস্তে কথা বলছিলেন। কোন কথা শোনা যায়, কোন কথা শোনা যায় না। সবসময় শুয়ে বসে থাকতে চান না। মাঝে মাঝে উঠে ঘুরে বেড়ান। জসীমউদ্দীন উঠলেন পরণে লুঙ্গি। গায়ে সাদা পাঞ্জাবী। দাড়িটা দুই-একদিন শেভ করা হয়নি, মুখে ধান কাটা হয়ে গেল যেমন খোঁচা খোঁচা নাড়াগুলো সারা মাঠ জুড়ে থাকে, জসীমউদ্দীনের দাঁড়ি-গুলো বলতে গেলে তাই। আমি তখন কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম। বাধা দিলেন। তিনি কাছে এসে বললেন, কলকাতায় কবে যাচ্ছ?

আমার উত্তর শেষ হতেই কবি সুফিয়া কামাল এলেন। সুফিয়া কামাল এসে শারীরিক বার্তা, শুধোলেন। কথাবার্তা চলছিল। জানাল আবেদীন ঘরে ঢুকলেন। ব্যাপারটা বেশ দেখবার মতো। ঘরে যেন কথাবার্তা জমছিল না। সবাই বিরাট করিডোরে এসে উপস্থিত হলাম। ঠিক হলো নজরুলের কাছে গিয়ে বসা যাক। সবাই যেন তাই চাচ্ছিলাম। ততক্ষণে নজরুলের ঘরে দুজন ডাক্তার এসেছেন। হেড নার্স এসে সেবার কতটুকু উন্নতি হলো, আলাপ করছেন। একজন রোগীর ঘরে কথাবার্তা চালানো যায় কিনা সেদিকে কারুর ভ্রূক্ষেপ নেই। ডাক্তার যেন কিছু বলতে গিয়ে বলতে পারছেন না। হয়তো তাঁর লজ্জা করছে। আসলে তখন আমাদের উচিত কি অনুচিত এই বোধটা প্রায় লোপ পেয়েছে।

জয়নুল আবেদীন বললেন, গতকাল নজরুলের একটি স্কেচ করছিলাম, শেষ হয়নি। কারণ, যখন অর্ধেক প্রায় হয়ে এসেছে, নজরুল তখন কি জানি, কি খেয়ালে খানিকটা নড়েচড়ে আরেক পাশে ফিরলেন। আমার একাগ্র দৃষ্টিতে ভাঁটা পড়ল। স্কেচটি শেষ হয়নি।'

জয়নুল বছর বিশ-পঁচিশ আগে নজরুলের একটি দুর্দান্ত স্কেচ করেছিলেন। সেটি এখন পর্যন্ত আলোচিত হয়। ছবিটির কথা আমার মনে পড়ল। জিজ্ঞেস করলাম, আপনার আগের স্কেচটি বেশ সুন্দর ছিল। আবার নতুন করে আঁকছেন? কথাটি মুখ থেকে বেরিয়ে যাবার পরেই মনে হলো বোকার মতো প্রশ্ন করেছি। ঠিক তাই।

জয়নুল বললে, 'বছর বিশ-পঁচিশ আগে নজরুলের যে চেহারা ছিল, এখন তা নেই।' কথাটি বলে তিনি উঠে গেলেন, স্কেচ খাতা এবং পেন্সিলটি আনতে। এদিকে নজরুলের ঘরে ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। বেশ কিছু সাক্ষাৎপ্রার্থী

বাইরে অপেক্ষা করছেন। ওদিকে মওলানা ভাসানীর ঘরে তাঁর দলের কিছু কর্মী। মওলানা মাঝে মাঝেই নাকি নজরুলের ঘরে চলে আসেন। দোয়া মওলানার হাঁটাচলা নিষেধ। তবু ডাক্তারদের কথা শুনতেন না।

মওলানা এবার তাঁর সহকর্মীদের ফেলে রেখে নজরুলের ঘরে এলেন, আসবার সময় বোধ হয়। জসীমউদ্দীনের ঘরে একবার উঁকি দিয়েছিলেন। দেখা পাননি। আসতে সঙ্গী পেলেন আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনকে। ঘরে যখন দুজন প্রবেশ করলেন, শুনতে পেলাম, প্রথম কথা, জয়নুল আজকাল শুধু স্কেচ করে বেড়াচ্ছেন। বোধহয় আর কোন কাজ নেই।

জয়নুল সাহেবের উত্তরটা বেশ মারাত্মক—ক্যামেরা যে দৃশ্য তুলে ধরতে পারবে না, আমি তার চেয়েও হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গি পেন্সিলে তুলে রাখবো।

মওলানার দ্বিতীয় কথাটি আমাকে ঘিরে। বেশ খানিকটা মজা পাওয়া গেল। মওলানার সঙ্গে আমার পরিচয় আগে থেকেই। আমি তার সন্তোষের বাড়িতে বারকয়েক ইন্টারভিউ নিতে গেছি, কিংবা রিপোর্টের জন্যে। মওলানার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে বিস্তর কথা হয়েছে। আমি প্রথমে একটি পত্রিকার হিসেবে কিছুদিন কাজ করেছিলাম।

এই প্রসঙ্গে একটু পরে আমি ফিরে আসছি। তার আগে অন্য কিছু কথা মনে পড়ল—যা নজরুলের শেষ জীবনের ঘটনা। ব্যাপারগুলো আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি?

নজরুল ইসলাম তখন সবেমাত্র ঢাকায় গেছেন। পরের দিন নজরুলের জন্মদিন। ঢাকায় নিয়ে গেছেন। নজরুলকে দেখবার জন্যে ঢাকার বিমান-বন্দরে অজস্র লোকের ভীড়। কবি যাতে অসুবিধায় না পড়েন, তার জন্যে যতরকম কড়া ব্যবস্থা নেওয়া উচিত সবই মুজিব সরকার নিয়েছেন। লোকের ভিড়ে যাতে কবির শারীরিক দুরবস্থা না ঘটে, তার জন্যে পুলিশ মিলিটারী পাহারা রয়েছে। একদিকে ফটোগ্রাফার সাংবাদিকের ভীড়, অন্যদিকে কৌতূহলী দর্শকদের। এয়ারপোর্টে ডাক্তার, নার্স, এ্যাম্বুলেন্স গেছে।

কবিকে এয়ার-কণ্ডিশানড গাড়িতে করে সরাসরি ধানমণ্ডীর সাতাশ নম্বর রোডের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। বাড়িটি দোতলা চারদিক খোলামেলা। একদিকে ধানমণ্ডীর লেক। বাড়ির সামনে বিরাট বাগান। সবুজ ঘাসের মাঠ। প্রচুর গাছগাছালি। বাড়িতেও গমগম করছে লোকজন। কবিকে নিয়ে গিয়ে

তোলা হলো বাড়ির দোতলায়। কবির সঙ্গে কবির আত্মীয়-স্বজন। সারাদিনই লোকের ভিড়। এই ভয়ে থাকা ভিড় কমাবার জন্যে পুলিশ পাহারা দেওয়া তখন হয়েছে। প্রথমদিন থেকেই উৎসাহী জনগণ প্রচুর যাতায়াত করছে।

প্রায় প্রতিদিন ভক্তের দল বেড়ে যাচ্ছে। হাতে হাতে ফুল মিষ্টি। কেউ কবির পাশে বসে ছবি তোলার জন্য ক্যামেরা নিয়ে ছবি তোলেন। কেউ কবির অভিব্যক্তি ধরে রাখবার জন্যে কটাকট ক্লিপ টেপেন। দেখা করবার সিস্টেম ছিল অন্যরকম। বেশিক্ষণ কেউ থাকতে পারবে না। ঘুরে দেখার রেওয়াজটাই ছিল বেশি। নজরুল দোতলার দক্ষিণ দিককার ঘরে থাকতেন। এই ঘরে আলো বাতাস প্রচুর। ঘরের ভেতর প্রমীলার ছবি টাঙানো। ফুলদানীতে গোলাপ, রজনীগন্ধা। ফুলের গন্ধে ঘরটা ম ম করে।

সকালে বিকালে একদল শিল্পী যান তাঁরা কবির নাম খুশি রাখবার জন্যে গান পরিবেশন করেন। প্রথম প্রথম কিছু উৎসাহী গোষ্ঠী নিয়মিত গান করতেন। পরে ভাঁটা পড়তে থাকে। সরকার পয়সা খরচ করে শিল্পী ঠিক করলেন। ওদের ডিউটি কবির মনোরঞ্জন করার জন্যে সকাল সন্ধ্যায় গান করতে হতো।

প্রথম বেশ কিছুদিন লোকজনদের ভিড় ছিল কল্পনাতীত। এই সময় কবির শরীর ছিল ভালো।

সকালে পরিচর্যা ছিল ঠিকমতো। স্নান করিয়ে ফতুয়া জাতীয় পাঞ্জাবী পরিয়ে, চুল আঁচড়িয়ে যখন জানলার পাশে বসিয়ে দেওয়া হতো হঠাৎ কেউ বলতে পারবে না, নজরুল ইসলাম কোন রোগে ভুগেছেন কিংবা তিনি কথা বলতে পারেন না মাঝে মাঝে শিশুর মতো অকারণে হাসেন। গান শোনেন একাগ্রচিত্তে।

নজরুল মাস চার-পাঁচেকের মধ্যে যেন একেবারে ভালো হয়ে উঠলেন। দু-একদিন পরে পরে শেভ করানো হয়। মাথায় তেল ঠিকমতো পড়ে। খাওয়া-দাওয়ার প্রতি বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তিনবেলা ডাক্তার দেখছে ওষুধ ফলমূল ঠিকমতো চলছিল। মাঝে মাঝে খালি গায়ে বিকেলে কি সকালে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতেন বাগানে।

ইতিমধ্যে নজরুলের জন্মদিন এলো ঢাকায় কাগজগুলো সংখ্যা প্রকাশ করছে। ঢাকায় সেবারে নজরুলের জন্মদিন দেখবার মতো। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে সকালে বিশাল অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে নজরুলকে নিয়ে যাওয়া হয়। নজরুল তখনো বেশ সুস্থ ছিলেন। এবং কি আশ্চর্য, নজরুল একটুও ঘাবড়াননি। চুপচাপ বসেছিলেন শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে। সে দৃষ্টিতে একটা আলাদা

ছাপ। নজরুল যেন মনে হচ্ছিল গান শুনেছেন একমনে।

নজরুলকে বাংলা একাডেমিতে নিয়ে যাওয়া বোধহয় সেদিন উচিত হয়নি। কেননা কয়েকদিন পরেই নজরুলের শরীর খারাপ হতে থাকে, ডাক্তার সরকারী মহল ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। চিকিৎসা চলতে লাগলো। কিছুটা সুস্থ হলে, মাসদেড়েক পরে ডাক্তারের একটি দল এলো রাশিয়া থেকে। চিকিৎসা চললো আদ্যোপান্ত। পরিশেষে রিপোর্ট দিলো এ ব্যাধি দুরারোগ্য। নজরুলের আরো কি উন্নত চিকিৎসা হতে পারে, তার জন্যে পরামর্শ শুরু হলো।

নজরুল বছর দুয়েক অন্তত সুস্থ ছিলেন। কিন্তু শেষের দিকে অর্থাৎ পঁচাত্তর থেকে আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেছেন। আগের মতো লোকজন ভিড় নেই। কেউ ফুল মিষ্টি নিয়ে যায় না। কোন শিল্পীগোষ্ঠী গিয়ে গান করে না।

নজরুলের আত্মীয়-স্বজন প্রায় সবাই একে একে ঢাকা ছাড়ছেন। সব্যসাচী এবং অনিরুদ্ধ বেশির ভাগ সময় কলকাতায় কাটান। সময় পেলে ঢাকায় যান।

কবিকে সঙ্গ দেবার জন্য বাহাত্তর থেকে চুয়াত্তর পর্যন্ত যে রৈ-রৈ ব্যাপার ছিল। পঁচাত্তর-এর শুরু থেকে তা সব বিলুপ্ত হয়েছিল। সরকারী ব্যবস্থায় যে লোকজনগুলো ছিল, তাঁরাই কালেভদ্রে যেতেন। ফিরোজা বেগম কবির সামনের বাসায় থাকতেন। তিনি প্রতিদিন সকাল বিকাল একমাত্র দর্শন কিংবা গায়িকা। মাঝে মাঝে গান করেন। কবি জসীমউদ্দীনের বয়স হয়েছিল তাঁর কোন কাজ ছিল না। বৃদ্ধা বয়সে চুপচাপ বসে থাকতে ভালো লাগত না। তিনি একটি রিক্সায় চেপে কমলাপুর থেকে সোজা চলে আসতেন।

আমরা তখন কবি প্রতিবেশী। আমাদের বাড়িটা পেরিয়ে গেলে মুজিবের বাড়ি। লেকের মোড়টা ঘুরে, ব্রীজটা বামে গেলে আমাদের বাড়ির আত্মীয়-স্বজন বিকেলে নিঃসঙ্গ কবির কাছে যেতেন। ফুল মিষ্টি যখন যা হয় নিয়ে যেতো।

ফিরে আসি আগের কথা। এ যাত্রায় ঢাকায় যাবার আগে বাংলাদেশের সংবাদপত্রে কবির শরীর খারাপের খবরটা জানতে পারি। সরকার উপযুক্ত চিকিৎসার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন।

ঢাকায় গিয়ে নানা ব্যস্ততায় জড়িয়ে পড়েছি। আসবার একদিন আগে জসীউদ্দীনকে দেখবার জন্যেই পি, জি, হাসপাতালে আমি যাই।

জসীমউদ্দীনকে দেখা শেষ করে আমরা নজরুলের ঘরে ঢুকলাম। নজরুলের

শরীর তখন ফুলে গেছে। মুখে অজস্র খোঁচা খোঁচা আগাছার মতো শুভ্র দাড়ি। মাথায় চুল নেই। টাক পড়েছে সামনের দিকে। দৃষ্টিতে দারুণ বিষণ্ণতা। ঘোলাটে চোখ। চিকিৎসা চলছে যথারীতি। কিন্তু এবার বাঁচবেন কিনা সঠিক করে তখনো বলা যাচ্ছিল না। কিছু খেতে পারেন না। অনেক কষ্টে সামান্য কিছু খাওয়ানো হয়। ওষুধপত্তর খাওয়াতেও অসুবিধা। আমি তাঁর ঘরের কাছে থাকতে থাকতেই ডাক্তার ওষুধ দিলেন। কিন্তু সে ওষুধ মুখ থেকে গড়িয়ে পড়লো, তিনি কথা বলতে পারেন, ইসারা করতে পারেন, তাকে জিজ্ঞেস করা যায়, ওষুধ না খাবার কারণ। কিন্তু এমন একজন রোগীকে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে যে কিছুই বলতে পারে না। তাঁর কোন বোধশক্তি নেই। ডাক্তার, নার্স প্রায় সবাই প্রতিদিন বেশি করে ঘাবড়ে যাচ্ছেন। চিকিৎসায় কোন উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। খবরের কাগজে নিয়মিত খবর বেরুচ্ছে।

এ যাত্রায় কবিকে দেখে মনে হলো, বোধহয় সত্যি বেশিদিন আর বাঁচবেন না। মৃত্যুর কাছে অবশ্যই নতজানু হতে হবে। বিদ্রোহী কবি কিংবা বাংলার বুলবুল বলে রেহাই নেই।

নজরুলের মুখে ভাঁজ পড়েছে। মুখের, বুকের মাংস ফ্যাকাশে। তিনি এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন। যেন কিছু বলতে চান, যেন এখনো সব কথা বলা হয়নি। কি বলবেন ?—তাঁর অসমাপ্ত গোপন কথা ?

এর কিছুদিন বাদে কলকাতায় ফিরে এসে কবির শরীরের খবর প্রায়ই পেতাম। কিন্তু এই তো দিন দশেক আগে, ফিরে আসার মাস দেড়েকের মধ্যে রেডিও চিৎকার করে উঠলো—নজরুল ইসলাম নেই।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

নজরুল ধাপের পর ধাপ পরিশ্রম করে সাহিত্যের যশো মন্দিরে এসে উপস্থিত হয়নি···যেদিন সে এলো, সে দিনই সে বিজয়ীর মতো এলো—কালবৈশাখীর অকস্মাৎ ঝড় যেমন আসে অরণ্য উতলা করে পথঘূর্ণি তুলে, পথিকদের সন্ত্রস্ত সচকিত ক'রে গৃহস্থের টিনের চাল উড়িয়ে দিয়ে, ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাজিয়ে।

প্রচণ্ড মহীরুহ ভেঙে দুমড়ে ফেলে আনন্দের অট্টহাস্যে ঘোষণা করে, আমি এসেছি—তুমি যাও বা না যাও তাতে আমার কিছু যায় আসে না—বাংলার

সমসাময়িক সাহিত্য ও সমাজে নজরুল ঠিক সেইভাবেই প্রবেশ করে, একদিন অকস্মাৎ ঝড়ের মতন, বিজয়ীর মতন। তাঁকে খুঁজে নিতে হয়নি তাঁর আসন, সে এসে মহা অভ্যাগতের মতন যেখানে বসেছে, সেখানেই তাঁর আসন রচিত হয়েছে। সাহিত্য জগতে তাঁর এই প্রবেশের সঙ্গে তাঁর সমগ্র সাহিত্যিক জীবনের বিবর্ত্তনেই এক সুর ও এক ছন্দে গাঁথা।

কালবৈশাখী যেমন কোথা থেকে এলো কি করে এলো, আসতে না আসতেই কোথা থেকে নিয়ে এলো। এই প্রচণ্ড কালো মেঘের প্রথম ছুটে চলা, তা যেমন কেউ জিজ্ঞাসা করবার সময় পায় না, কালবৈশাখী তাঁর অস্তিত্বের প্রচণ্ড উল্লাসে কাউকে তা জিজ্ঞাসা করলে না, কোথা থেকে এলে, কি করে এলে, কি কোথায় কখন সংগ্রহ করলে এই প্রচণ্ড গতির সংবেদন—নজরুলও কাউকে সে অবকাশ দিলো না।

শুধু এইটুকু জানা গেলো, সে হাবিলদার—যুদ্ধ ফেরত—নজরুল নিজে তাঁর নামের মাঝে হাবিলদার কথাটিকে সংযুক্ত রাখতে ভালবাসতো। প্রথমে বিশ্ব-যুদ্ধে যে সব বাঙালী তরুণ যোদ্ধা হিসাবে যোগদান করেছিলো, নজরুল তাদেরই একজন পল্টন ভেঙে দেওয়াতে তারা ফিরেএসেছে—পল্টন জীবনের স্মৃতি নজরুল তখন নিজের অঙ্গে বহন করে বেড়াতো। তাঁর বিচিত্র পোশাকের সঙ্গে থাকতো মিলিটারী বুট—সে এক অদ্ভুত পোশাক—গেরুয়া রঙের চাদর--হাতে একখানা হাতপাখা---একরাশ এলো চুল---কাঁধ পর্যন্ত ঝুলছে দুলছে।

আমাদের সঙ্গে যখন পরিচয় হলো তখন আমাদের কাছেও নজরুল তার পূর্ব্ব জীবনের কথা উল্লেখ করতো না--আমরাও শৈলজানন্দের কাছে যা শুনতাম, তাতে এইটুকু বুঝেছিলাম, নিদারুণ দুঃখের ভিতর দিয়ে তাঁকে এগিয়ে আসতে হয়েছে।

আমরা সবাই তখন জীবনের অজ্ঞাত মধ্যবিত্ত স্তর থেকে এসেছি তাই আমাদেরই সগোত্র একজন বলে ধরে নিয়েছিলাম পিছনের কথা জানবার কোনো প্রয়োজনই হতো না। কারণ সামনে যাকে পেয়েছি, তাঁর নতুনত্বের বৈচিত্র্যই মনকে আচ্ছন্ন করে রাখতো, নজরুল নিজেও নিজের সম্বন্ধে সেই কথাই বলতো, এই আমি। এর বেশী জেনে কি লাভ।

'শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

চওড়া বুকের ছাতি, বড়ো বড়ো চোখ, স্বাস্থ্যোজ্জল সুন্দর দেহ। মাথার চুলগুলো কিছুতেই বাগ মানছে না—এই নজরুল! আমার মাথার চুল খুব সুন্দর। কেমন ক'রে সুন্দর হলো বুঝতে পারি না। লোকে ভাবে, বুঝি মাথায় বড়ো বড়ো বাবরি চুল আমি সখ করে রেখেছি। কিন্তু তা হয়। চুল কাটবার পয়সা নেই, এমন কি আঃচড়াবার একটা চিরুনি পর্যন্ত নেই।

আমরা তখন পনেরো ষোল বছরের কিশোর বালক। রাণীগঞ্জে থাকি। দু'জন দুটো ইস্কুলে পড়ি, কিন্তু থাকি খুব কাছাকাছি। এক পুকুরে স্নান করি, সাঁতার কাটি, আম, জাম, কামরাঙা গাছ থেকে পেড়ে নুন দিয়ে খাই, একসঙ্গে বেড়াতে যাই, সুখ-দুঃখের গল্প করি। অন্য বন্ধু আছে অনেক। তাদের ভেতর একমাত্র ক্রিশ্চান বন্ধু শৈলেন ছাড়া আর কেউ বড়ো একটা আমাদের সঙ্গে মেশে না। আমাদের জগৎ যেন সম্পূর্ণ আলাদা।

নজরুল ছোটো ছোটো গল্প আমাকে শোনায়।

নজরুল ছোটো ছোটো গল্প লেখে। আমি কবিতা লিখি—নজরুলকে শোনাই আর কাউকে শোনাতে ইচ্ছে করে না! শোনালে বিশ্বাস করে না। বলে, ও আমাদের নিজের লেখা নয়। কোথাও থেকে চুরি করেছি।

একমাত্র শৈলেন শোনে মাঝে মাঝে। শোনে আর ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসে। বলে, 'ওগুলো ছিড়ে ফেলে দাও। কিছু হয়নি।'

আমাকে রাগায়। বলে, ওই জন্যই বুঝি চুল রেখেছো? চুল রাখলেই কবি হয় না!'

নজরুলকে বলে, 'তুমি গল্প লিখে কোনোদিন বঙ্কিমচন্দ্র হবে না, এই আমি ব'লে রাখছি।'

শৈলেনের কথায় আমরা রাগ করতাম না। শৈলেন ছিলো আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে আজ আর ইহজগতে নেই।

• কিন্তু যাবার আগে সে দেখে গেছে—আমরা আমাদের পেশা বদলে নিয়েছি। আমি লিখছি গল্প, নজরুল কবিতা।

মাঝখানে কিছুদিনের জন্য নজরুল ছিলো করাচিতে।

শৈলেন আর আমি সেই ক'াকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ক'রে কলকাতায় এসেছি।

নজরুল এলো করাচি থেকে। হলো সৈনিক-কবি।

তার কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। গান লিখছে, গান গাইছে, সভায় সমিতিতে, বাড়ীর আড্ডায়, ছেলেদের হোস্টেলে নজরুলকে নিয়ে টানাটানি চলছে। তার মুহূর্তের অবসর নেই।

আমাদের দেখে যেন হাঁফ ছেড়ে-বাঁচে। আড্ডা ছেড়ে পালিয়ে আসে।

সেখানে সদ্য-পরিচিত স্তাবক আর অনুরাগীর দল। মার্জিত রুচি শিক্ষিত মানুষের মজলিস। সংখ্যায় অগণ্য।

আর এখানে আমরা নগণ্য মাত্র তিনজন। নজরুল, আমি আর শৈলেন।

আবার যেন আমরা সেই পুরোনো দিনে ফিরে যাই। এখানে কবি ব'লে নজরুলের আলাদা কোন সম্মান নেই। সবাই এখানে অবারিত, অনর্গল এবং নিরাভরণ। শান্তিপুরী পোশাকী ভাষায় কথা বলা তখনও ভালো রপ্ত হয়নি। আমাদের জন্মভূমি সেই রাঢ় অঞ্চলের প্রচলিত মাতৃভাষায় প্রাণখুলে কথা ব'লে আর হো-হো করে হাসে।

এমন সব কথা, এমন সব গল্প, যা ওখানে বলা চলে না, নজরুল এখানে তাই বলে। যে গানটি তার সবচেয়ে প্রিয় সেই গানটি শোনায়। যে কবিতাটি সবে লিখেছে সেই আবৃত্তি করে।

শৈলেন বলে, 'যাক্ এতদিন, পরে আমার কথাটা আমি withdraw ক'রে নিলাম। তবে withdraw করার দরকার হতো না যদি না তোমাদের লেখা দুটো তোমরা পালটা-পালটি ক'রে নিতে। তুমি যদি গল্প লিখতে, আর শৈলজা যদি কবিতা লিখতো তাহলে তোমরা দুজনেই মরতে।'

আমি বললাম, 'নজরুল এখনই-বা বেঁচে আছে কোথায়? সবাই হৈ-চৈ করছে, টানাটানি করছে, বলছে, গান গাও, কবিতা শোনাও; বাহবা দিচ্ছে, প্রশংসা করছে।---কিন্তু কি খেয়ে কেমন করে ও বেঁচে আছে সেদিকটা কেউ দেখছে না। একটা পয়সা আসছে না কোথাও থেকে। কি কষ্টে যে ওর দিন চলছে তা আমি জানি। যে গল্পগুলো ও লিখেছিলো তার কপিরাইট বেচার জন্যে বসে আছে। তাও তো আফজল্ বলছে একশো টাকার বেশি দেবে না।

এই কথাগুলো কেউ শোনে, নজরুল তা পছন্দ করে না। হে-হে ক'রে হাসে সে অর্গানের সুর তুলে আমার কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করে।

আমি তিরস্কার করলাম নজরুলকে---হে-হে ক'রে হাসছে দেখো। যারা দু'পেয়ালা চা খাইয়ে সারাদিন তোমাকে গাধার মত খাটিয়ে নেয় তাদের বলতে পারো না?'

নজরুল বলে, 'তাদের কি বলবো? আচ্ছা বোকা তো।

'তাদের বলবে তুমি যাবে না, তোমাকে লিখতে হবে। টাকার দরকার। দুটো কবিতা লিখলে কুড়িটা টাকা তো পাবে?'

শৈলেন বললে, 'ও বলবে, তবেই হয়েছে। টাকার কথাও কখ্খনো বলতে পারবে না। মাথার চুলের দুঃখু ছিলো, ওর চিরকাল। এখন চুলগুলো বাগিয়েছে, কবি-কবি চেহারা হয়েছে, ব্যাস, ওতেই খুশি।'

নজরুল চুলের প্রশংসায় ভারি খুশি। বললে, 'শৈলজার মতো হয়েছে।'

আমি বললাম, 'আমি এবার চুলগুলো কেটে ফেলবো কিন্তু।'

নজরুলের খুব আপত্তি।—'না না কাটবে না।'

শৈলেন বলছিলো, 'তা না হয় কাটব না। কিন্তু তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। তোমার ওই চুলগুলোকে জটা ক'রে ফেলতে হবে। তারপর সারা গায়ে ছাই মেখে হিমালয়ে গিয়ে বসে থাকবে। ত্রিশূল একটা আমি তৈরি করিয়ে দেবো। সত্যি বলছি, দোহাই তোমার, মহাদেব হবার চেষ্টা করো না। সব ব্যাটা সমুদ্র মন্থন ক'রে অমৃতটুকু লুটে নিয়ে তোমার হাতে তুলে দেবে বিষ। সেই বিষ খেয়ে নীলকণ্ঠ হয়েবসে থেকো না। আমরা সহ্য করতে পারবো না।

নজরুলকে নিয়ে এমনি রসিকতা করতো শৈলেন।

নজরুল হো-হো ক'রে হাসতো আর বলতো, 'আমি হবো না, হবো না, হবো না তাপস, না পাই তপস্বিনী। মহাদেব হবো কেমন করে? পার্বতী কোথায় পাবো।

শৈলেন বলতো, 'বাবুদের অন্দরমহল থেকে যেরকম ঘনঘন ডাক আসছে তোমার—পার্বতী এটি জুটে যাবে ঠিক।'

আমি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারিনি।

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা!

সে যে চায় না কিছুই। যে চায় না সে পায় না।

নজরুল চেয়েছিলো শুধু আনন্দ। সে তার অন্তরের ভিতর থেকে স্বতঃ-উসারিত পরমানন্দ। টাকা নয়, পয়সা নয়, ক্ষুধায় অন্ন নয়, পার্থিব কোন সম্পদ নয়, সুরসুন্দরের কাছ থেকে সে আনন্দ তার আপনি আসে। সেই আনন্দে সে দিন-রাত মশগুল হয়ে থাকে।

'আপন গন্ধে ফিরি মাতোয়ারা কস্তুরীমৃগ সম।'

সেদিন তার খাবার সময় আমি তার আস্তানায় গিয়ে পড়েছিলাম।

বাইরে কয়েকজন ছোকরা দাঁড়িয়ে আছে ; তাকে কোথায় যেন নিয়ে যাবে। শেয়ালদা স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে।

খেতে বসবার আগে নজরুল আমাকে বললে, 'খাবে ?'

আমি বললাম, 'না।'

কাছে গিয়ে দেখলাম কাঁচের একটি ডিসের উপর কয়েক মুঠো ভাত, একটি প্লেটের উপর তিন টুকরো মাংস আর একটুখানি ঝোল।

যে দুটো ডেকচিতে রান্না হয়েছিলো সে দুটো খালি পড়ে রয়েছে। তাতে আর অবশিষ্ট কিছু নেই।

বিশ-পঁচিশ বছরের যে ছোকরাটি রান্না করে সে এক গ্লাস জল এনে নামিয়ে দিলে নজরুলের হাতের কাছে!

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি খাবে না ? নেই তো কিছু।'

লোকটি বললে, 'আমি হোটেলে খেয়ে নেবো।'

নজরুল বলে উঠলো, 'কেন, হোটেলে খাবে কেন ?'

লোকটি বললে, 'আপনি তখন আপনার বন্ধুকে খাইয়ে দিলেন যে!'

এতক্ষণে মনে পড়ল নজরুলের। বললে, ধেৎ, সে আমার বন্ধু কেন হবে ? সে এসেছিলো আমার কাছে টাকা ধার করতে।' আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললে, 'আমার নাম-টাম শুনে লোকটা ভেবেছে আমার মেলা টাকা।'

—'তাই বুঝি তাকে খাইয়ে বিদায় করলে ?'

নজরুল বললে, না, না, দেখলাম বেচারার মুখখানি শুকিয়ে গেছে। বললে, 'দু'দিন ভাত খাইনি।'

বললাম, তাকেই তো পয়সা দিয়ে হোটেলে পাঠাতে পারতে ?'

নজরুল বললে, 'দশ টাকার নোট একটি নোট ছাড়া আমার কাছে কিছু ছিল না যে ? টাকা পয়সাগুলো আমার কাছে আসতেও চায় না, থাকতেও চায় না। আমার সঙ্গে কী শত্রুতা যে আছে তাদের কে জানে।'

—'সেই দশ টাকার নোটটি তাকে দিলে বুঝি ?

নজরুল বললে 'হুঁ'। ভারি লজ্জা করছিলো। চেয়েছিলো একশো টাকা। দিলাম মাত্র দশটি টাকা।'

রাঁধুনি ছোকরাটি দাঁড়িয়েছিল একটু দূরে। তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বললাম, 'এখন ওকে কি খেতে দাও।'

নজরুল নিতান্ত অসহায়ের মতো তাকালো আমার দিকে।

একটি টাকা সেই ছোক্‌রাকে আমি দিতে গেলাম। সে নিলে না কিছুতেই। বললে, টাকা আছে আমার কাছে।

নজরুলের মুখে হাসি ফুটলো।—'এই দেখো, সবাইকার কাছে টাকা থাকে আমার কাছে থাকে না।

ছোক্‌রাটি বললে, হোটেলে আমাকে যেতে হত না, যা রান্না করেছিলাম ওতেই কুলিয়ে যেতো, কিন্তু তিনজনের খাবার লোকটা একাই খেয়ে ফেললে।'

নজরুল ধমক দিয়ে। 'ধেৎ, ওরকম করে বলতে নেই। আমি ওর মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম বেচারীর খুব খিদে পেয়েছিলো। খেয়েছে বেশ করেছে।'

খাওয়া শেষ করে হাত-কাটা ফতুয়ার উপর বাসন্তীর রঙের চাদরটি গায়ে দিয়ে চটি পরে পান চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে যাচ্ছিল নজরুল, আমাকে বললে, 'চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাই।

বললাম, 'খুব হয়েছে। তুমি যাবে পশ্চিমে, আমি যাবো পুবে।'

নজরুল বললে, 'গাড়ী এনেছো তো! মোটরকার?'

মোটরকার এলে আর রক্ষে নেই! যেখানে খুশি তাকেনিয়ে যেতে পারবো।

পাড়াগাঁয়ের ছেলে নজরুল—এই মোটরে চড়ার সখটা তার গেল না। কিছুতেই মোটরে চড়িয়ে কেউ যদি ওকে যাহান্নামে নিয়ে যায় তো তক্ষুনি যেতে রাজী হয়ে যাবে।

একদিন হয়েছে কি, বিকালে শৈলেনদের বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে বসে বসে গল্প করছি শৈলেনদের সঙ্গে,এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে নজরুল ঢুকলো আমাদের কাছে হাত পেতে বললে, 'চারটে টাকা দাও। বাইরে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।

রাস্তায় গিয়ে দেখলাম, ট্যাক্সির ভাড়া উঠেছে পাঁচ টাকা। নজরুলের পকেটে ছিলো মাত্র একটি টাকা। সেই টাকাটি ড্রাইভারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছে, 'টাকা আনছি, তুমি দাঁড়াও।

ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে শৈলেন বললে, 'এই টাকাটা তোমাকে আমি ধার দিলাম। ফিরিয়ে দিয়ে যেয়ো। যদি না দাও তো তোমার গলায় গামছা দিয়ে আদায় করবো।'

আর সেই প্রাণখোলা হাসি হাসতে হাসতে নজরুল এসে বসলো তার নিজের জায়গায়। মনে অর্গ্যানের সামনে। বললে, 'তুমি তো খৃষ্টান ছিলে, হিন্দু হলে কবে?

শৈলেন বললে, 'হয়েছি তোমার জন্যে।'

—'তা বেশ করেছো। সেই রাণীগঞ্জ থেকে ধরলে অনেক টাকা তুমি পাবে আমার কাছ থেকে। হিসেব করে রেখো। আপাততঃ দু'পেয়ালা চা দাও।'

শৈলেন জিজ্ঞেস করলে, 'দু'পেয়ালা কেন?

নজরুল বললে, লাখ পেয়ালা চা না খেলে চালাক হয় না। লাখ পেয়ালা হতে আমার এখনও দু'পেয়ালা বাকি আছে।

শৈলেন বলেছিলো, 'লাখ পেয়ালা চা খেয়ে চালাক তুমি হবে কিনা জানি না; কিন্তু মদ্যপান যদি করতে পারো তো নিঘ্‌ঘাৎ মাইকেল মধুসূদন হয়ে যাবে—সে কথা আমি হলপ করে বলতে পারি।

আমার দুর্ভাগ্য শৈলেন অনেকদিন হলো আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। নজরুল আজ সত্তর বছরের বৃদ্ধ। সারাজীবনে যে মদ্যপান দূরের কথা, ধূমপান পর্যন্ত করলে না। কাজেই সে মাইকেল হলো কিনা শৈলেন দেখে যেতে পারলে না।

কিন্তু যা সে হয়েছে তাই-বা ক'জন হতে পারে?

যা সে পেয়েছে তাই-বা কজন পায়?

কবি এবং গীতিকার নজরুল সর্বজন শ্রদ্ধেয়। তাই দেশবাসীর কাছ থেকে পেয়েছে সে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আর প্রণতি।

একদিন জীবন দেবতার কাছ থেকে পেয়েছে সে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ আর অপরিমান যন্ত্রণা।

কবি নজরুলের চেয়ে মানুষ নজরুল অনেক—অনেক বড়। শিশুর মতো সরল, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, নিরহঙ্কার, এমন অজাতশত্রু হৃদয়বান এবং আনন্দময় পুরুষ এ যুগে সচরাচর দেখা যায় না।

শৈলেন, একদিন হাসি-রহস্য করে বলেছিলো তুমি মহাদেব সেজে ছাই মেখে বোম্ বোম্ করে পথে পথে ঘুরে বেড়াও।'

আজ শৈলেনের সেই কথাটা মনে পড়ছে। বলছিলো, 'সমুদ্র মন্থনের অমৃত-টুকু নিজেরা নিয়ে বিষটুকু তুলে দেবে তোমার হাতে। সেই বিষ খেয়ে নীলকণ্ঠ হয়ে বসে থাকবে।

তাই হয়েচে। আজ শৈলেন নেই, কিন্তু তার কথাটা সত্য হয়ে গেছে। নজরুল নীলকণ্ঠ হয়ে ধ্যানমগ্ন তপস্বীর মতো চুপ করে বসে আছে।

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বাঙালী পল্টনের সৈনিক কবি নজরুল যুদ্ধ-অন্তে ফিরে এলেন গৃহে।

কতিপয় বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়ে ১৯২২ সালে প্রকাশ করলেন তিনি সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'। শৌর্যের বার্তাবহ সে কাজ তরুণচিত্তে অপূর্ব আত্মদানের আহ্বান নতুন ক'রে জাগাল। বাংলার বিপ্লবীমন বিস্ময়ে 'ধূমকেতুর' প্রতিটি অক্ষরে প্রাণের কথা পাঠ করে উৎসাহিত হল।

'ধূমকেতু' বেশিদিন চলল না। এ ধারার কাগজ চলতেও পারে না বেশিদিন। কারণ, শাসকের রুদ্রদৃষ্টি এদের বাড়তে দেয় না। নজরুলের তাতে ক্ষতি নেই আকাশের 'ধূমকেতুর' মতই বঙ্গগগনে তাঁর হঠাৎ প্রকাশ তীব্র দীপ্তি ছড়িয়ে অরুণ নয়নে চমক লাগিয়েছিল। বাংলার তরুণ তাঁর কণ্ঠের গান কেড়ে নিল। বাংলার তরুণ তাঁর দেওয়া 'মার্চিং সঙের' তালে তলে রুটমার্চ শুরু করে দিল। বাংলা ভাষায় সামরিক পদ্ধতিতে চলার সঙ্গীত : অভিযাত্রীর পদ্য ছন্দে :

> "চল্ চল্ চল্।
> ঊর্ধ্বে গগনে বাজে মাদল।
> নিম্নে উতলা ধরণী-তল
> অরুণ প্রাতের তরুণ দল—

বাংলার বিপ্লবীরা তাঁদের দুরন্ত আদর্শের উদ্গতি-রূপে তাঁকে একান্ত আপন ক'রে লাভ করতেন। নজরুলের যাত্রা শুরু হল বিপ্লব পন্থার পুরোভাগ, বিপ্লব-বাদের চারণ-কবির ভূমিকায়। কবির উপলব্ধির মূল তাঁরই অনুভূতির গভীরে। তিনি বলেছেন :

'বন্ধু গো আর বলিতে পারি না, বড় বিষজ্বালা এই বুকে—

আরও বলেছেন :

> 'রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা,
> তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা।'

তার পরে বলেছেন :

'প্রার্থনা করো—যারা কেড়ে যায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ।'

কত গভীর অনুভূতি, কত ব্যাপক ও নিবিড় বেদনা থেকে যে কবির অন্তরে বিপ্লব-সত্তার জন্ম, তার সন্ধান রয়েছে এসব উক্তির মধ্যে।

নজরুল মহাক্ষত্রিয়। নজরুল সত্যের একনিষ্ঠ পূজারী। অন্যায়ের শাসন-নাশনে তিনি পরমোৎসাহী। নজরুলের 'সত্য' মানবকে কেন্দ্র ক'রে। তাঁর কাছেও—

'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'

তাই তিনি বলেছেন:

'গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।'

নজরুল সত্যের খাঁটি উপাসক। তাই তিনি খাঁটি বাঙালী বা খাঁটি ভারতীয়। তিনি গোঁড়া মুসলমান না ব'লেই খাঁটি বিপ্লবধর্মী হতে পারলেন। তিনি মানুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ দেখলেন না। কারণ তাঁর কাছে:

'নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,
সব দেশে সব কালে ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।'

তাই কবি সাম্যের গান গাইতে পারলেন। ভগবান তাঁর কাছে মিথ্যা, যদি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভগবানকে খুঁজে বার না করা যায়। কাজেই হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব তাঁর কাছে কায়েমীস্বার্থের প্ররোচনায় বাঁচিয়ে রাখা এক ষড়যন্ত্র-প্রসূত গ্লানি। বিপ্লবীকবির কণ্ঠে তাই শুনি:

খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা?
সব দ্বার খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা:

বলেছেন কবি দুঃখে:

'মানুষের ঘৃণা করি
ও কারা কোরান, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি!'

নজরুলের ফাঁকি নেই, ফাঁকি নেই তাঁর চিন্তায় ও কর্মে!

মহাবিপ্লবের পুরোহিত নজরুল। বিপুল তাঁর হৃদয়ের পরিসরে বিশ্বের নির্য্যাতিতদের বেদনার ছায়া পড়েছে। তাই তিনি বিপ্লবীর কম্বুকণ্ঠে সাম্যের গান গাইলেন সবার তরে। ধরার সকল পাপীর উদ্দেশ্যে জানালেন:

'যত পাপীতাপী সব মোর বোন, সব মোরা ভাই।'

বিপ্লবী নজরুল বিশ্বমানবের প্রেমে অভিষিক্ত হৃদয়ে বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সমাজের ও রাষ্ট্রের নির্য্যাতিত নরনারীর বেদনায় গান আকুল কণ্ঠে গেয়ে গেছেন। বিদ্রোহী কবির উদ্বেল সঙ্গীতনির্ঝর সারা বঙ্গের বিপ্লবী হৃদয়েই

অটুট আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করেছিল। সেই আত্মবিশ্বাস থেকেই বিপ্লবীর রক্তে জাগে প্রত্যয়ালখা :

'আমরা সৃজিব নতুন জগৎ, আমরা গাহিব নতুন গান।'

১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত দেখি বিপ্লবী বাংলার তথা বিপ্লবী ভারতবর্ষের এক অত্যুগ্র গতি—যা ভয়ঙ্কর বা দুঃসাহসে সুন্দর।···চট্টগ্রামে রাইজিং রাইটার্স প্রাসাদে অলিন্দ যুদ্ধ, মেদিনীপুর, কুমিল্লা, ঢাকা, কলকাতা, দার্জিলিং তথা বাংলার দুর্জয়ীদের দুঃসহ অভিযান থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রচণ্ডবিপ্লব, বিয়াল্লিশের রক্তকরা আন্দোলন, ছেচল্লিশের রোমাঞ্চকর নৌবিদ্রোহ প্রভৃতি বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড বিপ্লবের কবি নজরুল ইসলামের স্বপ্নরূপায়ণ। কবি যাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন :

'আমি গাই তারই গান—
দৃপ্ত—দম্ভে যে যৌবন আজ ধরি' আসি খরসান'
হইল বাহির অসম্ভবের অভিমান দিকে নিকে,—
সেই বিপ্লবী তরুণদলেরই বিপুল এ কর্মপ্রবাহ।

নজরুল কবি ও দ্রষ্টা। কবির বাণী এবং দ্রষ্টার উক্তি সে-যুগে সফল হয়েছিল রুদ্রের সাধনায় সিদ্ধ শহীদকুল—সূর্য সেন, প্রীতিলতা, বিনয় বসু, প্রদ্যোৎ, ভগৎ সিং, আসফাকউল্লা, উধম সিং, যতীন দাস, মাতঙ্গিনী, কনকলতা এবং সর্বোপরি নেতাজী পরিচালিত আজাদ হিন্দ ফৌজের অগণিত মৃত্যুঞ্জয়ী বীর এবং 'কুইন ইণ্ডিয়ার সংগ্রামী দল এই চারণ-কবির ছন্দোবদ্ধ গানে এই ভারত-ভূমিতে এবং বহির্ভারতে মহাভাঙনের তাণ্ডব রচনা করতে পেরেছিলেন। যার আঘাতে প্রায় দুশো বছরের ইংরেজ শাসনের বুনিয়াদ টুকরো হয়ে গেল, ভারতরাষ্ট্রীয়-স্বাধীনতা লাভ করল!

সৈয়েদ মুজতবা আলী

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, শ্রীরামপুর, হুগলী এবং পরবর্তী যুগে কলকাতায় অনেকখানি আরবী-ফার্সীর চর্চা হয়েছিলো বটে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এ চর্চা খুব ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। তার প্রধান কারণ অতি সরল—ইসলাম পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে পূর্ব বাংলার মতো ছড়িয়ে পডতে পারেনি, কাজেই অতি সহজেই অনুমান করা হয়, চুরুলিয়া অঞ্চলে পীর দরবেশের কিঞ্চিৎ সমাগম হয়ে থাকলেও মৌলবী-মৌলানারা সেখানে আরবী-ফার্সীর বড়ো কেন্দ্র স্থাপন করতে পারেন।

তদুপরি নজরুল ইসলাম ইস্কুলে খুব বেশী আরবী-ফার্সী চর্চা করেছিলেন তা মনে হয় না। ইস্কুলে তিনি আদৌ ফার্সী (আরবীর সম্ভাবনা নগণ্য (অধ্যয়ন করেছিলেন কি-না, সে সম্বন্ধেও আমরা বিশেষ কিছু জানিনে)।

তার পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেওয়ার ফলে তিনি যে এ সব ভাষাও খুব বেশী এগিয়ে গিয়েছিলেন তাও তো মনে হয় না। তবু নজরুল ইসলাম মুসলিম ভদ্রঘরের সন্তান! ছেলেবেলায় নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ আলিফ, বে' তে করেছেন। দোয়া দরুদ (মন্ত্র-তন্ত্র) মুখস্থ করেছেন, কোরান পড়াটা রপ্ত করেছেন। পরবর্তী যুগে তিমি কোরানের শেষ অনুচ্ছেদ 'আমপারা' বাংলা ছন্দে অনুবাদ করেন—হালে সেটি প্রকাশিত হয়েছে। সে পুস্তিকাতে তাঁর গভীর আরবী জ্ঞান ধরা পড়ে না—ধরা পড়ে তাঁর কবিজনোচিত অন্তর্দৃষ্টি এবং 'আমপারা'র সঙ্গে তাঁর আবাল্য পরিচয়। বিশেষ করে ধরা পড়ে, দরদ দিয়ে সৃষ্টিকর্তার বাণী (আল্লার 'কালাম') হৃদয়ঙ্গম করার তীক্ষ্ণ এবং সূক্ষ্ম প্রচেষ্টা:

এরই উপর আমি বিশেষ করে জোর দিতে চাই। ফার্সী তিনি বহু মোল্লা মৌলবীর চেয়ে কম জানতেন, কিন্তু ফার্সি কাব্যের রসাস্বাদন তিনি করেছেন তাঁদের চেয়ে অনেক বেশী।

কাজী রোমান্টিক কবি। বাংলা দেশের জল-বাতাস, বাঁশ-ঘাস যে রকম তাঁকে বাস্তব থেকে কল্পলোকে নিয়ে যেতো, ঠিক তেমনি ইরান তুরানের স্বপ্নভূমিকে তিনি বাস্তবে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন বাংলা কাব্যে। ইরানে তিনি কখনো যাননি সুযোগ পেলেই যে যেতেন, সে-কথাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না, কিন্তু ইরানের গুল বুলবুল পিয়াজী-সাকী তাঁর চতুর্দিকে ক্রমশই এমন এক জানা অজানার ভুবন সৃষ্টি করে রেখেছিলো যে, গাইড-বুক টাইম-টেবিল ছাড়াও তিনি তার সবত্র অনায়াসে বিচরণ করতে পারতেন।

আরব ভূমির সঙ্গে কাজী সাহেবের যেটুকু পরিচয়, সেটুকু প্রধানতঃ ইরানের মারফতেই। কুরান শরীফের হারানো ইউসুফের যে করুণ কাহিনী বহু মুসলীম অমুসলীমের চোখের জল টেনে এনেছে তিনি কবিরূপে তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন ফার্সী কাব্যের মারফতে।

দুঃখ করো না, হারানো য়ুসুফ
কাননে আবার আসিব ফিরে।
দলিত শুষ্ক এ-মরু পুনঃ
হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে॥

ইউসুফে গুম্ গশ্তে বা'জ আয়দ বকিনান্
গম্ ম্ খুর!
কুলবয়ে ইহ্জান শওদ্ রুজি গুলিস্তান্
গম্ ম্ খুর॥

কাজী সাহেবের প্রথম যৌবনের রচনা এই ফার্সী কবিতাটির বাংলা অনুবাদ অনেকেরই মনে থাকতে পারে। 'মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড় এর অনুকরণে 'শাতিল আরব, শাতিল আরব ঐ যুগেরই অনুবাদ।

কোন কোন মুসলমান তখন মনে মনে উল্লাসিত হয়েছেন এই ভেবে যে, কাজী 'বিদ্রোহী লিখুন আর যাই করুন, ভিতরে ভিতরে তিনি খাঁটি মুসলমান। কোনো কোনো হিন্দুর মনেও ভয় হয়েছিল (যাঁরা তাকে অন্তরঙ্গভাবে চিনতেন তাদের কথা হচ্ছে না) যে কাজীর হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি বোধ হয় বাংলার জন্য নয়—তাঁর দরদ বুঝি ইরান তুরানের জন্য। পরবর্তী যুগে—পরবর্তী যুগে কেন ঐ সময়েই, কবিকে যাঁরা ভালো করে চিনতেন তারাই জানতেন ইরানী সাকীর গলায় কবি যে বার বার শিউলীর মালা পরিয়ে দিচ্ছেন তার কারণ যে সুন্দরী ইরানের বিদ্রোহী কবিদের মর্ম সহচরী ব'লে—ইরানের বিদ্রোহী আত্মা কাব্য-রূপে, মধুরূপে তার চরম প্রকাশ পেয়েছে সাকীর কল্পনায়।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

—ছোটবেলা থেকেই নজরুলের ঝোঁক ছিল গানের দিকে। শিয়ারসোলের স্কুলের শিক্ষক সতীশ কাঞ্জিলাল মশাই ছাত্রের এই দিকে প্রবণতা লক্ষ্য ক'রে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তালিমও দিতেন। কাঞ্জিলাল মশাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা করতেন! নজরুল যখন পল্টনে ছিলেন তখন পাশ্চাত্য সঙ্গীতের তালিম পেয়েছিলেন সহকর্মীদের কাছে। আর গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর থেকে ওস্তাদ জমীরুদ্দীন খাঁ সাহেবের কাছে নিয়মিত তালিম নিতে থাকেন। এক কথায় বলা যায় নজরুল সুরের সাগরে গা ভাসিয়ে দিলেন। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা তিন হাজারের চেয়ে কিছু বেশিই হবে। জমীরুদ্দীন খাঁ সাহেবের মৃত্যুর পর কবিকে তাঁর শূন্য আসনে গ্রামোফোন কোম্পানী সাদরে বসিয়েছিলেন—পদটি ছিল, ট্রেনার' ও হেড্ কম্পোজার'।

১৩৩০-এ নজরুল পুত্রশোক পেলেন, বৈশাখ মাসে তাঁর নয়নমণি বুলবুলের মৃত্যু হ'ল ওইটুকু বয়সেই সে জমরুদ্দীন খাঁ সাহেব এবং নজরুলের সঙ্গীত চর্চার মধ্যে থেকে নির্ভুল সুরে গান গাইতে শিখে ফেলেছিল। তার অকাল মৃত্যু পরিবারের উপর গভীর বিষাদের ছায়া ফেলল। নজরুলের আধ্যাত্মিক দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণই সম্ভবত: বুলবুলের মৃত্যু। এর আগে শোক থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য তিনি হাসির গান লিখতে গিয়ে একা একা কেঁদেছেন, এত তাঁর বন্ধুদের কেউ কেউ দেখছেন। আধ্যাত্মিক দিকে পা ফেলার কারণই ছিল, বুলবুলকে চোখের দেখা দেখতে। সেই আশায় তিনি লালগোলা স্কুলের হেড-মাষ্টার বরদাচরণ মজুমদারের কাছে যান নলিনীকান্ত সরকার মশাইকে সঙ্গে নিয়ে। সিদ্ধযোগী বলে মজুমদার মশাই-এর খ্যাতি ছিল—তবে তিনি সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন না, তিনি গৃহী যোগী। শোনা যায় যে বরদাচরণ নজরুলের এই কামনা চরিতার্থে করেছিলেন—নজরুলের চোখের সামনে বুলবুল এসে দাঁড়িয়েছিল। এর পর স্বভাবতই নজরুল মজুমদার মশাই-এর সঙ্গে হামেশা দেখা করতে লাগলেন। মজুমদার মশাই শ্মশানে গিয়ে কালী-সাধনা করতেন। তবে তিনি অনধিকারীকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। তাঁকে খুব কাছাকাছি দেখার

সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সম্পর্কে আমি তাঁর ভাগিনেয়। কবি আধ্যাত্ম-সাধনমার্গে কতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, তা বলার অধিকার আমার নেই, তবে এই পথে জোর করে পা দিতে গিয়ে বরদাচরণের মাসতুতো ভাই [নিবন্ধকারের আপন মামা] হরেন সান্যাল মশাই-এর সাময়িক মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছিল, এটা আমি ছেলেবেলায় দেখছি। হরেন মামা বরদাচরণের নিষেধ অগ্রাহ্য করে অমাবস্যার রাতের অন্ধকারে গোপনে দাদার পিছু পিছু শশান অবধি গিয়ে-ছিলেন—তারপর কী ঘটেছিল তা কেউ জানে না, তবে তিনি দু-হাত চোখের সামনে তুলে "রক্ত-রক্ত-রক্ত" আর্ত চিৎকারে সকলকে উচ্চকিত করে বাড়ি ফিরছিলেন সে যা-ই হোক, নজরুল যে আধ্যাশক্তি সম্বন্ধে কৌতুহলী হয়েছিলেন এবং এর প্রভাব তাঁর বাস্তব জীবনকে অনেকখানি আচ্ছন্ন করেছিল এটুকু নির্ণয় করা যাচ্ছে।

১৯৪২-এর জুলাই মাসে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর প্রোগ্রামে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে কবি টের পেলেন তাঁর জিহ্বা কাজ করছে না—কথা বলতে গিয়ে গলা আটকে আসছে। তার আগে থেকেই তিনি নিজের অসুস্থতা বুঝতে পেরে-ছিলেন, তবে তেমন গ্রাহ্য করেননি। রেডিওর প্রোগ্রাম করা সম্ভব হ'ল না। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন—কবি অসুস্থ। এর পর নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ট্যাক্সি ক'রে তাঁকে বাড়ি নিয়ে এলেন। এই সময়ে কবি দৈনিক নবযুগ-এর সম্পাদক ছিলেন। লুম্বিনী পার্কের হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসার পর মধুপুরে বায়ু পরিবর্তন এবং বিশ্রামের জন্য পাঠানো হ'ল।

অন্যের কাছে প্রকাশ পাওয়ার অনেক আগেই নজরুলের অসুখটা দেহে আত্মবিস্তার লাভ করেছিল। কাজেই যখন তাঁর চিকিৎসা শুরু হল তখন তা উপশমের বাইরে চলে গেছে। অন্যান্য দেশে কী হয় তা আমার জানা নেই, তবে আমাদের এদেশে শিল্পী, সাহিত্যিক শ্রেণীর মানুষদের ভাগ্যে যশ-খ্যাতি যতোই জুটুক, আর্থিক ক্ষেত্রে শতকরা নিরানব্বই এরও-বেশি জন তাঁরা উপেক্ষিত রয়ে যান—এটা অস্বীকার করা চলে না। নজরুলও তার ব্যতিক্রম নন! তাঁর প্রথম বই 'ব্যাথার দান' মাত্র দুশো (?) টাকার স্বত্ব বিক্রয় করতে হয়েছিল। হয়ত তখনকার দিনে দুশো অনেক টাকা। 'কপিরাইট' না বেঁচলে হয়ত তখন তাঁর অতি-বড় বন্ধুও গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য হাতে নিতেন না। তাঁর দ্বিতীয় কপিরাইট বিক্রেতা ঘটে ওই একই বছরে অর্থাৎ ১৯২১-এ এবার রিক্তের দান' এবং আরও দুটি বই মাত্র চার-শ টাকায় স্বত্ব বিক্রি করেন তিনি। 'অগ্নিবীনা' এবং 'যুগবাণী' প্রথম দিকে কপিরাইট বিক্রি করা হয় নি। যারা নজরুলের লেখার অনুরাগী

তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ গ্রন্থ প্রকাশের সমস্ত ব্যয় বহন করলেও, সরকারী ঝামেলার ভয়ে প্রকাশক হিসেবে নিজের নাম ছাপতে রাজী হননি—আর্যপাবলিশিং হাউস থেকে যুগবাণী এবং অগ্নিবীণা প্রকাশক হিসেবে নজরুলের নামাঙ্কিত হয়েই বেরিয়েছিল। পরবর্তী কালে অবশ্য 'অগ্নিবীণার' কপিরাইট কেনেন ডি, এম লাইব্রেরী। ডি-এম লাইব্রেরী নজরুলের অধিকাংশ বই-ই প্রকাশ করেছেন। গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তির আগে নজরুল-পরিবারের জীবনযাত্রা প্রধানতঃ তাঁর লেখার রয়্যালটির উপরেই নির্ভরশীল ছিল। তাঁর 'বিষের বাঁশী' এবং 'ভাঘার গান' সরকার থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এই বাজেয়াপ্ত বইগুলি অনেক গোপনে কিনতেন এবং বিক্রিয় টাকা নজরুল পরিবারের আর্থিক দুদিনে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছে। কেন না কোনো চাকুরিতেই তিনি স্থিরভাবে বেশীদিন টিক থাকতেন না।

অনেকের ধারণা নজরুলের আয় ছিল প্রচুর কিন্তু ব্যায়ে হাতখানা তাঁর অমন দরাজ যে, টাকা যেমন এসেছে তেমনি হাওয়ার আগে উড়ে গিয়েছে। এর খানিকটা অস্বীকার করা চলে না—বন্ধু বান্ধব খাইয়ে অথবা তাঁদের নিয়ে বেড়ানোর পিছনে তাঁও কম খরচ হয়নি। হিসেব করে চললে হয়ত স্ত্রী প্রমীলার অসুখের সময় এইচ-এম-ভি-র সমস্ত গানের রয়্যালটি বন্ধক রেখে তাঁকে চার হাজার টাকা ধারও করতে হত না। এমনি আরও অনেক অসুবিধের হাত থেকে নজরুল এবং তাঁর পরিবারে নিস্কৃতি পেলেন হয়ত—কিন্তু তাতে নজরুল হয়তো কবি নজরুল হতে পারতেন না, কাজেই রয়ে যেতেন হয়ত নজরুল—নজরুল।

বেগম সুফিয়া কামাল

আমার জীবনে 'অগ্নিবীণা'র বিদ্রোহী কবি নজরুল এসেছিলেন অনাবিল আনন্দ-আলোকের মতো, তাঁর মমতা-মধুর স্নেহোজ্জ্বল দৃষ্টি আমার দিকে পড়েছিলো বলে আমি আজ সকলের কাছে পরিচিতা হতে পেরেছি। নয়তো সেই পরদানশীর খান্দানী ঘরের অন্তরাল হতে বাইরে আসার পথ আমি বুঝি পেতাম না।

ঢাকা থেকে তখন 'অভিযান' নামে একটি পত্রিকা বের হতো। আমার ছোটমামা নওয়াবজাদা সৈয়দ ফজলে রব্বি সাহেব তখন ঢাকায় পড়তেন। তিনি জানতেন আমার বাল্যের লেখা-লেখা খেলার কথা। ছুটিতে বাড়ি গিয়ে আমার লেখা থেকে তিনি দু'তিনটি কবিতা নিয়ে আসেন। সে কবিতাগুলি 'অভিযানে' প্রকাশিত হয়। তখন নজরুল ঢাকায় মুকুটহীন সম্রাট ছাত্রমহলে তিনি প্রিয় হতে প্রিয়তম। আমার লেখা তাঁর চোখে পড়ে পড়ে। বরিশালে বসে আমি অচেনা হাতের লেখা একখানি চিঠি পাই। লেখকের নাম দেখে আমার তো চক্ষুস্থির। নজরুল ইসলাম। তারপর চিঠিতে আলাপ হয়ে গেলো। কবি হলেন আমার দাদু-ভাই। দাদুকে লিখে দিলাম কলকাতা যাচ্ছি। তিনি লিখলেন, এবারে নিশ্চয় দেখা হবে। হয়েও ছিলো। মাসিক পত্রিকায় তখন প্রথম প্রথম আমার লেখা বের হতে শুরু হয়েছে। দাদু এসেছেন এক পত্রিকা অফিসে, শুনে লোক পাঠালাম; আমার চিঠি পেয়েই তিনি চলে এলেন। আমরা কখন সারেং লেন-এ থাকি। তখনও পর্দার বাঁধন যায়নি, একটু শিথিল হয়েছে মাত্র। আমি গিয়ে তাঁর কদমবুসি করলাম। কী আনন্দে যে তিনি আমাকে দেখে চীৎকার করে উঠলেন; বললেন, 'তোমাকে আগে দেখিনি—তুমি একটুকু। তোমাকে আমি লুফব'। ঘরশুদ্ধ সবাই হেসে উঠলেন' দাদু অনর্গল আমাকে বলে চলেছেন, 'এতটুকু কেন, বেগম সাহেবা—আরে মিসেস-টিসেস ধরেছো, একটু ওজন তো ভারি হবে, আগে জানলে একটা দোলনা আনতাম। আমি প্রথম এই একেবারে বাইরের লোকের সামনে এসেছি যদিও, তবুও তাঁকে পর বলে মনে হলো না, কোন কুণ্ঠা বা লজ্জা বোধ করতে পারলাম না। তিনি কাছে বসিয়ে মাথায় হাত দিয়ে আদর ও দোয়া করলেন। আমি ধন্য হলাম।

এরপরে তিনি প্রায়ই আসতে লাগলেন। একদিন—তখন শীতের দিন, আমি ও আমার বড়ো ভাই সন্ধ্যার আগে বসে দাবা খেলছি। দড়াম করে দরজা খুলে একটা কম্বল গায়ে দাদু এসে পড়লেন, দেখলেন, আমরা উঠে দাঁড়িয়েছি। ভাইয়াকে বললেন, 'দাবা খেলছিলে দুখিয়ার সাথে?' ভাইয়া ও আমি বললুম, 'এই একটু একটু।' দাদু যেন একটু অবাক হয়ে বললেন, মেয়েরা দাবা খেলে! আমি তো দেখিনি। আমি খেলবো তোমার সাথে—নিয়ে এসো পান।' দাদু দাবা খেলবেন আমার সাথে—শুনেই তো আমার বুক শুকিয়ে গেছিলো—পান আনতে গিয়ে পালিয়ে বাঁচলাম! পান দিয়ে, চায়ের যোগাড় করে এসে দেখি, দাদু ও ভাইয়া দাবা পাতছেন। ভাইয়া খুব ভালো দাবা খেলতে পারেন। দাদু বললেন, 'তুমি ভাবছো তোমাকে ছেড়ে দেবো? এক বাজী খেলে নিই, ততক্ষণ তোমরা নামাজ সেরে এসো, খেলতে হবে।' কিন্তু মগরেব গেলো, এসে গেলো; পেয়ালার পর পেয়ালা চা, বাটার পর বাটা পান যুগিয়ে চললাম—বাজী আর শেষ হয় না।

রাত ১২টা বেজে গেলো; অতো রাত্রে কে আর ভাত খায়! রুটি গরম পরোটা তৈরী করে ভাইয়া ও দাদুকে মুখে তুলে খাইয়ে দিলাম; কিন্তু তাঁরা পরোটা-গোস্ত খেলেন, কি কাগজ খেলেন, বোঝা গেলো না। সারা রাত কেটে গেলো। পরদিন সকাল ৭টার সময় দেখি দাবার ছক উল্টে দিচ্ছেন আর হো-হো করে হেসে হেসে ভাইয়ার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে দাদু বললেন, 'নাঃ, খেলে সুখ পাওয়া গেলো, জিততেও পারলাম না, হারলামও না, ড্র হয়েগেলো—সত্যিই খেলতে জানো, আমাকে আর এতক্ষণ কেউ বসাতে পারেনি এক কাজী মোতাহার হোসেন ছাড়া।'—বলে আমার কৃশাঙ্গ ভাইয়ের হাতে যে ঝাঁকি দিলেন সেই আনন্দিত ঝাঁকুনির ব্যথা বেশ কয়েকদিন ছিলো।

দুপুর বেলায় খেতে খেতে দাদু বললেন, 'নুফু, তোমার রান্নার তারিফ করবো, না কবিতার তারিফ করবো?

না কবিতার তারিফ করবো?'

আমি বললাম, দুটোরই।'

দাদু বললেন, 'তা না করলে তো মিথ্যে বলে কাজীর বিচারের দুর্নাম হবে' —বলেই বললেন, 'রাত্রে তুমি আমাদের খাইয়ে দিয়েছিলে না?

আমি বললাম, 'তা কি তোমার মনে আছে?'

বললেন, 'মনে পড়েছে। তোমার মতো বোন যার নেই, সে সত্যিই দুর্ভাগা।'

আমাদের কাছে রোজ আসাটা পুলিশের চোখে পড়লো। তাঁরা দাদুর পিছু নিলেন। একদিন দাদু বসে আছেন—এক ভদ্রলোক এসে বসলেন। আমাদের কাছে আসেনি কবি, তাঁকে দেখতে পাড়ায় অনেক লোকই আসতো। দাদু তাঁকে দেখে বলে উঠলেন, 'তুমি টিকটিক, জানি ঠিকই'—আরো একটা লাইন কী বলেছিলেন আর আমার মনে নেই। লোকটি মুখ লাল করে উঠে চলে যেতেই আমি এসে বললাম, 'কী করে তুমি চিনলে দাদু?'

হেসে দাদু বললেন, 'গায়ের গন্ধে। বড়ো কুটুম্ব যে।' তাঁর এমনি হাজারো পরিহাসের খুঁটিনাটি আজও মনে পড়ে। হাসিতে খুশীতে আনন্দে উজ্জ্বল জীবন আজ কী হয়ে আছে, ভাবলে মনে ব্যথায় মনে ব্যথায় ভরে ওঠে।

মহম্মদ আবদুল হাই

বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলাম একটা ব্যতিক্রম। নেতিয়েপড়া সুরের দেশে কাব্যে এবং সঙ্গীতে তিনি প্রলয়নিনাদ তুলেছিলেন। অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিমাণের গদ্য রচনাতেও ব্যতিক্রমের সুর সুস্পষ্ট সাহিত্য সমালোচনার মানদণ্ডে উপন্যাসে দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে কাহিনী নির্মাণ, চরিত্র চিত্রণ, ঘটনা সংস্থান প্রভৃতি বিষয়ে যে ঐক্য ও বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, নজরুলের উপন্যাসত্রয়ীতে তা নেই।

সমালোচনার শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড হাতে নিয়ে ঔপন্যাসিক হিসাবে নজরুলকে বিচার করলে একদিকে যেমন তাঁর অনেক ত্রুটি পাওয়া যাবে, যেমনি এ ত্রুটিগুলোই যে তাঁর ব্যতিক্রম এবং বৈশিষ্ট্য-নির্দেশক হয়ে রয়েছে' সমালোচককে তাও স্বীকার করতে হবে।

একটা যুগের স্রষ্টা হিসাবেই নজরুল বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক ধারায় একটা ব্যতিক্রম হয়ে রয়েছে। নজরুল প্রতিভার ছোঁয়া সাহিত্যের যে ধারায় লেগেছে, তাতেই বৈচিত্র্যের সৃষ্টি কম হয়নি। উপন্যাস রচনাতেও তাই দেখা যায়, তিনি গতানুগতিকতা পথে পা বাড়াননি!

প্রথম যুদ্ধের পর থেকে বাংলার বিপ্লব বা সন্ত্রাসবাদের কাল পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৩০—৩২ সাল পর্যন্ত নজরুল,রবীন্দ্রনাথের যুগেই রবীন্দ্রনাথকেও অতিক্রম করে একটা স্বতন্ত্র যুগে সূচনাকরেছিলেন। এ-যুগ বাংলাদেশের তথা অবিভক্ত ভারতের মানস-চাঞ্চল্য ও অস্থিরতার যুগ। প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তি জয়ী হলেও ব্রিটিশ রাজশক্তির পতনোন্মুখ রূপ এ উপমহাদেশের অগণিত তরুণ মনে আশার সঞ্চার করে। এ দেশ স্বাধীন না হলে দেশের আত্মা জাগ্রত হবে না। বুভুক্ষু মানুষের ক্ষুধারও আবাস হবে না। তাদের এ বিশ্বাসকে আরও দৃঢ়ভূত করেছিলো এ কালের নতুন সমাজবাদ-ভিত্তিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা। গান্ধীজীর আন্দোলনের পথে এদেশবাসী আকৃষ্ট হলেও বাংলার তরুণদের প্রাণে তার আবেদন তেমন প্রবল হয়নি। বাংলার তরুণেরা অহিংস পথ অবলম্বন না করে দেশের মুক্তির জন্য বিপ্লব ও সন্ত্রাসের অহিংসা পথই বেছে নিয়েছিলো। এ যুগের মানস-চাঞ্চল্য, অস্থিরতা ও বেদনাকে যুগের চারণ-কবি হিসাবে নজরুল তাঁর কাব্যে ও গানে মুখরিত করে

তুলেছিলেন আর তাঁর উপন্যাসত্রয়ীতে এঁকেছিলেন এ যুগেরই জীবন প্রতিরূপ। বাংলার যে অক্ষম যৌবনের সে-সময় মুক্তিকামী ভারতবাসীর নেতৃত্ব করেছে, দেশের আজাদীকে ত্বরান্বিত করার জন্য যে তরুন-তরুণীরা ফাঁসীমঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেছে দেশ-প্রেমিক সেই সর্বহারার দলের জীবনলেখ্য রচনা করেছেন নজরুল তাঁর 'কুহেলিকা' এবং 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে! এদের পথ ছিলো দৃঢ়বাসনা, ছিলো অদম্য। দেশোদ্ধারই ছিলো তাদের মাত্র একটি 'প্লট'। ষড়যন্ত্র যতই করুক না কেন, তাতে কোনো জটিলতা ছিলো না। দিনের আলোর মতই তা ছিলো সুস্পষ্ট। 'কুহেলিকা' উপন্যাসের নায়ক জাহাঙ্গীর ওরফে বুলবুলন আর 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের নায়ক আনসারকে তাই জীবনের সকল দেনা-পাওনার বাঁধন দু'হাত দিয়ে ছাড়িয়ে এক প্রবল-নেশায় মেতে উঠতে দেখি। মায়ের স্নেহ, আত্মীয়ার আদর-যত্ন অবহেলা করে দেশের স্বাধীনতার দুরূহ ব্রতে জীবনকে বারংবার এরা বিপ্লব-বাহির করাল কবলে সমর্পণ করেছে, তবু পরাজয় স্বীকার করেননি।

'মৃত্যুক্ষুধা'ই নজরুলের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। পেটের ক্ষুধা মানুষকে তিলে তিলে কিভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলেদেয়, তার-ধর্ম-বিশ্বাস এবং জন্মার্জিত সংস্কার কিভাবে শিথিল হয়ে ওঠে, অত্যন্ত বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে নজরুল তার ছবি এঁকেছেন এ উপন্যাসে। কৃষ্ণনগরে চাঁদসড়কের একটি দরিদ্র মুসলমান পরিবার ক্ষুধার তাড়নায় কিভাবে খুঁকে মরছে তার নিখুঁত এবং জলন্ত বর্ণনা দিয়েছেন নজরুল। এ কাহিনীর সঙ্গে সুগ্রথিত হয়েছে বিপ্লবী আনসরের দেশসেবা, কারাবরণ ও আত্মত্যাগের করুণ ইতিহাস।

'কুহেলিকা' এবং 'মৃত্যুক্ষুধা'য় নজরুলের জীবন-দর্শন রূপায়িত হয়েছে বিভিন্ন চরিত্রে এবং তাদের দেশমাতৃকার মুক্তিপণের জন্য জীবন বলিদানে। কিন্তু নজরুলের সমগ্র ব্যক্তিত্বে পরিচয় বোধ হয় আমরা পাই তাঁর 'বাঁধনহারা' পত্রোপন্যাসে। 'বাঁধনহারা' নামটি এ উপন্যাসের প্রকৃতি এবং গ্রন্থকারের মানসের পরিচয় বহন করছে।

উল্কা এবং ঝঞ্ঝার বেগে নজরুল বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেছিলেন পূর্ণিমার চাঁদের মতো ধীরে ধীরে ষোলকলায় তিনি বর্ধিত ও বিকশিত হন নি। যুদ্ধক্ষেত্রে গোলা-গুলি তলোয়ার সঞ্চালয় করতে গিয়ে মসীযুদ্ধেও তিনি হাত পাকিয়াছে।

নজরুলের উপন্যাসত্রয়ীতে কাহিনীর গাঢ় বিন্যাস এবং উজ্জ্বল চরিত্র চিত্রণ আমরা পাইনে সত্য, কিন্তু তাঁর কবি-জীবনের স্বপ্নও সাধ, কবিতা ও সঙ্গীত

যেমন, এগুলোতেও তেমনি বিধৃত হয়েছে। ভাষার উপরে নজরুলের যে কতো বড দখল ছিলো তাও জানা যায় তাঁর ও উপন্যাসগুলিতে।

তাঁর উপন্যাসে আমরা নজরুলের পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে প্রস্ফুটিত দেখতে পাই।

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

নজরুলের আসল পরিচয় আমাদের অগোচরেই রয়ে গিয়েছে, তাঁর ব্যক্তি-সত্তার মর্ম-কেন্দ্রটি আমাদের কাছে আজও উদঘাটিত হয়নি। যিনি আজ স্তব্ধ মূলক হয়ে আমাদের মধ্যে বছরের পর বছর কাটাচ্ছেন তাঁর মহামৌনের অতলে ডুব দিলে শুনতে পাওয়া যাবে শুধু মাতৃনামের ঝঙ্কার। কাজী নজরুল ইসলাম স্বভাবে ও স্বরূপে মাতৃসাধক বা পরম শক্তি। প্রথম জীবনে দেশমাতৃকারূপে এই জননীই তাঁর ধ্যান আরাধনার বিষয় ছিলেন এবং শেষের দিকে বিশ্বমাতৃকা বা জগজ্জননীরূপে তিনিই তাঁর আরাধ্য হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর অন্তর্জীবনের এ পরিণতির খবর হয়তো অনেকে রাখেন না, গীতি সুরকার বা কবি গায়ক নজরুলের অন্তরালে সাধক নজরুলের অস্তিত্বের কথা অনেকেই জানেন না।

তিনি শক্তিতত্ত্ব বা মাতৃস্বরূপের নব ভাষ্যকার। চমকে যেতে হয় তাঁর হিন্দুশাস্ত্রে গভীর অনুপ্রবেশ দেখে।

এই নিখিলের অবাধ্য মহাশক্তিকে তাঁর নানা বিভাগ বন্দনা করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'দেবীস্তুতিতে'। মূলে তিনি আদ্যাশক্তি পরমা কুমারী তাঁর মুখ্য তিনটি বিভূতি বা বিভাবঃ মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী। মহাকালীরূপে তাঁর প্রথম আবির্ভাব মধুকৈটভনাশের জন্য বিষ্ণুকে উদ্বোধিত করতে। কাজী নজরুল মধু ও কৈটভকে চিনেছেন অধৈর্য ও অবিশ্বাস রূপে। তাঁর এ ব্যাখ্যা যেমন অভিনব তেমনি আকর্ষণীয়। তেমনি মহিষাসুরকে তিনি দেখেছেন ক্রোধের প্রতীকরূপে, যার বিনাশ সাধন করেন মহালক্ষ্মী এবং জগতে এনে দেন শান্তিসুষমা, সুখসমৃদ্ধি। আর শেষ কাম ও লোভরূপী শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করেন সরস্বতী তাঁর জ্ঞানের প্রোজ্জ্বল খড়্গ দিয়ে। তখন—

'মা যে আমার কেবল জ্যোতি'

এবং

সেই পরম শুভ্র জ্যোতির্ধারায়
নিখিল বিশ্ব ডুবে যায়।'

এই পরম অনুভবে কবি আত্মহারা। আমাদের শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মায়ের এই তিন মূল বিভাগের পরিচয় দেওয়া হয়েছে, মধুকৈটভাদি দৈত্য বা অসুরের নানা অধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিলো এবং আধুনিক যুগেও 'সাধনা সমর' প্রভৃতি গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়।

বাংলা দেশের এই মহা দুর্দিনে কবির এই অভিনব শাক্তপদাবলী এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে এনেছে।

মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ বাহার

…কাজী সাহেব চট্টোগ্রামে আমাদের বাড়ী গিয়েছে কয়েকবার। যে ক'দিন তিনি ছিলেন চট্টোগ্রামে, আমাদের বাড়ীখানি যেন ভেঙে পড়বে। রাত্রি দশটায় থারমোফ্লাস্কে ভরে চা, বাটা ভরা পান কালিভরা ফাউণ্টেন পেন আর মোটা মোটা খাতা দিয়ে তাঁর শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতাম।

সকালে উঠে দেখতাম, খাতা ভর্তি কবিতা। এক এক করে 'সিন্ধু' গোপন প্রিয়া, 'অনামিকা,' 'কর্ণফুলি', মিলন মোহনায়,' 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি,' 'নবীনচন্দ্র,' 'বাংলার আজিজ,' 'শিশু যাদুকর,' 'সাত-ভাই চম্পা—আরো কতো কবিতা লিখেছেন আমাদের বাড়ীতে বসে। চট্টগ্রামের নদী সমুদ্র পাহাড় আমাদের বাড়ীর সুপারী গাছগুলো আজ অমর হয়ে আছে তাঁর সাহিত্য।

সারারাত কবি চা আর পান খেতেন—আর খাতা ভর্তি করতেন কবিতা দিয়ে। দুপুরে কখনো কিছু পড়তেন, কখনো করতেন পামিষ্ট্রীর চর্চা, কখনো বা মশগুল হতেন দাবা খেলায়। বিকেলে দল বেঁধে যেতাম নদীতে সমুদ্রে সাম্পানওয়ালা এসে জুটতো, সুর করে চলতো সাম্পানের গান। সবাই মিলে গান ধরতাম আমার সাম্পান যাত্রী না হয়, ভাংগা আমার তীর,…ওগো, গহীন জলের নদী,…এক এক সময় চট্টোগ্রামী সাম্পানওয়ালারা গাইতো—বঁধুর আমার চাটিগাঁ বাড়ি—বঁধুর আমার নদীর কুলে ঘর।'

এক-একবার বেড়াতে যেতাম ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ে। কখনো পরতেন তিনি আরবী পোশাক কখনো বা ব্রিচেস। কাজী সাহেবকে নিয়ে চট্টোগ্রামের সীতাকুণ্ডের পাহাড় জঙ্গল, হ্রদ, জলপ্রপাত খালবিল, নদী-চরে বেড়িয়েছি সঙ্গে ছেলের দল। এতবড়ো বিদ্রোহী বীর, কিন্তু জোঁককে তিনি ভয় করতেন। একবার সীতাকুণ্ডের পাহাড়ে উঠে জোকের ভয়ে আর তিনি নামাতে চান না। কয়েকজন মিলে কাঁধে করে নামাতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

আমার জীবনের মজার ঘটনা কাজী সাহেবকে নিয়ে। আমার আত্মীয়েরা সকলেই প্রায় সরকারী চাকুরে। সবাই ধরে বসলেন—আমাকে আই, সি, এস

পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষায় পাশ হলাম, ডাক্তারী পরীক্ষা হয়ে গেলো। শুধু Secretary of State-এর মঞ্জুরী বাকী। কাজী সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করা হলো, নিযুক্ত-পত্র এলে কলকাতা কংগ্রেসের সময় মঞ্চের উপর উঠে পদত্যাগের কথা ঘোষণা হবে। কাজীদার ভক্ত-শিষ্য পুলিশের চাকরি করবে তিনি সইতে পারতেন না। পদত্যাগ আমাকে আর করতে হয়নি কথাটি আগেই বেরিয়ে পড়েছিলো। টেগার্ট সাহেবের দৌলতে ইংরেজের চাকরির খাতা থেকে আমার নাম কেটে যায় চিরদিনের জন্য। আমি তখন কাজী সাহেবকে নিয়ে সভা করে বেড়াচ্ছি কাজী সাহেব বক্তৃতা করেছেন, গান্ধীজীর দল কাটছে চরকা —আমরা কাটাবো মাথা!' কাজী সাহেবের মরে কারুর প্রতি চরকা—আমরা কাটবো মাথা।, কাজী সাহেবের মনে কারুর প্রতি বিদ্বেষ দেখিনি কোনদিন। তিনি ছিলেন সকল ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে। মাঝে মাঝে তিনি বলতেন :

দে গরুর গা ধুইয়ে।'

গরুর গায়ে পানি ঢেলে দিলে সে যেমন করে আনন্দে লাফাতে থাকে, তার মধ্য তখন থাকে না বিদ্বেষ-বিষ, সে-রকম অনাবিল আনন্দের ধ্বনি এই :

দে গরুর গা ধুইয়ে।'

নজরুলকে 'জাতীয় কবি' বললেই সবটুকু বলা হলো না। আমাদের জীবনে নজরুল ইসলাম কতখানি জায়গা জুড়ে আছেন, পরিমাপ করা সহজ নয়। এক কথায় বলতে গেলে কাজীদাকে বাদ দিয়ে আমরা নিজের কথা ভাবতেই পারিনে। আমাদের রাজনীতি আমাদের সাহিত্য, আমাদের মানস ও মনন —এক কথায় আমাদের জীবনের অনেকখানি তো তাঁরই হাতে গড়া।

প্রমথনাথ বিশী

কাজী নজরুল ইসলামের কপালে ছাপ পড়ে গিয়েছে বিদ্রোহী কবি বলে। প্রেম ও ভক্তির কবিতা ও গানগুলি যে তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ সম্পদ তা একরকম চাপা পড়ে গেল। যৌবনের ও রাজনীতির উন্মাদনায় যে-সব কবিতার সৃষ্টি হয়েছিল সাময়িক প্রয়োজন মিটিয়ে দিয়েও তাদের মধ্যে অংশুই কিছু, কিন্তু এখন আর সেই ছাপ দিয়ে কবিকে চিহ্নিত করবার চেষ্টা শুধু নিরর্থক নয়, কবির খ্যাতির পক্ষে ক্ষতিকর।

এমন যে হয়ে থাকে তার কারণ অধিকাংশ মানুষ জহুরি নয়; সোনার মূল্য বুঝবার ক্ষমতা তাদের নেই, সোনার উপরে রাজার মুখের ছাপ দেখতে পেলে তারা নিশ্চিন্ত হয়। সোনার ক্ষেত্রেও যা সত্যাপম কাব্যের ক্ষেত্রে তা সত্য। প্রকৃত জন কাব্যাঙ্ক, নিজেদের বিচার করবার শক্তি না থাকায় ফরমূলার সন্ধানে থাকে। সাহিত্য ক্ষেত্রে সেইজন্য ফরমূলার বড় আদর। রবীন্দ্রনাথ মিসটিক (কাব্যে মিস্‌টিজম্ সোনার পাথরবাটি) সত্যেন্দ্র দত্ত ছান্দসিক, নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী।

নজরুলের বিদ্রোহাত্মক কবিতাগুলির মূল্য অস্বীকার না ক'রেও বলা চলে সে মূল্য দিয়ে তার চূড়ান্ত বিচার হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত বাঙালী রচিত সবচেয়ে সুপরিচিত গান। কিন্তু গানটিকে কি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য মূল্য বিচারের কষ্টিপাথর রূপে ব্যবহার করা উচিত? বিদ্রোহাত্মক কবিতাগুলি নজরুলের সাহিত্যমূল্য বিচারের কষ্টিপাথর নয়। তবে কিনা সাহিত্যের বাজারে সকলে তো মূল্যবিচারের উদ্দেশ্য যায় না; নানা কারণে যায় —যার সঙ্গে সাহিত্যের যোগ অত্যন্ত পরোক্ষ।

নজরুলের যে সব গুণগ্রাহী ও অনুরাগী এখনো বিদ্রোহাত্মক কবিতাগুলিকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে ঘোষণা করেন, রাজনৈতিক স্বার্থসাধনের আশায় অন্য কবিতাগুলিকে আড়ালে ফেলে রাখেন তাঁরা আর যাই হোক, কবির যথার্থ বন্ধু নন। রাজনৈতিক উন্মাদনার দিনে যে-সব কবিতা লিখিত হয়েছিল তার প্রাপ্য সম্মান ও খ্যাতি কবি লাভ করেছেন। তবে তা লাভ করেছেন একটা বিশেষ

কালের হাত থেকে। তারপরে অর্ধ শতাব্দী প্রায় গত হয়েছে এখন দেখা উচিত কবি যাতে পরবর্তীকালের যা নাকি চিরকালের অগ্রযুত, হাত থেকে স্থায়ী সম্মান লাভ করতে পারেন। কবি এখন জীবন্মৃত। আমাদের মধ্যে বাস করেও যেন নেই। তিনি সক্রিয় এ সতেজ থাকলে কি বলতেন জানি না, কিন্তু বিশ্বাস করতে ভালো লাগে যে রূঢ় দেশাত্মবোধক উন্মাদনার উর্ধ্বে উন্নীত হতেন। সমকালের সাধনাকে চিরকালের অভিমুখে প্রেরিত করতেন। এই বিশ্বাসের সমর্থনের হেতু তাঁর পরবর্তী রচনাসমূহের মধ্যে আছে। নজরুলের শ্রেষ্ঠ কাব্য-সম্পদ তাঁর বিদ্রোহাত্মক কবিতা নয়—ভক্তি ও প্রেমের কবিরা ও গান, যার অনেকগুলিই বাংলা ভাষায় অমূল্য সম্পদ। তবে যে আমরা এখনো উন্মাদনার কবিতাগুলি নিয়ে মাতামাতি করছি তাঁর কারণ অদ্যাবধি আমরে পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে আছে কবি এগিয়ে গিয়েছেন। তাঁর ও আমাদের মধ্যে কম ক'রে পঞ্চাশ বছরের ব্যবধান।

রবীন্দ্রনাথ, দিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত প্রভৃতি বহু কবি সাময়িক প্রয়োজনে স্বদেশী গান রচনা করেছেন; সাময়িক প্রয়োজন মিটে গেলেও যদি তাদের মূল্য থাকে তবে তা সাহিত্যমূল্য। সেই ক্ষয়িত সাহিত্যমূল্য দিয়েই কি তাদের বিচার করতে হবে? নজরুলের অনেক স্বদেশী গান ও কবিতার কিছু সাহিত্যমূল্য অবশিষ্ট আছে। সেই ক্ষয়বিশিষ্ট্য মূল্য দিয়েই কি আমরা কবির প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে তাঁর প্রতি দায়িত্ব শোধ করতে চাই। আশঙ্কা হচ্ছে সাহিত্য বিচারের মধ্যে দায়িত্ব শোধ করতে চাই? আশঙ্কা হচ্ছে সাহিত্য বিচারের মধ্যে রাজনীতির স্থূল হস্ত প্রবিষ্ঠ হওয়াতেই এমন বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। যাঁরা এই কাজটিতে নেমেছেন, জানেন যে কবির বাধ্যতামূলক নীরবতা। কাজেই তাঁরা নিজেরাই উত্তর চাপানোর ভার নিয়েছেন। কবির পক্ষে অবস্থাগতিকে 'অন্য সবাই কইবে কথা তুমি রইবে নিরুত্তর'। অসহায় কবিকে নিয়ে সাহিত্য বিচারের নামে যারা সঙ্কীর্ণ রাজনীতির খেলায় মেতেছেন তাঁরা না কবির অনুরাগী না সাহিত্যের।

সমাপ্ত

এই প্রসঙ্গে

বাংলা সাহিত্যের বাংলা দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সাহিত্য, তাঁর কথা আজ কারো অজানা নয়। বাংলার চিরন্তন প্রকৃতির অপরূপ লীলায় তিনি আমাদের কাছে জাগ্রত হয়ে আছেন তাঁর অমর লেখনির মাধ্যমে। তাই আজ আমরা শরৎ-সাহিত্যকে একান্ত নিজের করে নিতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করি যতদিন বাংলা থাকবে, যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে শরৎচন্দ্র তাঁর আপন মহিমায় সগৌরবে প্রতিষ্ঠার পথে আরও অগ্রসর হবেন।

আজ এই স্মৃতিমাল্য সংকলন গ্রন্থখানি প্রকাশের পূর্ব মুহূর্তে এই কথাই মুক্তকণ্ঠে বলব, ইতিপূবে তাঁকে কেন্দ্র করে অগণিত সংকলন গ্রন্থ ও সমালোচনা গ্রন্থ বের হয়েছে। তারই মিছিলে নিবেদিত এই গ্রন্থখানি হয়তো। বেমানান হবে না।

এই জাতীয় সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করতে গিয়ে আমাদের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও শরৎ-সম্পর্কিত গ্রন্থ সমূহের সাহায্য নিতে হয়েছে। যে সব লেখকদের লেখা এতে সংকলিত করা হয়েছে, তাঁদের পরিচয় আজকের দিনে আর অপেক্ষা রাখে না। তাঁরা অনেকেই শরৎচন্দ্রকে চিনবার ও তাঁর সঙ্গে মিশবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। সেই দিক থেকে এই সংকলনের প্রকাশের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রেই তা অনুভব করতে পারবেন।

সবার শেষে পাঠকদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন, এই সংকলনে হয়তো অনেক অসম্পূর্ণতা এবং ত্রুটি রয়ে গেছে তার জন্য আমরা মুক্ত কণ্ঠে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

—সুজিত কুমার নাগ

কলিকাতা

অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৬৯

প্রকাশকের নিবেদন

বাংলা সাহিত্যে সুজিৎকুমার নাগ ইতিপূর্বে অগণিত সংকলন গ্রন্থ সম্পাদিত করে করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। আশা করি বরণীয় মহান শরৎচন্দ্রের স্মৃতি সংকলন গ্রন্থখানি প্রতি ঘরে ঘরে সমাদৃত হবে। এই সংকলনের প্রতিটি লেখা সংগ্রহ ও নির্বাচন করেছেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক সুজিতকুমার নাগ। এর জন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

—প্রকাশক

শরৎচন্দ্র

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

...আমার আয়ুকালের মধ্যে বাংলাসাহিত্যে পর পর তিনটে পর্ব দেখা দিয়েছে। আমি যখন আসরের জাজিমটার একধারে জায়গা ক'রে নিয়েছিলুম তখন কবির উচ্চ আসনে ছিলেন হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সিংহাসনে, মধুসূদন বিদায় নিয়ে গেছেন। এঁরা চলে যাবার কিছু থেকে দ্বিতীয় পর্বের শুরু হয়েছিল। প্রথম পর্বে আমি ছিলুম সকলের চেয়ে বয়সে ছোটো, দ্বিতীয় পর্বে সকলের চেয়ে বয়সে বড়ো। তার ফলে হয়েছিল সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমার বয়স্যতার সম্বন্ধ ঘটতে পারেনি। একলা পড়ে গিয়েছিলুম। সৌভাগ্য-ক্রমে অকৃত্রিম শ্রদ্ধার গুণে বয়সের বাধা পেরিয়ে সত্যেন্দ্র আমার কাছে আসতে পেরেছিলেন। তাই কাব্যের সঙ্গে মানুষের পরিচয় মিলতে পেরেছিল। এই দুয়ের মিলনে আমি যে রস পেয়েছিলাম সেটাকে আমি মস্ত লাভ ব'লে মনে করি আমার বিশ্বাস মানুষরূপে তিনি আমার কাছে আসাতে কবিরূপে তিনিও আমাকে বেশি সত্য করে পেয়েছিলেন।

তৃতীয় পর্ব আরম্ভ হয়েছে শরৎকে নিয়ে আধুনিকের সঙ্গে তাঁর যেমন নৈকট্য ঘটেছে তাঁর পূর্ববর্তীদের আর কারো তেমন ঘটেনি। তিনি সম্পূর্ণভাবেই নিজের দেশের এবং কালের। এটা সহজ কথা নয়। এটা শুনতে মতোবিরোধী, কিন্তু দেখা যায়, কৃত্রিমতা সহজ, স্বাভাবিক হওয়াই সহজ নয়। তেমনি নিজের দেশকালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলে যাওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না। সকলেই যে নিজের দেশে কালে জন্মগ্রহণ করে তা নয়। জন্মবিধাতা জাতককে স্থান নির্ণয় করে দেবার উপলক্ষে সব সময়ে বর্তমানের সময়ে বর্তমানের সময় নির্ণয় করে চলেন না, সাহিত্যে তার ফলাফল হয় বিচিত্র।

যথোচিত দেশকাল থেকে চিরনির্বাসনে যারা জন্মেছে এমন লোকের অভাব নেই। সৃষ্টিবৈচিত্র্যের জন্যে আরও প্রয়োজন আছে।

বলা কওয়া নেই, শরৎ হঠাৎ এসে পৌঁছলেন বাংলা সাহিত্য-মণ্ডলীতে. অপরিচয় থেকে পরিচয়ে উত্তীর্ণ হোতে দেরী হোল না। চেনাশোনা হবার পূর্ব থেকেই তিনি চেনা মানুষ হয়ে এসেছেন। দ্বারী তাকে আটক করেনি। সাহিত্যে যেখানে পাঠকদের চিত্ত-পরিচয় এবং লেখকের আত্ম-পরিচয় অব্যবধানে এক সঙ্গে ঘটে, সেখানে এই রকমই হয়— পূর্বরাগ আর অনুরাগের মাঝখানে সময় নষ্ট হয় না।

সেই সময়টাতে কর্মের টানে এবং বয়সের ভেদে আমি দূরে পড়ে গেছি। ছেড়েই দিয়েছি কলকাতায় বাস। আমার সম্বন্ধে দেশে নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা চলছিল, অধিকাংশ সময়ে তা সত্যও নয়, প্রিয়ও নয়। আমার মন তাই দূরে চলে এসেছিল। এই সময়েই শরতের অভ্যুদয়। শান্তির জন্য যে নিভৃত কোণ আশ্রয় ক'রে আপন কর্মের বেষ্টনে গা-ঢাকা দিয়েছিলুম, সেখান থেকে শরতের সঙ্গে কাছাকাছি মেলবার কোন সুযোগ হোলো না।

কোনো কোনো মানুষ আছে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের চেয়ে পরোক্ষ পরিচয়েই যারা বেশি সুগম। শুনেছি শরৎ সে জাতের লোক ছিলেন না, তাঁরে কাছে গেলে তাঁকে কাছেই পাওয়া যেত। তাই আমার ক্ষতি রয়ে গেল। তবু তাঁর সঙ্গে আমার দেখাশোনা কথাবার্তা হয়নি যে তা নয়, কিন্তু পরিচয় ঘটতে পারল না। শুধু দেখাশোনা নয় যদি চেনাশোনা হোত তবে ভালো হতো। সমসাময়িকতার সুযোগটা সার্থক হোত তবে ভালো হতো। হয়নি, কিন্তু সেই সময়টাতেই বিস্মৃত আনন্দে দূরের থেকে আমি পড়ে নিয়েছি তাঁর বিন্দুর ছেলে, বিরাজ বৌ, রামের সুমতি, বড়দিদি। মনে হয়েছে কাছের মানুষ পাওয়া গেল। মানুষকে ভালবাসার পক্ষে এই যথেষ্ট।

স্বদেশ প্রেম

—সুভাষচন্দ্র বসু

শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের যে আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, দীর্ঘকাল তাহা শূন্য থাকিবে। বাঙ্গলায় এমন কোন পরিবার নাই যেখানকার আবালবৃদ্ধ নরনারীর নিকট তিনি পরিচিত ও সমাদৃত নহেন।

তাঁহার সহিত আমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। আমার বেদনা আজ অতি গভীর।···

শরৎচন্দ্র শুধু সাহিত্যিকই ছিলেন না, রাজনীতি ক্ষেত্রেও তাঁহার দান ছিল এবং সেই সুবাদেই ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্রের সহিত আমার প্রথম পরিচয় ঘটিয়াছিল।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তিত হইলে শরৎচন্দ্র এই আন্দোলনে যোগদান করেন। কলিকাতায় এই সময়ে যে জাতীয় বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয় শরৎচন্দ্র তাহার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। এই সময়ের একদিনের কথা আমার মনে আছে; একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে বলিলেন—"কলম ছাড়িয়া রাজনীতিকের দলে ভিড়িয়া পড়া সাহিত্যিকের কর্তব্য নহে।"

শরৎচন্দ্র তাহাতে হাসিয়া বলেন—"আমি কিন্তু কিছুদিনের জন্য কলম ছাড়িয়া চরকাই ধরিয়াছি।"

শরৎচন্দ্রের এই উক্তির অর্থ ছিল এই যে, দেশমাতা যখন বিপন্না তখন ব্যক্তিগত সমুদয় চিন্তা ও অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার রক্ষায় অবতীর্ণ হওয়াই সন্তানের কর্তব্য। দেশমাতৃকার প্রতি আন্তরিক প্রীতি তাঁহার আমরণ বিদ্যমান ছিল। বহু বৎসর যাবৎ তিনি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য এবং হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। লাজুক ছিলেন বলিয়া তিনি সভা-সমিতিতে বড় একটা যোগ দেন নাই বটে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট যুবকেরা তাঁহার নিকট হইতে অনেক প্রেরণা লাভ করিয়াছে। স্বদেশপ্রেমিক শরৎচন্দ্রের এই দিকটার পরিচয় আজকাল তরুণেরা তেমন জানে না। তাঁহার মন ছিল চির-সবুজ —তরুণ বাংলার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, সরকার ও পুলিশ তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিত।

আমাদের দেশে—বিশেষভাবে বাঙ্গলায় হাস্যরসের বড় অভাব। শরৎ-সাহিত্যে এই হাস্যরসের প্রাধান্য দেখা যায়। দুঃখ-দৈন্য তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না বলিয়াই ঘোরতর দুর্দশা বর্ণনা-কালেও তিনি হাস্যরসের নির্ঝর বহাইয়াছিলেন। এতগুলি গুণ একজন মানুষের সচরাচর সম্ভব হয় না—একাধারে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ লেখক, আদর্শ দেশপ্রেমিক ও সর্বোপরি আদর্শ মানব।

শরৎ প্রসঙ্গে

— প্রমথ চৌধুরী

আমি বহুকাল পূর্বে "কুন্তলীন পুরস্কারে" একটি ছোট গল্প পড়ে বিস্মিত হয়েছিলুম। সে গল্পটির নাম বোধ হয় "মন্দির"। গল্পের নীচে লেখকের নাম ছিল না। পরে খোঁজ করে জানতে পারলুম যে এই নূতন লেখকের নাম 'শরৎচন্দ্র'—যে শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্যে আমরা সকলেই শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করতে প্রস্তুত। পরিচিত লেখকের নাম দেখে তাঁর লেখার প্রতি আমাদের মন অনুকূল হয় এবং খ্যাতির প্রভাব আমাদের মতামতের রূপ দেয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কোনও সম্পূর্ণ অপরিচিত, এমন কি নামহীন লেখকের রচনা আমাদের নয়ন মন

আকৃষ্ট করে সেখানে আমরা একটি যথার্থ নতুন লেখককে আবিষ্কার করি। "মন্দির" গল্পটির কথা বস্তুতঃ সম্পূর্ণ নতুন, তার উপর সেটি ছিল সুগঠিত। সাহিত্য-সমাজে আমি একজন Critic ব'লে সুপরিচিত, যদিও পুস্তক সমালোচনা আমার ব্যবসা নয়। যে যাই হোক, সমালোচকের আর যে গুণই থাক্ না কেন তিনি Perception-য়ে বঞ্চিত নন্। কোনও বই পড়ে তাঁর মনে একটি অভূতপূর্ব impression হলে—তারপর Critic বাগবিস্তার করতে পারেন। যে কথায় কোনও impression করে না, তার বিষয়ে কিছু বক্তব্য থাকে না।

শরৎ কথা

—নরেন্দ্র দেব

শরৎচন্দ্র যখন বর্মা ছেড়ে বাংলা দেশে ফিরে এসে হাওড়ায় বাজে শিবপুরে বাড়ী ভাড়া করে থাকতে হাওড়া জেলার পানিত্রাস অঞ্চলে সামতাবেড় গ্রামে রূপনারায়ণ নদীর ধারে বাড়ী তৈরি করে চলে গেলেন, তখনকার একটা গল্প বলি। সামতাবেড় দরিদ্র গ্রাম। একটা ডাক্তার পাওয়া যায় না সহজে। শরৎচন্দ্র হোমিওপ্যাথি ও বায়োকেমিক চিকিৎসা যত্ন করে শিখেছিলেন দরিদ্রের সেবা করবার জন্য। গ্রামের যত চাষাভূষো দীন-দরিদ্র কুলি-মজুর সবার সঙ্গে তিনি ডেকে আলাপ করতেন। তাদের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করতেন। ছেলে-মেয়ের অসুখ করেছে শুনলে চিকিৎসা করতেন। বিনামূল্যে ওষুধ দিয়ে তাদের ভাল করে তুলতেন। কিন্তু রোগীর পথ্য দরিদ্র গ্রামবাসীরা দিতে পারতো না শরৎচন্দ্র নিজ ব্যয়ে তাদের পথ্যেরও ব্যবস্থা করতেন। এমনি করে তিনি সারা গ্রামের 'দাদাঠাকুর' হয়ে উঠেছিলেন। শরৎচন্দ্রের 'ভেলী' ছিল রাস্তার একটা নেড়ী কুত্তার বাচ্চা। একদিন কি জানি কী মনে করে এই নেড়ী কুত্তার বাচ্চাটা শরৎচন্দ্রের পিছু পিছু তাঁকে অনুসরণ করে

অনেকদূর পর্যন্ত যায়। শরৎচন্দ্র তার জন্য অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়লেন। বেপাড়ার কুকুরগুলো পাছে তেড়ে এসে বাচ্চাটাকে মেরে ফেলে, তাই কুকুরছানাটাকে কোলে তুলে নিয়ে তিনি চলতে থাকেন। বাচ্চাটা এমন করুণভাবে পুট পুট করে তার মুখের দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি মেলে চায় যে শরৎচন্দ্রের তার উপর একটা মায়া পড়ে। তিনি বাচ্চাটাকে শিবপুরের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে খুব যত্ন করে পোষাণ। নাম রাখেন 'ভেলী'। শরৎচন্দ্রের সন্তানতুল্য স্নেহ পেয়েছিল। কারণ শরৎচন্দ্রের ছেলে মেয়ে ছিল না। আদর যত্নে প্রতিপালিত 'ভেলা' একটা কেঁদো বাঘের মতো প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছিল। তার প্রতাপে শরৎচন্দ্রের ঘরে কোনও অপরিচিত লোকের ঢোকার উপায় ছিল না। শরৎচন্দ্রের হুকুম পেলে তবে অচেনা লোককে ঘরে ঢুকে বসতে দিত। একবার কোন একটি কর্মচারী ট্যাক্স আদায় করতে এসে ভেলীর কাছে খুব জব্দ হয়েছিলেন।

টাক্স নিতে কর্মচারীটি যখন আসেন শরৎচন্দ্রের হুকুমে ভেলী কিছু বলেনি তাঁকে। শরৎচন্দ্র তাঁর হাতে প্রাপ্য টাকাটা দিয়ে বাড়ীর ভিতর চলে যান স্নানাহার সারতে।

তারপর অনেক বেলায় তাঁর বৈঠকখানা ঘরে ফিরে এসে দেখেন কর্পোরেশনের কর্মচারীটি তখনও হাতে টাকাটি নিয়ে কাতর মুখে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে কাঁপছেন, আর ভেলী তাঁকে আগলে 'গরার' শব্দ করতে করতে পাহারা দিচ্ছে। মনিবের হুকুম না পেলে তাঁকে টাকা নিয়ে ঘর থেকে এক পাও যেতে দেবে না।

শরৎচন্দ্র তাঁর সেই শোচনীয় অবস্থা দেখে অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হয়ে পড়েন। অন্য কেউ হলে হয়ত হেসে উঠতেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র ভেলীকে সামলে রেখে ভদ্রলোককে যেতে দিলেন। সে ভদ্রলোক হাঁফ ছেড়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুট! ছুট! বলতে গেলেন 'বাপ'! আর এ বাড়ীতে ঢুকছিনি, প্রাণটা গেছলো আর একটু হলেই!'

এই ভেলীর অসুখে শরৎচন্দ্র আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে তিনি

দিনতিন রাত্রি বেলগাছিয়ার ভেটানরী হাসপাতাল ভেলীর সেবা করে-ছিলেন। কিন্তু ভেলী বাঁচলো না। শরৎচন্দ্র বালকের মতো কেঁদে ফেললেন। ভেলীর মৃতদেহ সযত্নে হাসপাতাল থেকে বহন করে এনে তাঁর গৃহে সংলগ্ন অঙ্গনে অশ্রুসজল নেত্রে সমাধিস্থ করলেন। সমাধির উপর একটি স্তম্ভও নির্মাণ করে দিলেন। এ হেন কুকুর প্রিয় শরৎ-চন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ীর বাগানের এক গাছতলায় বেপরোয়া'রশ একটা কুকুরের তিনটি বাচ্চা হয়েছিল। শরৎচন্দ্র সেটা লক্ষ্য করে-ছিলেন। কুকুরটা সারাটা গাঁ ঘুরে বেড়ালেও ঠিক সময়ে এসে দু' তিনবার বাচ্চাদের স্তন্যপান করিয়ে যেতো। কিন্তু একদিন সে আর আসে না। বাচ্চাগুলো ক্ষিদের জ্বালায় পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে। শরৎ-চন্দ্র বিষন্ন হয়ে পড়লেন। লোকজন ডেকে হুকুম দিলেন খুঁজে বের করতে ওদের মাকে। যে বার করতে পারবে দশ টাকা পুরস্কার। দশ টাকা পাবে শুনে ছুটলো চারিদিকে লোক। শরৎচন্দ্র দুধের বাটি আর তুলোর শলতে নিয়ে গাছতলায় এসে বসলেন এবং স্বয়ং মায়ের মতই বাচ্চাগুলির মুখে দুধ দিতে লাগলেন। তারা চক্ চক্ করে খেতে শুরু করলে শরৎচন্দ্র আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন দু'দিন ধরে খোঁজাখুঁজির পর বাচ্চাগুলোর মাকে পাওয়া গেল। একটা জলশূন্য কুয়োর মধ্যে, কেমন করে পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারেনি। শরৎচন্দ্রের লোকেরা কুয়োর মধ্যে নেমে তাকে উদ্ধার করে যখন এনে দিলে শরৎচন্দ্র খুশী হয়ে তাদের পনের টাকা বখশিস দিলেন। মা-হারা বাচ্চাগুলো মা ফিরে পেতে শরৎচন্দ্রের মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো।

শরৎচন্দ্র একদিন সকালে উঠে পথে বেরিয়ে দেখেন কসাইরা দু'টি ছাগলছানা নিয়ে চলেছে। বাজারে তাদের মাংসের দোকান আছে। বাচ্চা দুটোকে কেটে তারা বিক্রি করবে। সেটি দু'টি অবোধ ছাগ শিশুকে অকাল মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচাবার জন্য শরৎচন্দ্রের কোমল প্রাণ কাতর হয়ে উঠল। তিনি কসাইদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন

কত টাকা দিয়ে কিনেছো এবং এদের কেটে মাংস বেঁচে তোমা-দের কত টাকা লাভ হবে? কসাইরা সে কথা জানাতে শরৎ-চন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাদের সে টাকা দিয়ে বাচ্চাত্নটিকে কিনে বুকে করে সযত্নে বাড়ী নিয়ে এলেন। তারা শরৎচন্দ্রের গৃহে অপত্য স্নেহে পালিত হতে লাগলো। একদিন সামতাবেড়ে গিয়ে দেখি তারা আর বাচ্চা নেই। প্রকাণ্ড বড় হয়ে উঠে আশ্রম মৃগের মতো শরৎচন্দ্রের উদ্যান প্রাঙ্গনে যথেচ্ছ বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। শরৎচন্দ্র তাদের নাম ধরে ডাকতেই তারা এক দৌড়ে তাঁর কাছে এসে হাজির তিনি ওদের নিজের হাতে আম খাওয়াতে খাওয়াতে বললেন, 'তোমরা বলো এদের বোকা পাঁঠা, কিন্তু এদের মতো চালাক পশু আমি খুবই কম দেখেছি।' বুঝলাম এই ছোট জীবের প্রতি তাঁর কী অসীম স্নেহ।

একদিন রাত্রি ১২টা নাগাদ একটি রোমাঞ্চকর মর্মস্পর্শী গল্প শেষ তিনি উঠলেন যাবার জন্য। আমরা, অর্থাৎ আমি ও আমার স্ত্রী তাঁকে নিতাই পণ্ডিতিয়ার মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে চলে আসতুম। সেদিন রাত্রে পণ্ডিতিয়ার মোড় বরাবর পৌঁছাতেই একটি কচি শিশুর করুণ ক্রন্দন আমাদের কানে এল। পথের পাশেই কোথাও থেকে সেই কান্নার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। কৌতূহলী হয়ে সে শব্দ অনুসরণে একটু অগ্রসর হয়েই দেখা গেল মহানির্বাণ মাঠের ধারে অন্ধকার গাছতলায় একটি কাপড়ের পুলিন্দা পড়ে রয়েছে এবং তারই ভিতর থেকে কচি শিশুর ক্রন্দনরোলে নিশীথ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। শরৎচন্দ্র তাড়াতাড়ি সেই ন্যাকড়ার পুঁটুলি খুলে দেখেন তার মধ্যে সদ্যজাত শিশুকে কারা পথে ফেলে দিয়ে গেছে। ক্ষুদে ক্ষুদে লাল পিঁপড়ে থিকথিক করে ছেঁকে ধরেছে বাচ্চাটাকে। শরৎচন্দ্র বসে পড়লেন সেই পথের উপর ছেলেটির পরিচর্যা করতে। আমার স্ত্রী বললেন, তোমার ঘরে গরম দুধ বা মধু আর একটু তুলো যদি থাকে চট করে নিয়ে এসো। নরেন, তুমি যাও ওর সঙ্গে। আমি ততক্ষণ ছেলেটাকে পিঁপড়ের কামড় থেকে মুক্ত করে একটু পরিচ্ছন্ন কর তুমি।

আমি বললুম, দাদা বিপজ্জনক কাজে হাত দিচ্ছেন। কারা এই হতভাগ্য শিশুকে পথের ধারে ফেলে দিয়ে গেছে। পুলিশ দেখতে পেলে এখনি আপনাকেই আসামী বলে ধরে নিয়ে যাবে।

শরৎচন্দ্র বললেন, পুলিশ না এলে আমিই তাদের খবর দেবো। সেজন্য ভেবো না। যাও, যা বললুম করো। আর দেরী কোরো না।

আমরা তাড়াতাড়ি বাড়ী এসে দুধ, মধু আর তুলো সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়ে দেখি সদ্যজাত শিশুর সমস্ত মালিন্য মুছে দিয়ে তাকে পিপীলিকার আক্রমণ থেকে স্নেহময়ী জননীর মতো কোলে নিয়ে পথের ধুলির উপর বসে আছেন শরৎচন্দ্র। আমরা যেতেই তিনি বাচ্চার মুখে মধু দিয়ে দুধের পলতের ব্যবস্থা করতে করতে আমায় বললেন, তুমি যাও এখনি কোন কাছাকাছি বাড়ী থেকে বালিগঞ্জের থানায় ফোন করে বলো তারা এসে যেন ছেলেটির চার্জ নেয়।

সবিনয়ে বললুম এত রাতে কোনও বাড়ীর দরজা খোলা পাবো না। ফোন করবে কোথা থেকে?

শরৎচন্দ্র একটু ভেবে বললেন, যাও একটু আগে 'জলযোগ' বলে একটা খাবারের দোকান আছে। তারা অনেক রাত্রি পর্যন্ত খুলে রেখে সন্দেশ তৈরী করে। তাদের দোকান থেকে দু' আস্তা পয়সা দিয়ে ফোন করে এস।

তাঁর উপদেশ মতো বালিগঞ্জ থানায় ফোন করে ফিরে এলুম, তখন রাত্রি একটা বেজে গেছে। দেখলুম শরৎচন্দ্র আমার পত্নীর সাহায্যে অতি নিপুণ ধাত্রীর মতো শিশুটিকে পলতে দিয়ে বিন্দু বিন্দু দুধ খাওয়াচ্ছেন। আমাকে দেখে বললেন, ছেলের রূপ দেখ! অভিজাত ঘরের বলে সন্দেহ হচ্ছে। পুঁটুলি বাঁধা কাপড়খানা বেশ দামী শাড়ী!—আমার স্ত্রীকে বললেন, রাধা, তুমি এই খোকাটাকে নিয়ে গিয়ে মানুষ করো না?

আমার স্ত্রী বললেন, বড়দা! (শরৎচন্দ্রকে উনি 'বড়দা' বলতেন)। বৌদির কোলও তো শূন্য, আপনি যখন একে পথ থেকে কুড়িয়ে নিলে-

ছেন তখন আপনার দাবীই অগ্রগণ্য। আমার কোলে তো একটি ছেলে এসেছিল। রইলো না বেঁচে তো কি করবো।

পুলিশের ভ্যান এসে পড়লো। সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রিপোর্ট আমাদের স্বাক্ষর নিয়ে শিশুটিকে তুলে নিয়ে চলে গেল।

শরৎদা দেখি চোখ মুছছেন। বললুম, কি হল দাদা, চোখে কিছু পড়লো নাকি? শরৎদা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, শিশুগুলো যাদু জানে। একদণ্ডে মায়ায় জড়িয়ে ফেলেছিল।

শরৎচন্দ্র ও ভারতী

—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

১৩১৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ভারতীর সম্পাদিকা সরলা দেবী লাহোর থেকে কলকাতায় আসেন। সে বছরের ভারতী তখনও ছেপে বেরোয়নি—তিনি এসেছিলেন ভারতী প্রকাশের সুব্যবস্থা করতে এবং সেই সঙ্গে তাঁর শিশুপুত্র দীপকের অন্নপ্রাশন দেবেন বলে। আমি তখন বি. এ. পাশ করে এটর্নীর আর্টিকেলে আছি এবং ল' পড়ছি।

একদিন দীনেশচন্দ্র সেন এসে আমায় পাকড়াও করে সরলা দেবীর কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁকে বললেন—এর হাতে ভারতীর ভার দিয়ে আপনি লাহোর যেতে পারেন।

সরলা দেবী আমার হাতে ভারতীর পরিচালনার ভার দিচ্ছেন। এবং তখন বৈশাখ মাসের কপি তৈরির জন্য আমাকে বললেন—একটি মাঙ্গলিক কবিতা এবং একটি ছোট গল্প দাও।

তাঁর হাতে দু'চারটি রচনা ছিল—ইংরাজী ভাষায় লেখা। সে-গুলির তর্জমার ব্যবস্থা হল। কিন্তু উপন্যাস চাই।

সরলা দেবী বললেন—ভারতী রেগুলার না হওয়া পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ কেউ ভারতীর জন্য লেখা দেবেন

না। আমাকে বললেন, উপন্যাস সংগ্রহ করতে।

আমার মনে পড়লো শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি'র কথা। আমি বললাম উপন্যাস নেই, তবে আমার এক বন্ধুর লেখা বড় গল্প আছে। সে গল্পটি দু'তিন মাস চলতে পারে। অপূর্ব লেখা!

সরলা দেবী পড়তে চাইলেন। দিলুম তাঁকে পড়তে। পড়ে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন—চমৎকার! এক কাজ কর, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়—তিনমাসে ছাপাও। বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় লেখকের নাম দিও না। সকলে মনে করবে রবীন্দ্রনাথের লেখা। আমাদেরও দেরীর ত্রুটি ঘুচবে এবং গ্রাহক-গ্রাহিকা বাড়বে। আষাঢ় সংখ্যায় 'বড়দিদি' শেষ, আর সেই সংখ্যায় 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' লেখকের নাম ছাপবে।

তাই হল। বৈশাখ সংখ্যায় 'বড়দিদি' ছাপা হওয়া মাত্র বঙ্গদর্শনের সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার (রবীন্দ্রনাথ নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার ভার নেন) রবীন্দ্রনাথের কাছে যান। গিয়ে অনুযোগ করে বলেন—আপনি আর উপন্যাস লিখবেন না বলেছেন, অথচ এই তো ভারতীর জন্য উপন্যাস লিখেছেন।

কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ অবাক। তিনি বৈশাখের ভারতীতে 'বড়দিদির যতটুকু ছাপা হয়েছিল পড়লেন। পরে তিনি বলেছিলেন —আমার লেখা নয়, তবে খুব শক্তিশালী কোন লেখকের লেখা। তারপর শৈলেশচন্দ্র আমাকে বার বার জিজ্ঞাসা করেন, কার লেখা। বললুম—ধৈর্য্য ধরুন, লেখকের নাম ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

সে বছর আষাঢ় মাসের ভারতী বেরিয়েছিল পূজোর পর এবং সে সংখ্যায় 'বড়দিদি' উপন্যাসের শেষে লেখকের নাম 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' বেশ বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছিল। ছাপা হবার পর রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথ আমাকে বার বার বলেছিলেন। 'বড়দিদি'র লেখক অসাধারণ শক্তিশালী, অজ্ঞাতবাস ঘুচিয়ে এঁকে তোমরা সাহিত্যের আসরে টেনে আনতে পারবে না?

শরৎচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষ

—শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের গৌরবময় ইতিহাস আমাদের জাতির গৌরব।

এ প্রসঙ্গে কথাশিল্পী অমর কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের পথের দাবীর নায়ক 'সব্যসাচী'র কথা আমার মনে পড়ে।

অপরাজেয় কথা সাহিত্যিক 'পথের দাবী' গ্রন্থে সব্যসাচীর বিপ্লবী চরিত্র যেন আমরা দেখতে পাই নেতাজীর সেই বীরত্ব-পূর্ণ অসীম ত্যাগ আর সাধনা ··

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'তে নায়ককে বলেন: তুমি তো আমাদের মত সোজা মানুষ নও। কোন দুর্গম, কোন ঝড় ঝনঝা প্রলয় তোমাকে রোধ করতে পারে না! তুমি নব অগ্রনায়ক। পরাধীন ভারতে হে মুক্তিদাতা। তোমাকে শত কোটি প্রণাম।

একদা রবীন্দ্রনাথ দেশনায়ক বলে সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দিত করেছিলেন। কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের ছিল অন্তরের যোগাযোগ।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে, রাজনৈতিক মতামত নিয়ে সুভাষচন্দ্র স্বদেশ প্রেমিক শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বলেন:—

"শরৎচন্দ্র ছিলেন কংগ্রেসের একটি শক্তি-মন্ত্র। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম হইতেই তিনি বাংলার কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান তিনি হাওড়া জেলায় বিতরণ করিয়াছেন।"

"শরৎচন্দ্র শুধু সাহিত্যিক ছিলেন না, রাজনীতি ক্ষেত্রেও তাঁর দান ছিল সেই সুযোগেই ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্রের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল।"

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতবাসী অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তিত হইলে শরৎচন্দ্র সেই আন্দোলনে যোগদান কারন।

কলিকাতায় এই সময় যে জাতীয় বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয় শরৎচন্দ্র তাহার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন।"

...এই সময়ে একদিনের কথা আমার মনে আছে একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে বলিলেন—কলম ছাড়িয়া রাজনীতিতে ভিড়িয়া পড়ার সাহিত্যিকের কর্তব্য নহে। শরৎচন্দ্র তাহাতে হাসিয়া বলেন —আমি কিছুদিনের জন্য কলম ছাড়িয়া চরকাই ধরিয়াছি।"

শরৎচন্দ্রের এই উক্তির অর্থ ছিল এই যে, দেশমাতা যখন বিপন্না তখন ব্যক্তিগত সমুদয় চিন্তা ও অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কর্মে অবতীর্ণ হওয়াই সন্তানের কর্তব্য।

"দেশমাতৃকার প্রতি আন্তরিক প্রীতি তাঁহার আমরণ বিদ্যমান ছিল। বহু বৎসর পরও তিনি নিখিল বঙ্গ রাষ্ট্রীয় সমিতি ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রিয় সমিতি এবং হাওড়া জেলার কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন।"

"ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। লাজুক ছিলেন বলিয়া তিনি সভাসমিতিতে বড় একটা যোগদান করেন নাই বটে কিন্তু সংশ্লিষ্ট যুবকেরা তাঁহার নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছে। স্বদেশ প্রেমিক শরৎচন্দ্রের এই দিকটার পরিচয় আজকের তরুণেরা তেমন জানে না।

তাঁহার মন ছিল চির সবুজ। তরুণ বাংলার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি ছিল।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য—সাহিত্য ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের দান বিরাট হলেও দেশ সেবার কাজে, রাজনীতি ক্ষেত্রে ও সাহিত্যে তার তুলনা হয় না।

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' প্রকাশের পর সুভাষচন্দ্র নিজেও এই

বইটি পাঠ করে বললেন, "পরাধীন ভারতের মর্মবেদনায় বিপ্লবের আর বিদ্রোহের যে সংঘাত, তা আপনার লেখায় ধরা পড়েছে। পরাধীন ভারতের সব্যসাচী আজকের এই সমস্যা কণ্টকিত ভারতের বেদনার তীব্র আলোকে মহীয়ান হয়ে উঠেছে।

স্মরণ করি সাহিত্য জগতের অমর কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাংলাদেশে যারা দেশবন্ধুর সহকর্মী ছিলেন তাঁদের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেই ছিল শরৎচন্দ্রের বেশী ঘনিষ্ঠতা।

সুভাষচন্দ্র ছিলেন তাঁর অত্যন্ত স্নেহভাজন বন্ধু। সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁর স্নেহ বন্ধুত্ব তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল।

অন্যদিকেও সুভাষচন্দ্র শরৎচন্দ্রকে একজন খাঁটি বাঙ্গালী ও বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ কথা সাহিত্যিক হিসাবেও শ্রদ্ধা করতেন।

সুভাষচন্দ্র দেশের কাজের জন্য অনেক সময় এমনই শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে তাঁর সেবা করতে যেতেন।

তখন তাঁদের মধ্যে দেশের অনেক সমস্যা নিয়ে একটা ঘন্টার পর ঘণ্টা আলোচনা হত।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় ১১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থ 'করবেস ম্যানসন' নামক ভবনে দেশবন্ধুর 'মহামণ্ডলাতে' গৌড়ীয় সর্ব বিদ্যায়তন নামক জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই গৌড়ীয় বিদ্যায়তনের পরিচালনায় ঐ বাড়ীতেই কলিকাতা বিদ্যালয় নামে একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই গৌড়ীয় সর্ব বিদ্যায়তনের পরিচালনায় ঐ বাড়ীতেই কলিকাতা বিদ্যালয় নামে একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুভাষচন্দ্র ছিলেন এই কলেজের অধ্যক্ষ, আর শরৎচন্দ্র এই কলেজের বাংলা ভাষার প্রধান অধ্যাপক ছিলেন।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বাঙলা দেশে কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে দুটি দলের সৃষ্টি হয়।

এই দলের একদিকে থাকেন জে, এম, সেনগুপ্ত অপরদিকে থাকেন সুভাষচন্দ্র বসু।

শরৎচন্দ্র তখন সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করে তার পক্ষ অবলম্বন করে-ছিলেন।

সুভাষচন্দ্রকে স্নেহ ও প্রীতি ছাড়াও রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য শরৎচন্দ্রকে অনেক অপমানও সহ্য করতে হয়।

প্রসঙ্গত একটা ঘটনা উল্লেখ করছি। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে কুমিল্লায় যুবসম্মেলনের যে অধিবেশন শুরু হয় তাতে শরৎচন্দ্রও যোগদান করেছিলেন।

কুমিল্লায় যাবার পথে সুভাষচন্দ্রের বিরোধী দল শরৎচন্দ্রের প্রতি এক জায়গায় অসম্মান দেখায়।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে শরৎচন্দ্র ১৩৩৮ সালের ৩০শে বৈশাখ এক পত্র লেখেন :—

শরৎচন্দ্রের চিঠিটা এই রকম :—

'মণ্টু, দেশোদ্ধার করবার জন্য সুভাষের দল আমাকে বলপূর্বক কুমিল্লায় চালান করে দিয়েছিল। পথে একদল শেম শেম বললে গাড়ীর জানালার ফাঁক দিয়ে কয়লার গুঁড়ো মাথায় গায়ে ছড়িয়ে প্রীতি স্থাপন করলে, আবার একদল বারো ঘোড়ার গাড়ীতে চাপিয়ে নিয়ে দেড় মাইল লম্বা শোভাযাত্রা করে জানিয়ে দিলে কয়লার গুঁড়োটা কিছুই নয়—ও মায়া! যাই হোক রূপনারায়নের তীরে আবার ফিরে এসেছি। জয় হোক কয়লার গুঁড়োর···জয় হোক। ...

"স্মৃতিকথা" প্রবন্ধটি শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুকে উদ্দেশ্য করে লেখেন। দেশবন্ধুর তিরোভাবের পর শরৎচন্দ্রের 'স্মৃতিকথা' পড়ে মান্দালয় জেল থেকে শরৎচন্দ্রকে সুভাষচন্দ্র লিখলেন।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

মাসিক বসুমতীতে আপনার 'স্মৃতিকথা' তিনবার পড়লুম। ····
আপনি স্মৃতিকথার মতো দেশবন্ধু সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ বা
কাহিনী লিখুন।···

সুদূর মান্দালয় জেলে বসে কয়েকজন বাঙ্গালী রাজবন্দী যে
অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সে রচনা পাঠ ও উপভোগ করবে সে বিষয়ে
কোন সন্দেহ নেই।

শরৎচন্দ্রের তিরোধানের পর সুভাষচন্দ্র বেদনাজড়িত কণ্ঠে বলে,—
ছিলেন : একাধারে শরৎচন্দ্র ছিলেন একজন আদর্শ লেখক, আদর্শ
দেশপ্রেমিক ও আদর্শ মানব।

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র নায়ক সব্যসাচীর চরিত্র যেন
নেতাজীর প্রতিধ্বনি।

তাই নেতাজী বার বার বলেছিলেন : 'পরাধীনতার মত অভিশাপ
আর নাই। আমাদের এই দেশ আজ পদদলিত ও অবহেলিত।
এই দেশকে মুক্ত করিবার জন্য আমাদের আজ জাগিতে হইবে।
আমি কল্পনা বিলাসী বিলাসী সত্য কিন্তু আমার স্বপ্ন আমি সফল
করিবার জন্য নিজের জীবন বলি দিতে প্রস্তুত আছি।"

স্মৃতি রেখা

যামিনীকান্ত সোম

স্মৃতির রেখা মোছে না কখনো। অনেক দিনের হলেও মনে
পড়ছে বেশ। সেই কথাই আজ বলবো। ছুটি নিয়ে এসেছি এখানে
—হাওড়ায়। শুনলুম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মশায়
হাওড়াতেই থাকেন। সে ১৯১০ সালের কথা। হাওড়ায় যখন
থাকেন, দেখা করতেই হবে। কিন্তু হাওড়ায় কোথায় কি, কিছুই

জানি না। নতুন এসেছি। সন্ধান করে জানলুম, থাকেন তিনি বাজেশিবপুরের এক জায়গায়। বাজেশিবপুর! এ আবার কি নাম। চললুম, বাজেশিবপুরের খোঁজে। জিজ্ঞাসা করি, কেউ কিছুই বলতে পারে না। খুঁজেই চলেছি। শেষকালে এক ভদ্রলোক বললেন, শরৎ চাটুজ্জ্যের কাছেই যাবেন? চলুন দেখিয়ে দিই। গিয়ে সেঁধুলেন এক সরু গলির ভেতর। বললেন, ওই শরৎবাবুর বাড়ী। যান ভেতরে। ঢুকে দেখি, এক মোটা কুকুর শুয়ে রয়েছে—পরে জানলুম সেই হোল শরৎবাবুর ভেলু কুকুর। শরৎবাবু বাড়ী নেই। "দেখুন তো পাশের বাড়ীতে—সেখানে আছেন হয়তো"। একজন চলেছেন সঙ্গে। দেখলুম, সরু গলির ভেতর ছোট্ট এক বাড়ীর রকে বসে কথা কইছেন কয়েকজন ভদ্রলোক। চিনি না তো। লোকটি দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "ওই তো রয়েছেন। খালি গা, হুঁকো হাতে!" বসলুম। এক ভদ্রলোক আপিস থেকে চা এনেছেন, তাই নিচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "কতো?" "বারো আনা।" "কালকের মতো তো? ভালো চা? আরো এক প্যাকেট আনবে কিন্তু কাল।" আমার সঙ্গে পরিচয় হোল। বললাম, "আপনার নাম শুনেছি, তাই দেখা করতে ইচ্ছে হোল। আমি থাকি না এখানে।"

"এখানে থাকেন না! আলাপ করতে চান? বেশ, আসুন এক সময়। আজ বেলা হয়ে গেছে—স্নান করতে হবে।"

বাড়ী তো দেখেছি। আর একদিন সকাল সাতটায় গিয়ে হাজির। "আসুন, আসুন—বসুন!" সেটা ছিল ছুটির দিন। দেখলুম অনেকগুলি ভদ্রলোক রয়েছেন। ভেলু পা ছড়িয়ে শুয়ে রয়েছে দরজার সামনে। ঘরখানি বেশ সাজানো-গোছানো। কার্পেট পাতা ভেতরের ঘরে বেশ ভাল এক টেবিল। সামনে ভাল একখানি চেয়ার। লেখার সরঞ্জাম রয়েছে দেখা যাচ্ছে। ঘরখানি

বিলাসবর্জিত। অথচ বেশ সাজানো পরিষ্কার। দেখলাম, বেশ মজলিসি গল্প হচ্ছে। শরৎবাবু চমৎকার কথা কইয়ে লোক। খুব রসাল দিয়ে ট্রেনে যাবার গল্প বলছেন। বললেন ট্রেনে উঠলাম, কি ভীড়! একজন পায়ে-হাতে মোজা-দোস্তানা এঁটে পটু কোট পরে, মাথায় পট্টি বেঁধে, পৌট্‌ল-পুট্‌লি নিয়ে অন্ততঃ আড়াই জনের জায়গা নিয়ে বসেছে। আমি তাকে বললুম একটু সরে বসুন পৌট্‌লা-পুট্‌লি সরান, আমায় একটু বসতে দিন। লোকটি ঘাড় নেড়ে বললে, পোট্‌লা সরাবো?—কেন? আমি বললুম আচ্ছা ছোটলোক তো! সরাও পৌট্‌লা—আমি বসি। আপনি কে মশাই, আমাকে ছোটলোক বললেন! এই বলে চোখ পাকিয়ে উঠলো। আমাকে সঙ্গীটি বললেন, ওহে শরৎ, থাক থাক তর্ক করতে হবে না! এখানে এসো। পাশের জায়গায় গিয়ে বসলুম। সে লোকটি তবু ছাড়ে না। আমায় বলছে আমায় আপনি ছোট-লোক বলেছেন। আপনার নাম শরৎ। শরৎ কি? আমার সঙ্গীটি বললেন, উনি শরৎ চাটুয্যে, ভাল লেখক, নাম শোনেননি? আর যায় কোথায়। অ্যাঃ, আপনি শরৎ চাটুজ্যে? লেখক? আপনি আমায় ছোটলোক বললেন একথা আমি সকলকে বলবো—বলবো। কি সর্বনাশ! আরে থামুন মশাই—থামুন। থামবো কেন? বলবো আমি সকলকে। এ তো মহাবিপদে পড়া গেল। সঙ্গীকে বললুম, তুমি আমার নাম বললে কেন বল তো? এখন ওকে সামলাও। সঙ্গীটি তখন তাকে বোঝাতে লাগলো। "মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে কথাটা, ঠেলাঠেলির সময়। কিছু মনে করবেন না—মাফ করুন। এইরকম অনেক করে বোঝাতে তবে সে ঠাণ্ডা হয়। দেখুন তো মশাই কি হাঙ্গামা! কখনো এমন হয়নি। হঠাৎ হয়ে গেল সেবার।" দেখলুম শরৎবাবু মজলিসি লোক। এমন রসালো আর মধুর করে বলতে লাগলেন যে, সবলে হেসেই অস্থির।

গল্প চলছে—চা-ও চলছে, তার সঙ্গে রুটি মাখন। সেদিন আর

কোন কথা হোল না। বললুম, "আবার কখন আসব?"

তিনি বললেন, "যখন ইচ্ছে এসো না হে!"

সেদিন রবিবার। সকাল বেলায় গেলুম। গিয়ে দেখলুম, অনেক লোক জমেছেন। খুব গল্প চলছে।

বললেন, এসো হে বোসো। গল্প চলছে, গুরুজীর জাহাজ ভক্ষণের গল্প। বলছেন, ভাসানপুরের কথা, আর এক গুরুজীর কথা।

গুরুজীর বহু শিষ্য-সেবক। সবাই থাকেন তটস্থ। গুরুজী একদিন বললেন দেখ গঙ্গামাঈর পূজা করতে হবে। তার ব্যবস্থা কর দেখি।

শিষ্যরা বললেন, সে আর বেশী কথা কি। কালকেই করছি। এই বলে, পূজার নৈবেদ্য, নানা উপকরণ—নানা রকমের ফুল সব হাজির করলো শিষ্যেরা। পূজার ব্যবস্থা হোল গঙ্গা ঘেঁষে।

গুরুজী পূজায় বসলেন। শিষ্যরাও ঘিরে বসেছে সব। এমন সময় ভীষণ গর্জন করতে করতে, জল তোলপাড় করে এক বড় জাহাজ এসে পড়লো সেই ঘাটে। রোজই আসে, আজও এলো। আর ঘাটের ধার দিয়ে যাবার সময় জল তোলপাড় করে ভীষণ ঢেউ তুলে গুরুজীর গঙ্গাপূজার নৈবেদ্য উপকরণ; ফুলটুল সব ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেল। গুরুজী তো রেগেই অগ্নিমূর্তি! আস্ফালন করে বললেন আচ্ছা, জাহাজ কাল তুমি এসো তোমার মুণ্ডু খাব আমি, তবে আমি গুরুজী! কাল আমি জাহাজকে জাহাজ খেয়ে ফেলবো, তবে আমার নাম। শিষ্যরা গুরুজীর রাগ দেখে, আর এক জাহাজ খাওয়ার কথা শুনে ভেবেই অস্থির।

পরদিন জাহাজ আসতে লাগল দূরে। গুরুজী তাই দেখে এক হাঁটু জলে রইলেন দাঁড়িয়ে। সে তার কি রুদ্রমূর্তি। জাহাজ আসুক এলেই খাব। তারপর ভীষণ গর্জন করতে করতে জাহাজ আসতে লাগল। গুরুজী এক হাঁ করে এগুতে লাগলেন এমন সময় হোল

কি, গুরুজীর জনকয়েক শিষ্য আর সেবিকা মহা আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে গুরুর পায়ের তলায়, সেই জলের মধ্যেই লুটিয়ে পড়লো। বললো, এ কী করছেন আপনি গুরুজী? জাহাজ খাবেন? জাহাজ কত নিরীহ ছেলে-পিলে মেয়ে মানুষ, কত ভাল মানুষ লোক সব আছে। তারা কোন অপরাধ করেনি। জাহাজ খেতে হলে, তাদেরও সব খেতে হবে। তাদের কি দোষ। আপনি এত বড় গুরুজী, আপনার কি এ কাজ সাজে? ক্ষান্ত হোন। ক্রোধ সম্বরণ করুন। মাফ করে দিন জাহাজটাকে। ও জড় পদার্থ, ও কি বোঝে।

গুরুজী চোখ বড় বড় করে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। তারপর ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, ঠিক বলেছিস তোরা। নিরীহদের খাবো না—জাহাজটা খাবো না তাহলে। যাক্। তোদের কথায় ওকে ছেড়ে দিলাম। জাহাজ ততক্ষণে এসে পড়েছে। জাহাজটা ভীষণ গর্জনে ভয়ানক ঢেউ তুলে গুরুজী আর শিষ্য-সেবিকাদের ভিজিয়ে দিয়ে সেখান দিয়ে চলে গেল গুরুজী হাত নাড়তে নাড়তে চেঁচিয়ে বললেন, "যা যা, এ যাত্রা বেঁচে গেলি।" তাঁর মুখে এই গল্প শুনে সবাই হেসে লুটোপুটি।

শুনেছি, শরৎচন্দ্রের গলার সুর খুব মিষ্টি, সুন্দর গান করতে পারেন। কিন্তু তাঁর মুখে গান শুনবার সৌভাগ্য হয়নি। তবে তিনি ছিলেন গল্পের রাজা। অফুরন্ত গল্প শোনা যেতো তাঁর কাছে।

একদিন গেলুম দুপুরের পর। সেদিন রবিবার। তাঁর লেখার কথা হল। বললেন—লেখেন তিনি রাত্রিবেলা। দিনের বেলা লোকজন আসেন, গল্পে সল্পেই কেটে যায়। জিজ্ঞাসা করলেন…… তুমি কি কিছু লেখ? লেখার অভ্যাস আছে? আমি বললুম,—লেখার অভ্যেস তেমন নেই। তবে মাঝে মাঝে "প্রবাসী", "মানসী" ও "মর্মবাণী" প্রভৃতিতে ছোট-খাটো লেখা দিই।

বললেন, সমাজপতি? সমাজপতি ছিলেন বিচক্ষণ সম্পাদক। তবে দোষও ছিল ঢের। খুব রবীন্দ্র-বিদ্বেষী ছিলেন। এসব ভাল

নয়। যাক্। এখন কিছু লিখেছ?

—ইবসেনের Doll's House নিয়ে লিখছি।

কি করছো? অনুবাদ?

—অনুবাদ ঠিক নয়। বাংলার ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে বাংলাতে আনতে চাই—Doll's House-এর বিষয়বস্তুটা। শুনে চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন—ভাব নিয়ে চেষ্টা করতে পার। তবে অনুবাদ করতে যাওয়া ঠিক হবে না। অনুবাদের কাজে যেও না।

—কিন্তু অনুবাদে তো শিক্ষণীয় আছে অনেক। ওরিজিনাল লেখা তা তো সহজ কথা নয়। অনুবাদ করতে করতে যদি কিছু হয়।

—একবারেই কি হবে? ক্রমশঃ হবে। চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন—এই আমারই কথা ধর না। প্রথম প্রথম বিশৃঙ্খল জীবনের মধ্যে দিয়ে কাটিয়েছি। ক্রমশঃ সাহিত্যের দিকে ঝোঁক গেল। এ ঝোঁক আমার বাবার কাছ থেকে পাওয়া—অনেকটা উত্তরাধিকার সূত্রে। তাঁর গুণাবলী সকলে জানতেন না। ছিলেন সাদাসিধে মানুষ। ছেলেবেলাও একবার তাঁর তোরঙ্ হাতড়ে তাঁর অনেক কিছু লেখা পাই, আর তাতে তাঁকে বুঝতে পারি।

এই বলে আবার খানিকক্ষণ চুপ করলেন। তারপর বললেন—প্রথম প্রথম লুকিয়ে লুকিয়ে লিখতুম আর ফেলে ফেলে দিতুম। অভাবের তাড়নায় লেখাপড়া কই তেমন হয়েছে! তেমন হয়েছে! বাবা মারা যাওয়াতে বিপদে ঘনীভূত হয়ে ওঠে। ছন্নছাড়া হয়ে বেরিয়ে পড়ি।

আবার চুপ করে গেলেন কিছুক্ষণ। তারপর বলেন—আমি বাপু অত-শত জানি না। লেখা-পড়াই বা কি করেছি। সাদাসিধে ভাবে শুধু মনের কথা লিখে যাই। মনে যা অনুভব করি বা উপলব্ধি করি,

তাই প্রকাশ করি আমার সোজা সাদাসিধে কথায়—।

এরপর আরো কি বলতেন জানি না, এমন সময় হঠাৎ কবি-গিরিজাকুমার এসে হাজির হলেন। প্রসঙ্গটা অন্য দিকে চলে গেল।

একটা জিনিস লক্ষ্য করবার যে, শরৎচন্দ্র রেখে-ঢেকে কথা কইবার মানুষ ছিলেন না। তাঁর কোন রকম ঢং বা চাল দেখিনি আদবেই। তাঁর সঙ্গে বসে কথা কইলে, তাঁকে অসাধারণ মানুষ বলে বোঝা যেতো না। অথচ প্রকৃতপক্ষে তিনি অসাধারণই ছিলেন।

আর একদিন গেছি তাঁর বাড়ীতে। বসে বসে কথা হচ্ছে। এমন সময় বাড়ীর ভেতর থেকে স্ত্রীলোকের কান্না উঠলো। আমি বিস্মিত হয়ে চাইলাম। বললেন—দিদি যাচ্ছেন বাড়ী। একজন মারা গেছেন, তাই কাঁদছেন।

এখানে মারা গেছেন? জিজ্ঞাসা করলুম আমি।

বললে— এখানে নয়, গ্রামে—সামতাবেড়ে, দেউলটির কাছে।

গল্প করতে করতে বিকেল হল। বললেন চলো হে, একবার থানায় যেতে হবে। থানায় যেতে হয়—সপ্তাহে একবার দেখা দিতে হয়।

যেতে-যেতে ছোট্ট একটি পুকুর পড়লো। পাড়াগাঁয়ের মতো জায়গা। একটি মেয়ে এসেছে পুকুরে কলসী নিয়ে। শরৎবাবু দাঁড়িয়ে গেলেন। নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে দেখতে লাগলেন। আমি তো অবাক্! এত দেখছেন কি? আর দেখা কি উচিত।

একটু পরে বললেন—চলো যাই।

তিনি গেলেন থানার দিকে। আমি চলে এলুম।

তারপর একদিন ভোজের নেমতন্ন এলো। নেমতন্ন করতে এসেছেন কবি গিরিজাকুমার বসু। এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে আগে। গিরিজাবাবু বললেন—যাবেন অবিশ্যি। জলধরদাদা, মণি গাঙ্গুলী, নরেন্দ্র দেব, আরো অনেকে আসবেন। আমারই বাড়ীতে যাবেন।

শরৎবাবুর ওখানে জায়গা হবে না তো।

শরৎবাবুর বাড়ীর কাছেই গিরিজাবাবুর বাড়ী। বেশ সুন্দর দোতলা বড় বাড়ী। গেলাম সেখানে। কলিকাতা হতে সাহিত্যিকরা সকলেই এসেছেন। জলধর সেন, নরেন্দ্র দেব, মণি গাঙ্গুলী ইত্যাদি বহু সাহিত্যিকের সমাবেশে মজলিস খুব জমালো। খাওয়া-দাওয়ার প্রচুর আয়োজন। শরৎবাবু উপস্থিত রইলেন সর্বক্ষণ। খুব আনন্দ হল।

আমার ছুটি ফুরুলো। চলে গেলুম।

এর দু'বছর পরে দিল্লীতে হবে কংগ্রেস অধিবেশন। দেশবন্ধু সদলে হাজির হলেন। সুভাষচন্দ্র, ভূপতি মজুমদার, দিলীপকুমার, কুমুদশঙ্কর প্রভৃতি এখানকার বিখ্যাত বিখ্যাত সবাই আছেন সঙ্গে। Forward-এর বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি কংগ্রেসের প্রত্যেক ক্যাম্পে। একেবারে হৈ হৈ ব্যাপার। একজন এসে বললেন—ওহে! শরৎবাবু এসেছেন। তোমার খোঁজ করছিলেন।

—তাই নাকি!

—কংগ্রেস ক্যাম্পে তিনি ওঠেননি। রেলওয়ে ওভারসিয়ার গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাসায় উঠেছেন।

গেলাম সেখানে। গিয়ে দেখলাম গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাড়ীখানি আছে, কিন্তু তিনি নেই—কেউই নেই। গেছেন ছুটিতে দেশে। শরৎবাবু দেখলুম, এখানে দিব্যি সেজে বসে গেছেন। ঢুকেই দেখলাম বারান্দার একধারে অন্ততঃ দশ-বারো জোড়া রকমারী ধরনের জুতো সার দিয়ে সাজানো রয়েছে। নজর পড়ে প্রথমেই। আমারও নজর পড়লো।। শরৎবাবু বললেন—আমারই হে সবগুলো। তাঁর চাকর ছিল সামনে দাঁড়িয়ে। এই কথা বলে, চাকরের দিকে চেয়ে হাসলেন, তারপর আমায় বললেন—এসো। এ বাড়ি তো খালি। কেউ নেই। যাক্, চাকর আছে, আমার চলে যাবে এক রকম। কংগ্রেস ক্যাম্পে গেলুম না। এখানেই থাকা যাক্।

আমি আর কি বলবো। বললুম কংগ্রেসে যাবেন না?

তিনি বললেন—না। আজ কংগ্রেস নেই। থাকলেও যেতাম না। আমি এলাম শুধু দলে পড়ে—বেড়াতে। তা এখানটাতো বেশ লাগছে।

দেখলুম খুব বড় বড় দু'ছড়া আঙ্গুর একটা থালার উপর রাখা রয়েছে। খানিক করে ভূপতি মজুমদার মশাই এলেন। এসে বসলেন। কথা কইতে কইতে বললেন—তাইতো, এ দেখছি বড় বড় আঙ্গুর। এ কোন দেশে এলাম। আমাদের দেশে ছোট বাক্সের ভেতর আঙ্গুর আসে, বাড়ীতে অসুখ করলে। তার ভেতর আটটা ভালো—শুকনো শুকনো, ছোট ছোট, আর চারটে পচা। এ কোন দেশে এলাম মশাই।

তারপর কংগ্রেসের কথা উঠলো। তিনি বললেন—আমি হলুম সেক্রেটারী আর আমার এ্যাসিষ্টাণ্ট হলেন একজন আই, সি, এস. (অর্থাৎ সুভাষবাবু)। বেশ আছি। দেখুন কি দাঁড়ায়।

একটু পরে দিলীপকুমার রায় এসে হাজির। তাঁর চেহারাটি শুকনো শুকনো। বেলা হয়ে গেছে। তিনি বললেন মুস্কিলে পড়ে গেছি। হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকেরা তাদের বাড়ীতে আমায় ধরে নিয়ে যান গান শোনাতে। মজলিশ হয়ে গান করি। কিন্তু গানের শেষে খেতে দেয় গোটা কয়েক রসগোল্লা দিয়ে বলেন—এই দেখ তোমাদের রসগোল্লা। আমার রসগোল্লা খেয়ে খেয়েই দু'দিন কেটেছে। ভাত খাইনি আজকেই।

শরৎবাবু বললেন—ভালো কথাই তো, তুমি তাদের গান শোনাও মিষ্টি, তারাও তোমায় খেতে দেয় মিষ্টি। তা বেশ হয়েছে। আচ্ছা আমার এখানেই খাও।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় কংগ্রেস ক্যাম্পে হিন্দু কলেজে বিরাট এক গানের মজলিশ হল। দিলীপকুমার তাঁর পুলকিত মধুর কণ্ঠে অপূর্ব অপূর্ব গান শুনিয়ে সকলকে মাতিয়ে দিলেন। সকল বাঙালী ভদ্র-

লোকই প্রায়ই এসেছিলেন। শরৎবাবু অবশ্যই উপস্থিত ছিলেন।

হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রকুমার সেন মহাশয়ের বাড়ীতে সকলের মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ হল। কুমুদশঙ্কর রায় হলেন অধ্যক্ষ মহাশয়ের আত্মীয়। সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, কুমুদশঙ্কর প্রভৃতি আরো আরো অনেকেই উপস্থিত। সম্মানিত অতিথিদের নিমন্ত্রণ। বিপুল ঘটা হয়েছে খুব আয়োজন। সকলে খেতে বসলেন। খাওয়ার সময় গল্প হচ্ছে। সুভাষের পাশেই বসেছেন শরৎবাবু। সুভাষচন্দ্রের খদ্দরের বেশ—খদ্দরের জামা, খদ্দরের ধুতি; খুব মোটা-সোটা। তা হোক। শরৎবাবু দেখছেন আর বলছেন ধীরে ধীরে অল্প কথায়। —খদ্দর না হোলে সুভাষকে মানাবে কেন? একটু মোটা হয়েছে তা মানিয়েছে কিন্তু বেশ। খাঁটি জিনিস একটু মোটা হয়ই। সুতো হবে চরকায় করে হাতে কাটা, তারপর তা হবে হাতে বোনা। সেই তো আসল, সে-ই তো খাঁটি জিনিস মোটা হয়—

তা না হয় হলই। ওহে ভূপতি! নজর রেখো তোমরা। খুব মোটা হবে? হলই বা! ছোট হবে একটু? তা না হয় একটু হলই। কিন্তু খাঁটি খদ্দর না হলে কি সুভাষের চলে?—তাঁর বলবার ভঙ্গী দেখে সকলের কি হাসি! খাওয়া চললো, গল্পও চললো শেষ পর্যন্ত।

স্মরণীয় দিন

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র শুধু আমার আত্মীয়ই (ভাগিনেয়) ছিলেন না, তিনি আমার আবাল্য সুহৃদ ছিলেন। সম্পর্কের হিসাবে আমি তাঁর গুরুজন ছিলাম, বয়সের হিসাবে তিনি আমার চেয়ে কয়েক বৎসরের বড় ছিলেন; এই উভয় হিসাবের মধ্যমবর্তিতায় আমাদের পরস্পরের

মধ্যে একটা প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়েছিল। একথা ঠিক একইভাবে আমার খুল্লতাত দাদা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর পরলোকগত অনুজ গিরীন্দ্রনাথ ভায়ার বিষয়ের খাটে।

শুধু তাই নয়, আমাদের সাহিত্য জীবনে তরুণ অবস্থায় শরৎচন্দ্র আমাদের এই তিন ভাইয়ের সাহিত্য বিষয়ে গুরু স্বরূপ ছিলেন। একথা শরৎচন্দ্র নিজেও অনুভব এবং স্বীকার করতেন। রেঙ্গুনে বাস কালে ১৯১৩ সালের ১০ই মে তিনি আমাকে যে পত্র লিখেছিলেন তাতে পাণ্ডুলিপি "চরিত্রহীন" সম্বন্ধে আলোচনার মধ্যে বলেছিলেন, "* * * তবুও তাদের ভয় পাচ্ছে শেষটা বিগড়াইয়া ফেলি। তারা এটা ভাবে নাই, যে লোক ইচ্ছা করিয়া 'মেসের ঝিকে আরম্ভেই টানিয়া আনিয়া লোকের সুমুখে হাজির করিতে সাহস করে সে তার ক্ষমতা জানিয়াই করে। তাও যদি না জানিব তবে মিথ্যাই এতটা বয়স তোমাদের গুরুগিরি করিলাম।"

আজ আমি শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে যে কাহিনী লিখতে উদ্যোত হয়েছি তা তাঁর জীবনের একটি স্মরণীয় দিনের কথা। বোধ করি সেদিন তাঁর সাহিত্য জীবন একটি প্রবল গতিবেগ লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল।

সে আজ প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর পূর্বের কথা. হয়ত ইংরাজী ১২১২ সালের কথাই হবে! আমি তখন কলিকাতার ভবানীপুরে ৮৫ নং কাঁসারীপাড়ায় বাস করি। এই বাড়ী থেকেই কিছুকাল পূর্বে শরৎচন্দ্র ৮।৯ মাস বাস করবার পর রেঙ্গুনে গমন করেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরে দেখি আমার অনুপস্থিতিকালে শরৎচন্দ্র আমার সহিত সাক্ষাৎ করবার জন্য এসে একটি চিঠি লিখে ফিরে গেছেন। সংক্ষিপ্ত চিঠি, একজন ভৃত্যের হাতে লিখে দিয়ে গেছেন: "প্রিয় উপেন, আমি কয়েকদিন হ'ল বর্মা থেকে কলকাতায় এসেছি। তোমার সহিত দেখা করতে এসে দেখা পেলাম না। আর একদিন আসব। ইতি তোমার শরৎ।"

চিঠি পড়ে আনন্দিত যেমন হলাম, দুঃখিত এবং বিরক্তও তেমনি হলাম। শরৎচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হবে সেজন্য আনন্দিত হলাম, কিন্তু কেমন করে যে হবে সে কথার দুশ্চিন্তায় দুঃখিত এবং বিরক্ত হলাম। চিঠিতে না আছে ঠিকানা, না আছে পুনরায় আগমনের দিন এবং সময়ের নির্দেশ। অনুসন্ধানের ফলে অবগত হলাম আর কাহারো সহিত তিনি প্রবেশ করেন নি। যাহোক ভৃত্যদের এবং আত্মীয় স্বজনকে বলে রাখলাম এবার আমার অনুপস্থিতিতে শরৎচন্দ্র আগমন করলে যেন তাঁর কলকাতার ঠিকানা জেনে রাখা হয়। কিন্তু এ নির্দেশও ফল পাওয়া গেল না। আর একবার সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরে ঠিক পূর্বের মত আর একখানি শরৎচন্দ্রের চিঠি পেলাম। বাড়ীর একটি ছোট ছেলের হাতে লিখে দিয়ে ফিরে গেছেন। চিঠিটি এইরূপ: "প্রিয় উপেন আজও আসিয়া তোমার দেখা পাইলাম না। শীঘ্রই বর্মায় ফিরিয়া যাইব। বোধ করি এ যাত্রায় আর দেখা হইল না। ইতি তোমার শরৎ।"

এবার বিরক্তি সপ্তমে উঠিল। আশ্চর্য লোক যা হোক। এই খেয়ালী অন্যমনস্ক মানুষটির চিরদিনই কি একরূপে কাটল। দেখা ত হল না, কিন্তু দেখা হবার সুযোগ না দিলে দেখা হয় কেমন করে? চিঠিতে কলকাতার ঠিকানাটা উল্লেখ করলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হত? কিন্তু শরৎ কলকাতায় এসেছে অথচ তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না একথা কল্পনাই করতে পারিনে। কি উপায় করা যায় তাই চিন্তা করতে বসলাম।

হঠাৎ মনে পড়ল, শরতের মেজ ভাই প্রভাসের কথা। সে তখন স্বামী বেদানন্দ, বেলুড় মঠে বাস করে। পরদিনই গেলাম তার কাছে। বললাম, "শরৎ কলকাতায় এসেছে জানিস তো প্রভাস?" প্রভাস বললে, "তা তো জানি, কিন্তু দাদা দু'দিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখা পাননি।" আমি বললাম, "তোমার দাদার যা বুদ্ধি দেখা পাবে কেমন করে? না লিখে আসে দেখা করতে যাবার দিন

আর সময়,—না লিখে আসে তার ঠিকানা। তুই জানিস তো তার ঠিকানা আমাকে দে।"

প্রভাসের কাছ থেকে শরতের ঠিকানা এবং বাসায় অবস্থিতি বুঝে নিয়ে আমি পরদিন হাওড়ায় খুরুট রোডের নিকটবর্তী একটি গৃহে উপস্থিত হলাম। শরৎ তখন ক্ষুদ্র একটি কক্ষে বসে নির্দিষ্ট চিত্তে কি লিখছিল। চতুর্দিকে কতকগুলি খাতা-পত্র এলোমেলোভাবে ছড়ান এবং কয়েকটি ফাউন্টেন্‌পেন মোটা মাঝারি সরু, বেগুনে এবং কালো কালির ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। আমাকে সহসা সেখানে দেখে শরৎ একেবারে চমকে উঠল। বলল, "একি! তুমি কেমন করে এখানে এলে?"

আমি বললাম, "কেমন করে এলাম তা পরে বলছি, কিন্তু আর একদিন আসবো' লিখে আস অথচ কবে আসবে কখন আসবে তা লিখে আস না, 'এ যাত্রায় দেখা হল না, লিখে আস অথচ ঠিকানা দিয়ে আস না এ তোমার কেমন ব্যবহার?

বলা বাহুল্য, এই বিবাদের সন্তোষজনক নিষ্পত্তি অবিলম্বেই হয়ে গেল। দেখলাম শরৎ সে সময় চরিত্রহীনদের অষ্টম কি নবম পরিচ্ছেদ লিখছিলেন। ঘণ্টা দুই কাল কথোপকথনে কাটিয়ে সন্ধ্যার সময় ভবানীপুর ফিরলাম। উঠবার সময় চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি (প্রথম পরিচ্ছদ হতে যে পর্যন্ত লেখা হয়েছিল) হস্তগত করে বললাম, "পরশু দুপুরে এসো, বাড়ী থাকবো।" শরৎ বলল, আসবো।" বড় রাস্তা পর্যন্ত এসে আমাকে হাওড়ার ট্রামে তুলে দিয়ে সে ফিরে গেল।

বাড়ী ফিরে তখনি চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপিখানি এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম। খুশিতে মন ভরে উঠল। কি অদ্ভুদ লেখা, কি কি অপূর্ব প্রকাশ ভঙ্গি! শরৎচন্দ্র তখনও বাঙালী পাঠক-সমাজে অপরিচিতই। এর পূর্বে তার লেখা "বড়দিদি" ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে সাহিত্যিক-মণ্ডীতে কিছু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল বটে

কিন্তু দীর্ঘকালের অন্তরাল হেতু সে কথাও অনেকে ভুলে গিয়েছিল।

পরদিন সকালেই চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি নিয়ে শ্যামপুকুরে রাম-ধন মিত্রের গলিতে "সাহিত্য" পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হলাম। সমাজপতি মহাশয় তখনকার দিনে একজন খ্যাতনামা 'সাহিত্য-জহুরী' এবং তদ্বিষয়ে নির্ভিক এবং অনেক সময়েই তীক্ষ্ণ কটুভাষী সমালোচক। তাঁর প্রশংসাবাণীর প্রত্যাশায় এবং নিন্দাভৎর্সনার আতঙ্কে তখনকার লেখকদের মন নিরন্তর চকিত হয়ে থাকত। মনে করলাম সুরেশবাবুকে দিয়ে যাচাই করে নিলে শরতের লেখার মূল্য বিষয়ে একটা সুনির্দিষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

উদ্বিগ্ন চিত্তে সমাজপতির হস্তে চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি দিয়ে বললাম, "এটা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটা নতুন আরম্ভ করা বইয়ের পাণ্ডুলিপি। আমার ত খুব ভাল লেগেছে, আপনি একবার পড়ে দেখবেন?"

সমাজপতি মহাশয় বললেন, "শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়?"

"বড়দিদি" লেখকের কথা উল্লেখ করলাম। তাঁরও মনে পড়ল। আগ্রহ সহকারে বললেন, 'আচ্ছা রেখে যাও, কাল কোনও সময়ে এসো।"

পরদিন সকালে সমাজপতি মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, "অদ্ভুত প্রতিভাবান লেখক এই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অদ্ভুত লেখা এই চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি। কিন্তু এ গল্প সাহিত্যে প্রকাশিত করতে লোভ যেমন হয় ভয়ও তেমনি হয়। যা হোক তুমি একে একদিন আমার কাছে নিয়ে এসো।

সেদিনই বৈকালে নিয়ে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আনন্দোচ্ছল হৃদয়ে প্রত্যাগমন করলাম।

দ্বিপ্রহরে শরৎ আসতেই বললাম 'সমাজপতি মহাশয় তোমাকে ডেকেছেন। চল এখনি বেরিয়ে পড়ি।"

শুনে শরৎচন্দ্রের মুখ আতঙ্কে একেবারে শুকিয়ে গেল ; বললেন "কেন? আমার লেখা সমাজপতিকে দেখিয়েছো নাকি ?"

বললাম "দেখিয়েছি।"

মাথা নেড়ে চিন্তিত মুখে শরৎচন্দ্র বললেন, "ভাল করনি উপীন, ভারি ঠোঁট কাটা লোক কতকগুলো কটুবাক্য করবে।"

প্রকৃত কথাটা গোপন রেখে আমি বললাম, 'দেখাই যাক্ না, কি তিনি বলেন। আবারযখন লিখতে আরম্ভ করলে তখন নিন্দা প্রশংসার জন্যে প্রস্তুত ত হতেই হবে।"

কোনর প্রকারে শরৎচন্দ্রকে রাজি করে উভয়ে সমাজপতি মহাগৃহের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সমাজপতি কান মলেই দেবেন, না বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়েই দেবেন শরৎচন্দ্রের মনের মধ্যে তখন এই রকম একটা ভয়। একজন শঙ্কা ব্যাকুল মনে আর একজন কৌতুক প্রফুল্ল চিত্তে সমাজপতি মহাশয়ের গৃহে প্রবেশ করবাম।

তারপর যে ব্যাপারটা হল সেকথা মনে আজও আমার মন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। প্রশংসার অজস্র অমৃতবর্ষণে সুরেশচন্দ্র শরৎচন্দ্রের কান এবং প্রাণ পরিপূর্ণ করে দিলেন। সেই অপরিমিত এবং বোধকরি কতটা অপ্রত্যাশিত প্রশংসার তাড়নার বিষয়ে এবং আনন্দে শরৎচন্দ্রের মুখে একটা অপূর্ব শোভা ধারণ করল। আমারও মনের মধ্যে আনন্দের শরিসীমা ছিল না। কিছুক্ষণ সমাজপতি মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করে নানাপ্রকার কথাবার্তার পর আমরা বেড়িয়ে পড়লাম।

শ্যামপুকুর স্ট্রীট দিয়ে আমরা উভয়ে কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে ট্রামের রাস্তায় উপনীত হলাম। সেদিনটা ভারী বিশ্রী মেঘলা বাদলা দুর্যোগের দিন। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে, হু হু করে হাওয়া বইছে, পথ জলে এবং কাদায় মলিন। আমরা কিন্তু স্বপ্ন-ভঙ্গ হবার আশঙ্কায় জনসঙ্কুল ট্রামে উঠলাম না। একটি ছাতায় কোনও রকমে দু'জনের মাথা গুঁজে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের ফুটপাতের উপর দিয়ে

উভয়ে ধীর পদক্ষেপে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলাম। আনন্দের নেশায় মন বুঁদ হ'য়ে রয়েছে—কথাবার্তাও সেইজন্য বেশী কিছু হচ্ছিল না।

হ্যারিসন রোডের মোড়ে এসে আমাদের ছাড়াছাড়ি হবার কথা, শরৎ যাবেন হাওড়ায়, আমি ভবানীপুরে। কিন্তু কখন যে আমরা অজ্ঞাতসারে হ্যারিসন রোডের মোড় পেরিয়ে গেছি তা জানি না। যখন খেয়াল হল দেখলাম বহুবাজারের মোড়ে এসে উপস্থিত হয়েছি।

শরৎ বললেন, "দেখ উপীন, তোমাদের কথা শুনে, সমাজপতির প্রশংসা শুনে মনে হচ্ছে আর যদি পাঁচটা বছরও বাঁচতাম তা হলে হয়ত বাঙলা দেশকে কিছু দিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু রেঙ্গুনের ডাক্তার বলেছে আমার হার্টের না লাংসের দুরারোগ্য রোগ হয়েছে, আমি বেশী দিন বাঁচব না। রেঙ্গুনে ছেড়ে আমাকে চলে আসতে বলেছে।"

আমি বললাম, "তোমার কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি হয়নি, কিন্তু রেঙ্গুন ছেড়ে চলে এস।"

শরৎচন্দ্র বললেন, "সেখানে একশ টাকা মাইনের সরকারী চাকরি করছি, এক রকম চলে যায়। ছেড়ে এলে খাব কি?"

আমি বললাম, "আচ্ছা সে ব্যবস্থা হবে।"

শরৎচন্দ্রকে চাকরি ছাড়িয়ে বাংলাদেশে নিয়ে আসায় গৌরব গুরুদাস লাইব্রেরীর শ্রদ্ধেয় স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাপ্য।

আমাদের ভবানীপুরের বাড়ীর সম্মুখে তখন "যমুনা" কার্য্যালয়। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল, 'যমুনার' সত্বাধিকারী ও সম্পাদক। আমরা তাঁর কয়েকজন বন্ধু সে সময় 'যমুনার' উন্নতি বিধানে বিশেষরূপে যত্নশীল হয়েছি। যমুনা-চক্রের মধ্যে শরৎচন্দ্রকে বেঁধে ফেললাম। ফণীবাবু তাঁর শ্রদ্ধা, সহৃদয়তা এবং সৌজন্যের গুণে শরৎচন্দ্রকে বশীভূত করলেন। শরৎচন্দ্র যমুনাকে নিয়মিত সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বর্মায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

তারপর কিরূপে মাসের পর মাস বঙ্গোপসাগর উত্তীর্ণ হয়ে বর্মা থেকে বঙ্গদেশে রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, নারীর মূল্য প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ আসতে লাগল, তার ইতিহাস সকলেই জানেন, সুতরাং সেকথা বিস্তারিত ভাবে বলা নিষ্প্রয়োজন।

সমাজপতি মহাশয়ের সহিত শরৎচন্দ্রের প্রথম দর্শনের দিনটি বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে একটি বিশেষ শুভদিন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শরৎদা

—নিরুপমা দেবী

আমরা ভাগলপুরে থাকাকালীন তাঁহার প্রথম সাহিত্য-জীবনে তাঁহাকে [শরৎচন্দ্রকে] যে জানিতাম এই কথার কেহ কেহ আলোচনা করিয়াছেন ....।

আমার দাদারা তাঁহাকে কতদিন হইতে জানিতেন তাহা ঠিক জানি না (মেজদা ৺ইন্দুভূষণ ভট্ট বোধ হয় তাঁহাকে "আদিমপুর ক্লাবেই" প্রথম জানেন) কিন্তু আমি জানিলাম যখন আমার লেখা কবিতা লইয়া দাদারা অত্যন্ত আলোচনা করেন তখন। দাদাদের এক বন্ধু তাঁহার নাম শ্রীশরৎচন্দ্র (মেজদা কিন্তু শরংকে 'ন্যাড়া' বলিয়া উল্লেখ করিতেন।)—তিনিও দাদাদের মারফৎ আমার লেখার পাঠক এবং সমালোচক। প্রথম জীবনের সে অকিঞ্চিৎকর লেখার পাঠক এবং সমালোচক। প্রথম জীবনের সে অকিঞ্চিৎকর লেখার পাঠক আমাদের পরিবারের কয়েকটি সমবয়স্কদিগের মধ্যেই পূর্বে আবদ্ধ ছিল। দুইটি ভাজ, একটি ভগ্নী এবং একটি দুই বৎসরের বড় সহোদর ভাই—ইনিই শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট। ফার্ষ্ট ইয়ারের বা স্কুলের ছাত্ররূপেও তিনি অজস্র কবিতা লিখেন, তাই আমার সহযাত্রী হইলেন। ভাজ দুইটির কল্যাণেই আরার সেই লেখা ও বৈমাত্রেয় বড় ভাই, ভগ্নীপতি প্রভৃতির মধ্যে প্রচারিত হইয়া ক্রমে তাঁহাদের বন্ধু মহলেতে প্রচারিত হইয়াছিল।

ইহার অল্পদিনের মধ্যেই মেজ ভাজ মেজদার নিকট হইতে এক বৃহদায়তন খাতা আমাদের সেই ক্ষুদ্র পরিসর 'সাহিত্যচক্রে' (যাহাতে তদানীন্তন বাঙ্গলার বিখ্যাত লেখকদিগের গদ্য উপন্যাস এবং কাব্য-

কবিতাদি পঠিত ও আলোচিত হইল সেইখানে) হাজির করিলেন। তাহা অতি সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তাক্ষরে লিখিত, নাম 'অভিমান'। শুনিলাম দাদাদের উক্ত বন্ধু শরৎচন্দ্রই ইহার লেখক। গল্পটি পড়িয়া যখন আমরা সকলে অভিভূত তখন মেজদা সাড়ম্বরে গল্প করিলেন যে —"এই গল্পটি পড়ে একজন ন্যাড়াকে মারতে ছুটে ; তাকে তখন এই পাঠকের ভয়ে ক'দিন লুকিয়ে বেড়াতে হয়।" ক্রমে বৌদিদি দাদার নিকটে তাঁহার বন্ধুর সম্বন্ধে আরও কিছু কিছু গল্প সংগ্রহ করিয়া আমাদের মধ্যে প্রচার করিলেন। আমরা তখন "অভিমানের" লেখকের উপরে অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন। সেই উদাসী কবি স্বভাব বিশিষ্ট লেখকটিকে আমাদের বাসার পশ্চিমদিকে যে প্রকাণ্ড মস্‌জিদ ছিল (শুনা যাইত তাহা নাকি শাজাহানের আমলের) তাহার বৃক্ষ-ছায়াময় পথে কখনো কখনো দেখা যাইত। কোন গভীর রাত্রে সেই মস্‌জিদের সুউচ্চ প্রাঙ্গন-চত্বর হইতে গানের শব্দ, কখনো "যমানিয়া" নদীর (গঙ্গার ছাড়) তীর হইতে বাঁশীর আওয়াজ ভাসিয়া আসিলে মেজদা মেজবৌকে শুনাইয়া বলিতেন "এ ন্যাড়াচন্দ্রের কাণ্ড।" আমাদের সেই অল্পদিন অধিকৃত বাসাটি উক্ত নদীর তীরে সুবিস্তৃত টিলার উপর অবস্থিত ছিল। তাহার চারিদিকের অসমতল ভূমিতে তাহাকে পার্ব্বত্য অধিত্যকার মতই দেখাইত। সেই বাটির অধিকারীর আত্মজনের কয়েকটি স্মৃতি-সমাধি নদীতীরের টিলার গাত্রে ক্রমোচ্চ-ভাবে স্থাপিত ছিল। আমাদের দল একদিন সেই-সমাধি হইতে বায়ুপথে ভাসিয়া গানের একলাইন আবিস্কার করিল—"আমি ছুদিন আসিনি, ছুদিন দেখিনি, অমনি মুদিল আঁখি"। ইহার পরে বৈঠক-খানায় তাঁহার কণ্ঠের আরও গান আমরা ভিতর হইতে শুনিয়াছি ; কিন্তু বাঁশী কখনো সে সব বৈঠকের মধ্যে তিনি বাজান নাই।' নব-কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য রচিত আর একটি গান তাঁহার প্রিয় ছিল "গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল আঁটার অজি কুঞ্জবন।"

দুই

আমাদের পাড়া খঞ্জপুরেরই তিনি অধিবাসী ছিলেন, সেজন্য উক্ত মস্‌জিদ ও নদী তীর প্রভৃতি তাঁহার বিচরণ স্থান ছিল এবং দাদাদের কাছেও প্রায়ই আসিতেন। হঠাৎ একদিন জানিতে পারিলাম—তিনি আমাদের ছোটদাদারই বিশিষ্ট বন্ধু। ইহাতে আমাদের দল সেদিন বিশেষ গর্বই বোধ করিয়াছিল।

আমি সে সময় অজস্র কবিতা লিখতাম। ছোটদা তাঁহার নিজের কবিতার সঙ্গে আমার লেখাও তাঁহার সম্মানিত বন্ধুকে দেখিতে দিতেন এবং আমাদের খাতায় তাঁহার হস্তাক্ষরে ঐ সব কবিতা সম্বন্ধে মতামত আসিয়া আমাদের উৎফুল্ল করিয়া তুলিত। একদিন দেখি—ছোটদা আমার একটি নূতন কবিতার মাথায় লিখিয়া দিয়াছেন, "আরো যাও—আরো যাও—দূরে থামিও না আপনার সুরে।" পরে শুনিলাম শরৎ দাদা নাকি তাঁহাকে বলিয়াছেন, "ঐ একটি ভাব আর একটি কথা ছাড়া বুড়ি যদি আর পাঁচরকম ভেবে লেখে তো লেখার আরও উন্নতি হবে এই কথাই ছোটদার হাতে উক্ত কবিতা-কারে আমার লেখার মন্তব্যরূপে বর্ষিত" হয়েছিল। তাঁহাদের এইরূপ মন্তব্যের পর আমি যে কবিতাটি লিখিয়া তাঁহাদের খুশি করি তাহার কয়েক ছত্র মনে পড়িতেছে ; সেও একটি 'সমাধি' উদ্দেশ্যেই কল্পনার সঞ্চরণ—এতে হয়ত অলক্ষ্যে পূর্বতন কবিদিগের কবিতার অনুসরণ বা অনুকরণ।

"ধরণীর সুস্নিগ্ধ বুকেতে কত শান্তি ঢাকা আছে ভাই
নদীতীরে কোমল শয্যায় কে গো তুমি লুকায়েছ তাই।

* * *

নদী গায় সকরুণ তান, হু হু ক'রে উঠিছে বাতাস
এই বুঝি তোমার খেদ গান, এ বুঝি তোমারই দীর্ঘশ্বাস।"

ইত্যাদি সেই ক্রম-বর্ধিকার খানাখানার কথা আজও মনে আছে —যাহার প্রায় প্রতি কবিতার মাথায় আশেপাশে তাহার তরুণ জীবনে সাহিত্যরুচির প্রচুর প্রমাণ ছিল। তিনি নাকি ছোটদাকে বলিয়াছিলেন যে "বুড়ি যদি চেষ্টা করে তো গদ্যও লিখতে পারবে বোধ হয় আমরা তেমন বিশ্বাস করি নাই। ক্রমে আমরা শরৎ দাদার আরও কয়েকখানি খাতা পড়িতে পাই। 'বাসা' (যার নাম সুরেন্দ্রভাই 'কাক বাসা' দিয়াছেন) 'বাগান' (ইহাতে 'বোঝা', 'কোরেল গ্রাম', কাশীনাথ প্রভৃতি অনেকগুলি গল্প ছিল।) 'চন্দ্রনাথ' 'শিশু' 'পাষাণ' (এই গল্পটিকে) আর দেখিলাম না। একজন পরমাণু বাদী নাস্তিক পিতার সন্তানের মানসিক সংঘাতের যন্ত্রণায় আমরা এতই অভিভূত হইয়াছিলাম যে সে গল্পটির কথা আজও মনে আছে; পরে শুনিয়াছি যে অভিমানের মত সে খানিতেও একটি প্রসিদ্ধ ইংরাজী পুস্তকের ছায়া ছিল। কিন্তু ঐ দুইটি গল্পে যে তরুণ শরৎ-চন্দ্রের কতখানি প্রতিভা প্রকাশিত হইয়াছিল সে দুইটি নষ্ট না হইলে আজ তাহার বিচার হইত। এই 'শিশু' গল্পটিই পরে 'বড়দিদি' নাম ধারণ করিয়াছিল। ক্রমে তাঁহাদের 'সাহিত্য সভা' ও 'ছায়ার' কথাও জানতে পারি। আমার লেখাও তাহাতে 'শ্রীমতী দেবী' নামে তাঁহারা নিতে লাগিলেন। একটু আধটু গদ্য লেখার চেষ্টা আসিলেও শরৎদার গল্প পাঠে সে ধৃষ্টতা প্রকাশ তখন বোধ হয় আমাদের লজ্জা আসিত। শ্রীমান সুরেন্দ্র, গিরিন্দ্র, আমার ছোটদা—ইহাদের সঙ্গেই আমার কবিতার প্রতিযোগিতা চলিত। শরৎদাদাই বিষয় নির্বাচন করিয়া দিতেই এবং ছোটদার মারফৎ তাহা আমি পাইতাম। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বোধ হয় এই 'ছায়ার' সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার উপরে আক্রমণ করিয়া উক্ত কবিদলের মধ্যে কে যে এই কবিতাটুকু লিখিয়াছেন তাহা আজ মনে নাই; কিন্তু কবিতাটুকু মনে আছে—

ঐ কুঞ্চিত কেশ মাজিত ক্রিটিক্ যোগেশ ক্রুদ্ধ।

বলে দীনতার ছবি যত সব কবি কারাগারে হবি রুদ্ধ।"

শ্রীমান সৌরীনের অধিনায়কত্বেই (?) বোধ হয় ভবানীপুর হইতে ঐরূপ 'অঙ্গুলি যন্ত্রে' মুদ্রিত 'তরুণী নামে মাসিক পত্রের সহিত 'ছায়ার' সম্পাদক দুই মাস অন্তর বদল হইত এবং তার প্রত্যেক সভ্য দুই মাস ধরিয়া 'ছায়া' সম্পাদন করিয়া নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতেন। 'তরুণী' কাগজখানিও প্রত্যেকের কাছে প্রেরিত হইত এবং তাহার লেখাগুলির সমালোচনা প্রত্যেকে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অনুসারে করিয়া সম্পাদকের নিকটে পাঠাইতেন। এইরূপ সমালোচনা শক্তির বিকাশ ও শরৎচন্দ্র সাহিত্য সঙ্গীগুলির মধ্যে আনিবার নানাবিধ পথ নির্দেশ করিতেন। শরৎদাদা কবিতা লিখিতে পারিতেন শুনিয়া-ছিলাম কিন্তু অমিত্রাক্ষরে ছোট্ট একটি 'গাথা ছাড়া আর কিছু কখনো দেখি নাই। সেটির নাম মনে নাই কিন্তু ছাড়া ছাড়া ভাবে কয়েকটি লাইন মাত্র তাহার মনে আছে। প্রথম লাইনটি—

"—ফুলবনে লেগেছে আগুন।" সুপ্রভা আর ইন্দিরা নামে দুইটি নায়িকার (নায়কের নাম মনে নাই) মনোভাব বিশ্লেষণ, পরে যথারীতি একজনের (সুপ্রভার) বিষপানে মৃত্যু এবং সেই পরাজয়েই জয়ের পতাকা উড্ডীন হওয়া ইত্যাদি—ইহাই 'গাথার' বিষয় হইলেও বর্ণনায় অনেকখানি ক্ষমতারই প্রকাশ ছিল।

এইরূপে তিনি সেই ক্ষুদ্র সাহিত্যসভার সভ্যগুলির আদি গুরুস্থানীয় ছিলেন। তবে আমার লেখা 'তারার কাহিনী', 'প্রায়শ্চিত্ত' ও এইরূপ ছোট ছোট গদ্যাকারে গল্প তাদের ছায়ায় প্রকাশিত হবেও গল্প লেখার ক্ষমতা অন্তত: আমার মধ্যে সে সময়ে আসে নাই। শ্রীমতী অনুরূপা এবং স্পর্শমণির লেখিকা সুরূপা দিদি (৺ইন্দিরাদেবী)-র উৎসাহেই আমি প্রথম একটা বড় গল্প লিখি। উচ্ছৃঙ্খল নামে বহু পরে সেটা প্রকাশিত হয়। শরৎদাদা বোধহয় তখন গোড্ডা নামক স্থানে চাকরি করতে গিয়েছিলেন, অথবা মজঃ-

ফরপুর আদি দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া সেই গল্প পাঠে তাহার মাথার উপরে লিখিয়া দেন "তুমি যে নিজের মত করিয়া অমুকে ফুটাইতে পারিয়াছ ইহাতে বড় সুখী হইলাম।"

ইহার পরেই বোধহয় 'দেবদাস' লেখা হয়। ঠিক মনে পড়ে না 'শুভদা' নামে একখানা খাতার অনেকখানি লেখা হলেও সেটি আর শেষ হয় না। আমরা যখন ভাগলপুর হইতে চিরদিনের মত চলিয়া আসি তখন বোধ হয় তিনি ভাগলপুরে ছিলেন না। ব্রহ্মদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

'মন্দির' গল্প লেখা আমরা দেখি নাই কিন্তু তিনি ব্রহ্মদেশে থাকাকালীন 'কুন্তলীন' পুরস্কার প্রতিযোগিতায় সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে উচ্চ গল্প পড়িয়াই তাহা যে শরৎদাদার লেখা —ইহা আমরা নিঃসংশয়ে বুঝতে পারি। পরে 'যমুনায়' তাঁহার পুরাতন ও নতুন লেখা নানা গল্প প্রকাশিত হইতে থাকে এবং ব্রহ্মদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পরে তিনি একবার আমাদের বাড়ীতে (বহরমপুরে) আসিয়া অনেকদিন অবস্থানও করিয়াছিলেন। একটি কথায় স্মরণে তঁাহার স্নেহের পরিচয় আজও মনে আসিতেছে; কথাটি নিতান্তই পারিবারিক কথা। ছোটদা তখন বি, এল, পাশ করিয়াছেন, কিন্তু ৺ পিতৃদেবের মৃত্যুর জন্য তাহাকে তাঁহার বড় সাধের এম. এ, পড়া ত্যাগ করিতে হইয়াছিল সেই কথা স্মরণ করিয়া তিনি প্রস্তাব করেন—ছোটদা কলিকাতায় গিয়া তাঁহার নিকটে থাকিয়া এম. এ. পড়িবেন। আমরা তাতে সম্মত না হওয়ায় তিনি ক্ষুন্ন হইলেন। এখান হইতে ফিরিয়া গিয়া তিনি 'চরিত্রহীন' লিখিতে আরম্ভ করেন এবং যমুনায় তাহা প্রকাশিত হইলে আমাদের কেমন লাগিতেছে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান।

শরৎ স্মৃতি

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

* * *

চকমকি পাথরের সুপ্ত বহ্নি থাকে। আর একটা চকমকির সংঘাতে ও সংঘর্ষে যেমন একটা ক্ষণিক আভা জাগে, তেমনি আমরা প্রতিদিনের জীবনে যাদের সংঘর্ষে আসি তারা আমাদের সুপ্ত চেতনার পাষাণ ঠুকে ঠুকে যেন নানা রঙ-বেরঙের ক্ষণপ্রভা উদ্দীপ্ত করে। সেই ক্ষণিক আলোকে আমরা পরস্পরের পরিচয় পাই। আমাদের ভাব চিন্তা সংস্কার শক্তি দুর্বলতা সব ধরা পড়ে সে বিচিত্র আভাসে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছিল, তাঁরা প্রত্যেকেই অল্পাধিক পরিমাণে তাঁর আত্মপ্রকাশের সহায়তা করেছেন নানা আলাপনের উদ্দীপনার ভিতর দিয়ে। তাঁর অমূল্য গ্রন্থাবলী রইল আগামী যুগের অধ্যয়ন আলোচনার জন্য। তাদের মূল্য নিরূপণ করতে হলে যে পরিস্থিতি প্রভাবে ও প্ররোচনায়; সুখ-দুঃখের বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার শরৎচন্দ্রের সহজাত প্রতিভা ও অনুকম্পা উৎসারিত হয়েছিল তাঁর অন্তঃসলিলার মুক্তধারায়, সেইসব অনুকূল প্রতিকূল ঘটনাবলী ও পাড়াপড়শীদের কাছ থেকে মথটমাশুল কতখানি তিনি আদায় করেছিলেন—তার একটা হদিশ পাওয়ার প্রয়োজন আছে। এইসব মালমসলা হবে তাঁর জীবন-সংহিতার ভাষ্য।

ভ্রমরের একটা নাম মধুকর, যেহেতু সে সৃষ্টি করে নানা পুষ্প-নির্যাসে স্বকীয় মধু। শরৎচন্দ্র গৌড়জনের জন্য যে মধুচক্র নির্ম্মাণ করে গিয়েছেন, সে মধু কোন মালঞ্চে কোন অরণ্য নিভৃতে সঞ্চিত হয়। তার সন্ধান লাভ করলে আমরা দেখতে পাব সমগ্র বাংলার

পল্লী-সহরে তার সুবিস্তীর্ণ পটভূমি।

আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে অব্যাহতগতি শুধু সাহিত্যিকের বৈজ্ঞানিক দার্শনিকের আমরা শ্রদ্ধা করি কিন্তু তাঁদের বুঝতে হলে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন, অর্বাচীনের কাছে তারা দুর্জ্ঞেয় পাণ্ডিত্যের একটা তকমা আছে। চাপরাশের কাছে সবাই প্রণত। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বড় ডিগ্রীই হোক বা অন্য কোনরূপ বৈদগ্ধ্যের উপাধিই হোক—নির্বিচারেই তা সাধারণের কাছে সম্ভ্রম আদায় করে। আমরা মেনেই নিই যে, লোকটা মার্কামারা—মেকি নয়। কিন্তু অধ্যাপক উকীল ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারের মত সাহিত্যিক উপাধিকারী নন। বাহিরের কম্বলের মধ্যে তাঁর আছে কেবল কালিকলম আর কাগজ আর আছে অন্তর্গূঢ় প্রতিভা। নিছক আত্মশক্তি ও অতন্দ্রিত সাধনের বলে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, ভুবনবিজয়ী হন। নদীর মতই আপনার খরধারার আবেগ পথ বেধে চলেন, কূলে কূলে অমৃতধারা বিতরণ ক'রে। তিনি স্বয়ম্ভু, আত্মস্রষ্টা, তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর স্বোপার্জিত সম্পত্তি।

যে পথ বিপদসঙ্কুল, সাধারণের অগম্য ও নিষিদ্ধ সেখানে তাঁর অপ্রতিহত গতি। প্রাণের স্থানে অস্থানে তাঁর জীবনতরীকে নিয়ে যায়। কত ঝড় ঝঞ্ঝা নৌকাডুবির দুর্বিপাক থেকে আত্মরক্ষা করে তিনি দুর্লভ পশরাটি পূর্ণ করে আনেন, আমরা নির্বিঘ্নে ঘরে বসে তাই আনুকূল্য ভোগ করি। প্রমিথিউস্ স্বর্গ থেকে অগ্নি অপহরণ করেছিলেন। পুরস্কারস্বরূপ গিরিগহ্বরে বন্দীদশা ও চিল শকুনের চঞ্চু প্রহরণ। কিন্তু তাঁর কল্যাণে ঘরে ঘরে জ্বলন্ত প্রদীপ, পাকশালার উনানে জ্বলন্ত রন্ধনের আগুন। ডুবুরি যদি প্রাণভয় বিসর্জন ক'রে অতলস্পর্শে ডুব না দিত, তবে সাগরের রত্নরাজিকে উদ্ধার করত কে?

শরৎচন্দ্রের অনুভূতি ও ভাবপ্রকাশ ছিল নিত্যযুক্ত তার রচনায়, বার্ণস রবীন্দ্রনাথের গানে যেমন কথা ও সুর যমজ হয়ে দেখা দিয়াছে। ব্যথার সঙ্গে অশ্রু, ক্ষতের সঙ্গে রক্তপাত, প্রেমের স্পর্শের

সঙ্গে পুলক যেমন চিরসম্পৃক্ত যে সত্য জীবনে পরিপাক লাভ করেছে-ধূমলেশহীন শিখার মতই তা জ্যোতির্ময়। আগুনটা ভাল ক'রে ধরেনি যে কাঠে, তাতে ফোটেনা ত বহ্নিদীপ্ত, কুণ্ডলি পাকিয়ে ওঠে কেবল ধূমজাল।

শিবপুর কলেজে যখন ছিলাম সশরীরে যখন দর্শন দিলেন তখন তার কল্পমূর্তিটা পেল তার বাস্তুভিটা আমার চোখে। ভক্তের সঙ্গে ভক্ত-বৎসলের প্রীতি স্বাভাবিক অল্পদিনের অন্তরঙ্গ পরিচয় হল। আমি আজন্ম সহরে বন্দী, আর পথের উদ্‌ভ্রান্ত পথিক; আমার পল্লীবুভুক্ষু মন তাঁর মুক্তাঙ্গণের খোলা হাওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে সময় ঘন ঘন আমাদের দেখাশুনা হত, আর বাধুত চিরচলিষ্ণু-জঙ্গমের সঙ্গে এই স্থাবরে মল্ল যুদ্ধ। স্বতঃস্ফূর্ত রেডিয়ামের কণা যেন অজস্র বর্ষিত হত আমার অন্ধকার মনের পর্দার উপর, স্ফুলিঙ্গে স্ফুলিঙ্গে জ্বলে উঠত জ্যোতিবিন্দুগুলি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলত কেবল গল্প আর তর্ক। তাঁর জ্ঞানবৃক্ষের ডালে ডালে ঝাঁকি দিয়ে সংগ্রহ করতাম পরিপক্ক অভিজ্ঞতার ফলসম্ভার পুঁথিগত বিদ্যালয়. পরের বুলি কপ-চানো নয় – তাজা প্রাণের বহু সুখ দুঃখ সঞ্চিত অম্ল কটু মধুর দ্রাক্ষা-গুচ্ছ প্রখর স্মৃতিশক্তি ছিল তাঁর। সিনেমার ফিল্মে আঁকা অফুরন্ত চিত্রাবলী নানা ঘটনার পরম্পরা দরদী হৃদয়ের স্নেহরসে অনুরঞ্জিত। স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত জীবনে যেমন বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গ, মুক্তগতির লীলা—তেমনি আবার বহু অনুশাসনে নিষ্পিষ্ট রুদ্ধশ্বাস প্রাণধারায় আছে প্রবল বিক্ষোভ ও বেদনা। স্বেচ্ছাবৃত দৈন্যদুর্গতিতে কত প্রাণ ঋদ্ধি ও মহত্ব পুঞ্জীভূত হয়ে আছে লোকচক্ষুর আড়ালে এই বাংলার অন্তঃ-পুরে এবং আস্তাকুড়ে তার ইঙ্গিত পেতাম শরৎচন্দ্রের সহৃদয় ঘোষণায় তাঁর যুক্তি বিচারের প্রতিষ্ঠা ছিল প্রত্যক্ষের মর্মস্থলে আর অটুট বিশ্বাস ছিল আপনার সূক্ষ্মদর্শী অনুভূতির উপর। হলে-যা-হতে পারত সেই সম্ভাব্যতাকে দেখে প্রেমিকের যে দৃষ্টি শরৎচন্দ্রের সেই দৃষ্টি ছিল। বেসুরো জীবনের অন্তর্গূঢ় সুরটী তার কানে বাজত। তাঁর প্রবীণ

হৃদয়ের সেই সহানুভূতি ও আশাশীলতা আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল। মানুষের ভাল এবং মন্দ দুইটি তিনি যথেষ্ট দেখেছিলেন, তাই খাঁটি আর মেকির পার্থক্যটা চমৎকার বুঝতেন। মতে আদর্শে দৃষ্টিকোণের সংস্থানে, জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে আমাদের বৈসাদৃশ্য ছিল যথেষ্ট, বাদানুবাদের অন্ত ছিল না, কিন্তু মনে পড়ে না কখনো সেজন্য কোনো মনোমালিন্য হয়েছিল আমাদের মধ্যে। তাঁর উদার প্রেমের হৃদয় সব ব্যবধান অতিক্রম করে হৃদয়ের কেন্দ্রটিতে মলিন সহজে উপনীত হত। ছোট ছোট দু-একটি কথায় ঝলমলিয়ে উঠত অভিজ্ঞ জীবনের দামিনী দীপ্তি।

বাংলার সাহিত্যে শরৎচন্দ্র

মহম্মদ শওকত আলি

বাংলা সাহিত্যের কমল বনে শরৎচন্দ্র একটি বিস্ময়কর নাম। শরৎ ও তাঁর সাহিত্য চিরদিন অমর হয়ে বিরাজ করবে মানুষের মনে।

শরৎচন্দ্র ছিলেন জীবন শিল্পী। আশ্চর্য তাঁর সেই শিল্প সৃষ্টি। বহুবার ঘরোয়া আর পল্লী জীবনে জনচিত্তের হৃদয়কে তিনি আশ্চর্য-ভাবে দেখেছেন। তাঁর এ দেখার পিছনে রয়েছে সত্য আর সুন্দরের আরাধনা।

শরৎচন্দ্রকে জানতে হলে, তাঁকে চিনতে হলে সর্বাগ্রে তাঁর চর্চা করা দরকার।

বিস্ময়ের সংজ্ঞার তীরে দাঁড়িয়ে আমরা যেমন সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হই, কিন্তু বর্ণনা করতে গেলে ভাষা খুঁজে পাইনে। ঠিক তাঁর সাহিত্য আমাদের কাছে এক আশ্চর্য জীবন্ত।

শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন অগণিত উপন্যাস, ছোট গল্প, ইত্যাদি। তাঁর প্রতিটি সৃষ্ট চরিত্রে বাংলার জনচিত্তের মনের মান বোধ হয় এক আশ্চর্যভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

শ্রীকান্তের ভবঘুরে জীবন, রাজলক্ষ্মীর নিষ্ঠা, চরিত্রহীনে সতীশ সাবিত্রীর মনোযন্ত্রনা, বড়দিদিতে মাধবী আর সুরেন্দ্রনাথ, গৃহদাহের অচলা আর মহিম, পল্লী সমাজের রমেশ রমা, দেবদাস-এ পার্বতী ইত্যাদি যেন আমাদের মনের ছবি। কাশীনাথ, বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, ছবি, দত্তা, নববিধান ইত্যাদি কালজয়ী গ্রন্থ চির উজ্জ্বল।

শরৎচন্দ্র সাহিত্যের ছোট গল্পে 'মহেশ' আর 'অভাগীর স্বর্গ'

পৃথিবীর ছোট সাহিত্যে তুলনা বিহীন।

শরৎচন্দ্র এই বাংলার প্রকৃতি আর মানুষকে চিনেছিলেন। তাদের আপন করে নিয়েছিলেন বলেই আজ তিনি অমর। শরৎ-সাহিত্যের সবচেয়ে বড় গৌরব সহজ ও সরল সুন্দর বাস্তব জীবনের নিখুঁত ছবি।

তাঁর মহাপ্রয়াণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,

"যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।"

আজ উত্তর বাংলার মানুষের মর্মে একই প্রতিধ্বনি : শরৎচন্দ্র আমাদের বাংলার গৌরব।

প্রথম পরিচয়

হেমেন্দ্রকুমার রায়

একদিন বৈকাল-বেলায় 'যমুনা' অপিসে একলা বসে বসে রচনা নির্বাচন করছি, এমন সময় একটি লোকের আবির্ভাব। দেহ রোগা ও নাতিদীর্ঘ, শ্যামবর্ণ, উস্কো-খুস্কো চুল, একমুখ দাড়ি-গোঁফ। পরনে আধ ময়লা জামা কাপড়, পায়ে চটি জুতো সঙ্গে একটি বাচ্চা লেড়ী কুকুর।

লেখা থেকে মুখ তুলে শুধোলুম, 'কাকে দরকার?'

—'যমুনার সম্পাদক ফণীবাবুকে।'

—'ফণীবাবু এখনো আসেননি।'

—'আচ্ছা, তাহলে আমি একটু বসবো কি?

চেহারা দেখে মনে হলো লোকটি উল্লেখযোগ্য নয়। আগন্তুককে দূরের বেঞ্চি দেখিয়ে দিয়ে আবার নিজের কাজে মনোনিবেশ করলুম।

প্রায় আধঘণ্টা পরে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পালের প্রবেশ। তিনি ঘরে ঢুকে আগন্তুককে দেখেই সসম্ভ্রমে ও সচকিত কণ্ঠে বললেন, এই যে শরৎবাবু। কলকাতায় এলেন কবে? ঐ বেঞ্চিতে বসে আছেন কেন?

আগন্তুক মুখ টিপে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'ওঁর হুকুমেই এখানে বসে আছি।'

ফণীবাবু আমার দিকে ফিরে বললেন, 'সে কি! হেমেন্দ্রবাবু, আপনি কি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে চিনতে পারেন নি?'

অত্যন্ত অপ্রতিভভাবে স্বীকার করলুম, 'আমি ভেবেছিলুম উনি দপ্তরী।'

শরৎবাবু সকৌতুকে হেসে উঠলেন।

এই হলো কথা সাহিত্যের ঐন্দ্রজালিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়।

উপরি-উক্ত ঘটনার সময়ে শরৎচন্দ্রের নাম জনসাধারণের মধ্যে বিখ্যাত না হলেও, যমুনায় 'রামের সুমতি', 'পথনির্দেশ' ও 'বিন্দুর ছেলে' প্রভৃতি গল্প লিখে তিনি প্রত্যেক সাহিত্য-সেবকেরই সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এর বছর কয়েক আগে ভারতীতে তাঁর অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস 'চরিত্রহীনের' পাণ্ডুলিপি তখন অশ্লীলতার অপরাধে বাংলাদেশের কোন এক বিখ্যাত মাসিক পত্রের অফিস থেকে বাতিল হয়ে ফিরে এসে যমুনায় দেখা দিতে শুরু করেছে এবং তার প্রথমাংশ পাঠ করে আমাদের মধ্যে জেগে উঠেছে বিপুল আগ্রহ। তাঁর 'চন্দ্রনাথ' ও নারীর মূল্যও তখন যমুনায় সবে সমাপ্ত হয়েছে। তবে তখনো শরৎচন্দ্রের পরিচয় দেবার মতো আর বেশী কিছু ছিল না। রেঙুনে সরকারী অপিসে নব্বই কি একশো টাকা মাহিনায় অস্থায়ী কাজ করতেন। অ্যাকাউটেণ্ট্‌সিপ্‌ একজামিনে পাশ করতে পারেন নি বলে তাঁর চাকরি পাকা হয়নি। শুনেছি বর্মায় গিয়ে তিনি উকিল হবারও চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বর্মী ভাষায় অজ্ঞতার দরুণ ওকালতী পরীক্ষাতেও বিফল হয়েছিলেন। এক হিসাবে জীবিকার ক্ষেত্রে এই অক্ষমতা তাঁর পক্ষে শাপে বর হয়েই দাঁড়িয়েছিল। কারণ সরকারী কাজে পাকা উকিল হলে তিনি হয়তো আর পুরোপুরি সাহিত্যিক জীবন গ্রহণ করতেন না।

শরৎচন্দ্র প্রত্যহ যমুনা-অপিসে আসতে লাগলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই আমি তাঁর অপকট বন্ধুত্ব লাভ করে ধন্য হলুম। তাঁর সঙ্গে আমার বয়সের পার্থক্য ছিলো যথেষ্ট কিন্তু সে পার্থক্য আমাদের বন্ধুত্বের অন্তরায় হয়নি।···

স্মরণ-স্মৃতি-ছবি

—গিরিজাকুমার বসু

পরদিন সকালে শরৎদা স-গড়্‌গড়া আমাকে খুব সকালে এসে ডাকতে লাগলেন, আমি দোতলা থেকেই বললুম, 'এত ব্যস্ততা কিসের?' বললেন, 'নেমে এসো বলছি।' গেঞ্জিটা গায়ে দিয়েই নীচে এসে তাঁর সঙ্গে চললুম তাঁর বাড়ীতে। পথে যেতে যেতে বললেন, 'কবিতা লিখেছি।' বললুম, 'এমন দুঃসাহস কেন করলেন? যাই হোক পরেই দেখতুম।' উত্তর হোলো, 'কবিতা লিখেছি কিন্তু মেলাতে পারিনি তাই তোমাকে দরকার।'

এই রকম কৌতুক করেই তিনি কথা কইতেন মনের সারল্যে, খোলা প্রাণে। কবিদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। কবিতা তিনি খুব পড়তেন, তবে রবীন্দ্রনাথের এবং আরও দু-তিনজনের। নাম করবার বাধা আছে। বলতেন, 'দ্যাখো যারা মিল করতে পারে তাদের প্রতি আমার ভারী শ্রদ্ধা, কেননা ঐ মিল করার ব্যাপারটা বড় শক্ত হে।' একবার খুরুটের এক ছাত্র-ছাত্রীদের আবৃত্তি প্রতি-যোগিতায় শরৎদা সভানেতৃত্ব করতে যান। আমরাও কজন তাঁর তাঁর সঙ্গে যাই। প্রতিযোগিতার বিচার করবার ভার পড়ল শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী, শ্রীযুক্তা তমাললতা বসু, শ্রীযুক্তা পুষ্পমালা দেবী, শ্রীযুক্ত নরেন দেব ও আমার উপর। পুষ্পমালা আমার সঙ্গে অনেক-ক্ষণ কথা কইতে শরৎদা লোকর্ণ সভার মাঝখানেই তাঁকে বললেন, 'পুদ আমাদেরও একটু ভালবাসা উচিত।' আমি জোর করে বলতে পারি কোনো জনবহুল সভায় উচৈস্বরে প্রকাশ্যে এমন কথা আর কেউ বলতে পারতেন না; কারণ এতে হৃদয়ের যে নির্মল সরলতা ও উদার

মাধুর্য্য সূচিত হচ্ছে, তা জগতে দুর্লভ। আর অন্তরের এই সরলতা ও মাধুর্যের গুণেই সকল মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হত। কোন মাসিক পত্রের তাগিদে একদিন বসে গল্প লিখেছিলুম হঠাৎ শরৎদা এসেই প্রশ্ন করলেন 'কি লিখছ?' বললুম, 'এক গল্প।' তক্ষুনি প্রত্যুত্তরে বললেন, 'তোমরা গল্প লিখবে কেন?' আমি ফিরে তার যে কি উত্তর দিয়েছি তা অপ্রকাশিত রইলো। কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'তোমার গল্পের ভাষা যে ভালো হবে, তা আমি জানি এবং আমার দিক থেকে এই মন্তব্যের কোন কারণ জিজ্ঞাসা না হতেই নিজে আবার বললেন, আমি দেখেছি কবিদের গদ্যের ভাষা হয় খুব চমৎকার।' বাংলার কবিরা এতে গর্ববোধ করতে পারেন। কবিদের সম্বন্ধে এমন বড়ো ধারণা ছিল তাঁর।

রচনা সম্বন্ধে তাঁর কি আলস্য ছিল তা অনেক সভাসমিতির জলধরদার মুখে সকলেই শুনেছেন। তারকেশ্বরে হত্যা দেবার মতো করে জলধরদা শয্যা নিতেন শরৎদার শিবপুরের বাড়ীর বৈঠকখানার ঘরে লেখা আদায় করবার জন্যে। সে ব্যাপার বহুদিন আমার চোখের সামনে আর আমার উপস্থিতিতেই ঘটেছে। সবদিন কিন্তু জলধরদার সাধ্যসাধনা সফল হ'ত, তা নয়। 'গৃহদাহের' শেষ কিস্তির পাণ্ডুলিপি আমিই পৌঁছে দিই 'ভারতবর্ষ' কার্যালয়ে। জলধরদা শিবপুরে গিয়েছিলেন তা আদায় করতে কিন্তু আমাকে দিয়ে কপি পাঠিয়ে দেবেন তাঁকে এই কথা দেন, লেখা নয়। সে কথা তিনি রেখেছিলেন।

কাশীনাথ প্রসঙ্গে

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

সবেমাত্র আমাদের সাহিত্য-সাধনা সুরু হইয়াছে—সন তের শত উনিশ সালের মাঘ মাসে স্বর্গত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' 'বাল্যস্মৃতি' নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয় ; লেখক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পল্লীগ্রামের এক গরীব বামুন কলিকাতায় কোন 'মেসে' ঠাকুরের কাজ করিত, তাহাকে লইয়া গল্প। পাড়া-গাঁয়ের লোককে লইয়া গল্প, গল্পটি আমাদের ভাল লাগিল। ইহার পূর্বে আমরা শরৎচন্দ্রের নাম শুনি নাই। তাঁহার কোন লেখা পড়ি নাই। পরের দুই মাসে ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যার সাহিত্য শরৎচন্দ্রের 'কাশীনাথ আমাদিগকে মুগ্ধ করিল। কাশীনাথ পড়িলাম, পড়া বন্ধ করিয়া কাঁদিলাম।

কাশীনাথ পড়িয়া মুগ্ধ হইলাম, কিন্তু কাশীনাথ যে খুন হইল, কমলা যে আত্মহত্যা করিল, ইহা আমাদিগকে ব্যথিত করিল। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। মনে হইল সব কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিব, ভিতরের খবরটা জানিয়া লইব। সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম।

ভগবৎ কৃপায় একদিন সুযোগ মিলিল। কলিকাতায় আসিয়া ভারতবর্ষ সম্পাদক জলধরদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম ; প্রথম সাক্ষাতেই তাঁহার স্নেহলাভে ধন্য হইলাম। অতঃপর একদিন ভারতবর্ষ কার্যালয়ে ২০১ নং কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীটের দ্বিতলের একটি ঘরে শরৎচন্দ্রের দর্শনলাভ করিলাম।

সেদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। শরৎচন্দ্র বসিয়া

সিগারেট খাইতেছিলেন, দাদা পরিচয় করাইয়া দিলেন, আমি প্রণাম করিলাম। তিনি 'হয়েচে হয়েচে বলিয়া বলিয়া ব্যস্ত হইয়া প্রতি-নমস্কার করিলেন। আমি বীরভূমের লোক জানিয়া তিনি বলিলেন —'আমি বীরভূমের খানিকটা দেখে এসেচি, কিন্তু নানুর আর কেন্দুলি দেখা হয় নাই, একবার দেখে আসতে হবে।' আমি উৎ-সাহিত হইয়া হেতমপুর রাজবাড়ীর নামে নিমন্ত্রণও করিলাম এবং বীরভূমের কোথায় কোথায় গিয়াছেন জানিতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন—'যদি কখনো বীরভূমে যাই আপনাকে খবর দেবো। আমি ট্রেনে সাঁইথিয়া বোলপুরের পথে কতবার যাতায়াত করেচি। একবার সাঁইথিয়ায় নেমে দিন দুই ঘুরে ঐ অঞ্চলটা দেখে গিয়েছিলাম। আর একবার ছোটখাটো একটা দলের সঙ্গে বক্রেশ্বর দেখে এসে-ছিলাম। আমি কিছুদিন বনেলী ষ্টেটে কাজ করি। সাঁওতাল পরগণায় তখন সেটেলমেণ্টের কাজ চলছে। ষ্টেটের তরফ থেকে একজন বড় কর্মচারী সেই কাজে ষ্টেটের স্বার্থ দেখবার জন্য নিযুক্ত হন, তাঁর সহকারীদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। ডাণ্ডার মাঝে তাঁবুতে থাকতে হতো। কখনো কখনো রাজকুমার সেখানে আসতেন। সেটেলমেণ্টের বড় বড় অফিসারদের তাঁবুতে নেমতন্ন করে নাচগানের মজলিস দিতেন সেই সময় আমার বড় ভাল লেগেছিল। শিবের মন্দিরের দিকটাও নির্জন।"

প্রথম পরিচয়ের দিনেই এইরূপ প্রাণখোলা আলাপে অত্যন্ত আনন্দ হইল।

মনে পড়ে

বিভুতি ভূষণ ভট্ট

মনে পড়ে একদিন আমাদের সেই খোলাঘরের সাহিত্যসভায় যুবক শরৎচন্দ্রের একটা রচনা লইয়া ঘোর তর্ক করিতে করিতে প্রায় হাতাহাতির যোগাড় হইয়া উঠিয়াছিল। আমি গায়ের জোরে সবারই চাইতে দুর্বল হইলেও গলার জোরে কাহারও চাইতে কম ছিলাম না। হয়ত কিছু বেশীই ছিলাম, তাই আমার সেই 'এতটুক যন্ত্র' হইতে একটু বেশী শব্দই বাহির হইয়াছিল এবং আমি লাফাইয়া উঠিয়া বলিয়াছিলাম—বঙ্কিমের চাইতে শরৎদার লেখা ভালো। অবশ্য সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র একজন অখ্যাত তরুণ সাহিত্যিকের লেখা লইয়া আর একটি তরুণ যুবকের এই ধৃষ্টতায় সে দিন তাঁহার মহিমালোকে বসিয়া নিশ্চয়ই সস্নেহ উপেক্ষায় হাসিয়াছিলেন। কিন্তু তারপর যখন আমার পরিণত জীবনেই দেখলাম যে সেই শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সাধনার মূল্য নিরূপণ উপলক্ষে একটা সাহিত্যিক লাঠা-লাঠির সূচনা হইয়াছে এবং এমনকি বর্তমান সাহিত্য সম্রাটও সেই তর্ক ধূলার মধ্যে তাঁহার ঋষিকল্প মুখখানি লইয়া উঁকি ঝুঁকি মারিতেছেন তখন আমিও হাসিয়া লইয়াছি।

কিন্তু মৃত্যুর পর শোক প্রকাশের মধ্যে যে একটা কৃত্রিমতা আছে তাহাই আমায় বাধা দিতেছে। কারণ কথায় বলে—

"থাকতে দিলে না ভাত কাপড়,

মরণে করবে দান সাগর!"

এই 'দান সাগর' অনেকেই করিয়াছেন এবং তাহা বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে অনেক উচ্চ স্থানও পাইয়াছে। তবু সে সমস্তই মরার পর

খান সাগরের মতই একান্ত নিষ্ফল—তা সে Tennyson-এর In memorioum-ই হউক, আর Shelly-র Adonais-ই হউক কারণ সেই সমস্ত জীবন-কথার মধ্যে প্রাণটাই থাকে না—থাকে কথার জাল বোনা, থাকে অধরাকে ধরিবার বৃথা চেষ্টা।

আমার পূর্ব জীবনের শরৎদার কথা বলিতে যাওয়া মানে—আমার জীবনের যাহা সর্বাপেক্ষা প্রাণময় অংশ তাহাকেই স্মরণ করা। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে পারে? প্রাণ জিনিসটার সংজ্ঞা নাই কারণ তাহার মত আর কিছুই নাই—সে একেবারে 'কেবল' মূর্তি। তাহার অংশ নাই, —তুল্য নাই. তাহা ক্ষণাবলম্বী অনুভব ধারা ছাড়া অন্য কোনরূপে প্রত্যক্ষ করা যায় না। এমন কি জীবনকে স্মরণ করা যায় কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। ঘটনা স্মরণ হইতে পারে, জীবন নয়। প্রাণহীন ঘটনার প্রয়োজন ইতিহাসে থাকিতে পারে; কিন্তু আজ যাহা সত্যকারের সুখ-দুঃখানুভূতি—তাহাতে তাহার স্থান কোথায়। আজ যে ক্রন্দনে বাংলার সাহিত্যাকাশ পূর্ণ তাহার মধ্যে সেই জীর্ণ পুরাতনের স্থান কোথায়? তাই আজ যখন আমার প্রথম যৌবনের কথা স্মরণ করিয়া লিখিবার আহ্বান আসিল তখন আমি চমকিত হইয়া ভাবিলাম—সেই পুরাতন জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চাপা পড়া স্মৃতিখানি আবার কি করিয়া খনন করিব? পারিব কি?—পারিব না। যাহাকে ফুরাইতে দিয়াছি তাহা কি শেষ হয় নাই। সেই Myrtle and ivy-র সত্যকারের Sweet two twenty-র দিনগুলি চলিয়া গিয়াছে—আছে শুধু একটা হায় হায় মাত্র। অন্ধকার বাঙ্গলাব্যাপী হাহাকারের মধ্যে সেই ব্যক্তিগত জীবনের হাহাকারে স্থান নাই - নিশ্চয়ই নাই।

শরৎচন্দ্রকে প্রথম যখন দেখি তখন তিনি ভাগলপুর তেজনারায়ন জুবিলি কলেজে পড়েন। আমার সঙ্গে সহপাঠী রূপে দেখা হয় নাই —দেখা হয়েছিল শাস্তা—আদেশদাতারূপে। আমি তখন স্কুলের

ছাত্র এবং মাষ্টার পণ্ডিতদের বিশেষতঃ দাদাদের গম্ভীর তত্ত্বাবধানের মধ্যে শাসিত ও পালিত। কিন্তু স্কুলের ছাত্র হইলে কি হয়, কবিতা দেবীর সুড়সুড়ি বা কাতু-কুতু ছোট বয়স হইতে নিশ্চয়ই মানুষ করে। আমি এবং আমার ভগ্নী নিরুপমা উভয়েই তাহা অনুভব করিয়াছিলাম—বিশেষতঃ আমার ভগ্নী তখন আমাদের বাড়ীর সমাজদারদের মধ্যে বেশ একটু খ্যাতিই অর্জন করিয়াছিলেন। আমার তখন বাড়ীর সাহিত্যিক মহলে কোন খ্যাতিই হয় নাই, কেবল লুকাইয়া লুকাইয়া ইংরাজী কবিতার অনুবাদ অথবা বাঙ্গলা কবিতার পুনরনুবাদ করিতাম। রবীন্দ্রনাথের তখন আমাদের বাড়ীতে প্রসার প্রতিপত্তি হয় নাই। তখনও তাঁহার পূর্ববর্তী কবিবর্তী কবি এবং লেখকদিগের প্রবল প্রভাব। আমরা দুইটি ভাই-ভগ্নী প্রাক্‌রবীন্দ্র-কবিগণের লেখার ভাঙাচোরাই হউক আর অনুকরণই হউক—একটা কিছু করতাম। দাদারা বা মাষ্টার মহাশয়রা কখনো ভালবাসতেন, কখনো বা হাসি বিদ্রূপে বিব্রত করতেন,কিন্তু তথাপি গোপনে গোপনে আমাদের কবিতার খাতা ভরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কেমন করিয়া জানি না সেইসব লেখা বিশেষতঃ নিরুপমার খ্যাতনামা শরৎচন্দ্রের হাতে গিয়া পড়িয়াছিল। দাদাদের মধ্যে কেহ হয়ত তাহা শরৎদার হাতে দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র তখন তাঁহার সমবয়স্কের মধ্যে একজন উচ্চ জগতের জীবরূপে এবং অদ্ভুত "ল্যাড়া" নামে অভিহিত। উপরন্তু তাঁহার তৎকালীন স্বাক্ষরিত নাম Lt. Clate Lara। জানি না, তখন তিনি কবি Byron-এর Lara কবিতা পড়িয়াছিলেন কিনা, কিন্তু বায়রনের ধরণটি যে পরে তাঁহাকে পাইয়া বসিবে ইহা বোধ হয় তাহারাই পূর্বাভাসরূপে তাঁহার নাম সহিটির মধ্যেও প্রকটিত হইয়াছিল। আমরা ছোটরা তখন ঐ অদ্ভুত মানুষটিকে দূর হইতে সসম্ভ্রমে দাদাদের পড়িবার ঘরে আসা যাওয়া করিতে বা দাবা পাশা খেলিতে দেখিতাম মাত্র।

কিন্তু এ হেন শরৎচন্দ্র—সেই Lara—একদিন হঠাৎ আমার ছোট্ট কুঠরীর মধ্যস্থিত অতি ক্ষুদ্র টেবিলটির পার্শ্বে আসিয়া হাজির! আমি ভয়ে ভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলাম—তিনি আমার কবিতার খ্যাতনামা টেবিলের উপর সজোরে ফেলিয়া বলিলেন—"কি ছাই দেখো, খালি অনুবাদ—তাও আবার ভুলে ভরা। নিজের কিছু নেই তোমার লিখবার।"

আমি ত শুনিয়াই পৌনে মরা। কিন্তু কখন যে আমাদের আলাপ জমিয়া উঠিল এবং কবে যে তাঁহার খোলার ঘরের বই খাতাপত্র ভরা টেবিলের পাশে বসিবার অধিকার পাইলাম তাহা আজ স্মরণ হয় না; কেবল এইটুকু মনে আছে যে, তাঁহার সেই প্রথম জীবনের সাহিত্য সাধনার কুটীরের মধ্যে অতি সহজেই আমার স্থান হইয়াছিল। দিনের পর দিন তাঁহারই সাহচর্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য কাননে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইলাম।

শরৎচন্দ্র

—মনোজিৎ বসু

দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র।

সমাজে যারা অবহেলিত নিপীড়িত সেই সব নরনারীর ব্যথা-বেদনাকে হৃদয়ের দরদে আপনার ক'রে নিয়ে তিনি যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, তা অতি গভীরভাবে পাঠক চিত্তকে অভিভূত করেছে। মানুষের দুঃখে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত বিচলিত হলেন। মানুষের প্রতি তাই তার ছিল আন্তরিক গভীর সহানুভূতি। শরৎচন্দ্রের এই সহানুভূতি শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মূক পশু-পক্ষীর প্রতিও তিনি ছিলেন সমান দরদী।

একটা গল্প বলি,

শরৎচন্দ্র তখন রেঙ্গুনে চাকরি করেন। একদিন রাত্রে কি করে হঠাৎ তাঁর বাসায় আগুন লাগে। তিনি যে বাড়িটায় থাকতেন, তার এক পাশে ধোপার ঘর ছিল। আগুনটা প্রথমে সেই ঘরে লাগে। শরৎচন্দ্র তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছেন।

হঠাৎ প্রতিবেশীদের চীৎকার আর কলরবে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। আগুন তখন নীচে থেকে ক্রমশই ওপর দিকে উঠতে থাকে। রেঙ্গুনে সব কাঠের বাড়ি। কাজেই আগুন খুব তাড়াতাড়ি ধরেছিল।

শরৎচন্দ্র তখন তাড়াতাড়ি বাসার মেয়েদের ও পোষা পাখিগুলিকে নিরাপদে পাঠিয়ে ছুটলেন তাঁর আলমারির বইগুলিকে বাঁচাতে। ঐ বইগুলি তাঁর কাছে ছিল প্রাণের চেয়েও বেশী।

আগুনের শিখা উঠে আসছে যেন বিদ্যুৎ-গতিতে। সময় বেশী নেই। তবু তার মধ্যেই তিনি দুর্লভ, মূল্যবান ও একান্ত প্রয়োজনীয়

খানকতক বই বেছে নিয়ে একটা ট্রাঙ্ক খালি ক'রে তার মধ্যে পুরে নিলেন। তারপর, কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তিনি যখন সেই ট্রাঙ্ক নিয়ে নীচে নেমে আসবেন তখন দেখেন, সিঁড়িতেও আগুন ধরে গেছে। আর নামবার কোন পথ নেই।

শরৎচন্দ্র তখন উপায়ান্তর না দেখে বোঝাই ট্রাঙ্কটা ওপর থেকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর জ্বলন্ত সিঁড়ির অক্ষত অংশের ধার ঘেঁসে আগুনের হলকা বাঁচিয়ে কোন রকমে লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন নীচে। এতক্ষণ যারা উৎকণ্ঠিত হয়ে নীচে অপেক্ষা করছিল তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

কিন্তু পরমুহূর্তেই আর একটি কাণ্ড ঘটলো। শরৎচন্দ্র নেমে এসে শুনলেন যে নীচের ঘরের ধোপাটি তার গাধাটিকে নিয়ে এসেছে বটে কিন্তু তাড়াতাড়ি তার পোষা ছাগলটিকে আনতে পারেনি।

শোনা মাত্রই শরৎচন্দ্র তার নিজের জীবন বিপন্ন করে ছুটলেন ধোপার সেই জ্বলন্ত ঘরে। কারও নিষেধ বারণ মানলেন না। সেই অসহায় ছাগ-শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে চলেন এলেন ঘরের বাইরে। পর মুহূর্তেই জ্বলন্ত ঘরখানি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো।

আর একটু দেরী হ'লে—হয়তো সেদিন আমাদের শরৎচন্দ্রকে হারাতে হতো।

শরৎ প্রসঙ্গ

—জলধর সেন

শরৎ তখন শিবপুরে বাস করতেন। একদিন প্রাতঃকালে আমি শিবপুরে শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়েছিলুম।

সে দিন রবিবার।

আমি প্রায় প্রতি রবিবারই শরতের বাসায় যেতাম।...

সারাদিন সেখানে কাটিয়ে রাত্ত আটটা-ন'টায় কলিকাতায় ফিরে আসতাম।

সেখানে প্রাতঃকালে গিয়ে দেখি, ঘরের মধ্যে একরাশি ছোট বড় কলের ধুতি শাড়ী ছড়ানো রয়েছে।

শরৎচন্দ্রের ভৃত্য সেগুলি গুছিয়ে বাঁধবার আয়োজন করছে।

শরৎ একখানি চেয়ারে বসে সুমুখের টেবিলে আনি-দুয়ানি সিকি গুণে গুণে গোছাচ্ছেন।

আমাকে দেখেই বললেন, দাদা, এই আমি দশটার গাড়ীতে দিদির বাড়ী যাব। তা হলে আপনি চলে যাবেন না। যাবেন সেই রাত্ত দশটায়।

আমি বললাম,—দিদির বুঝি কোন ব্রত প্রতিষ্ঠা আছে? তাই এত কাপড় চোপড় নিয়ে যাচ্ছ, আর কাঙ্গালী বিদায়ের জন্য ঐ আনি-দুয়ানি?

শরৎ আমার দিকে চেয়ে বললেন, না, দাদা? দিদির ব্রত প্রতিষ্ঠা নয়।

এই বলেই সে চুপ করল, আসল কথাটা গোপন করাটাই তার ইচ্ছা...

আমি বললাম—ব্রত প্রতিষ্ঠা নয়, তবে এত নতুন কাপড়ই বা নিয়ে যাচ্ছ কেন?

শরৎ অতি মলিন মুখে বললেন, দাদা, দিদির গাঁয়ের আর তার চারপাশের গাঁয়ের গরীব দুঃখীদের যে কি দুর্দশা। তাদের পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই, চালে খড় নেই। সে যে কি!...

শরৎ আর বলতে পারলো না, তার দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

এই আমার শরৎচন্দ্র।

এই শরৎচন্দ্রকে আমি ভালবাসি। ভক্তি করি।

এই শরৎচন্দ্রকে আজ আমি বন্দনা করছি ..

শরৎ স্মৃতির চাপ

—দিলদার

কথাশিল্পীকে সাহিত্যিকদের স্মৃতি সে তো এক আশ্চর্য মনিকাঞ্চন যোগাযোগ। আমি, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যাঁদের নিবিড় যোগাযোগ ছিল তাঁদের কয়েকজনের ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি।

শরৎচন্দ্রের মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর শরৎচন্দ্রের উপন্যাস লিখন পদ্ধতি প্রসঙ্গে উল্লেখ করে বলেন: শরৎ হাসিয়া বলিলেন তুমি নাকি পিছন দিক দিয়ে চরিত্রহীন লিখেছ ?

—তুমি কি বললে ?

বললুম, তাই কি হয় ? তবে শেষের দু'চার পৃষ্ঠা হয়ত আগেই লিখে ফেলেছিলুম। তিনি তো সেই কথা শুনে অবাক, বললেন, বল কি শরৎ ?

—বললাম, ঠিক করে বলতো ব্যাপার কি ?

চরিত্র অবলম্বন করে লিখতে আরম্ভ করে ওলট পালট খুবই করা চলে। তা ছাড়া এই লেখার বিষয়ে আমার মেমরি বড় স্টং··· নিজের লেখা সম্বন্ধে আমি খাতার পর খাতা ভেবে রাখতে পারি, সেগুলো লেখার সময় আসতে থাকে, হারিয়ে যায় না।

১৩৫৬ সালের 'মাসিক পত্রে' হারেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "শরৎ-চন্দ্রের রসালাপ" নিয়ে একটি আলোচনা করেছিলেন, তিনি বললেন: বৈঠক খানায় ইজি চেয়ারে শুয়ে তামাক খাচ্ছিলেন, গিয়ে প্রণাম করতেই বললেন—এসো, কাল রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলুম।

অত্যন্ত কৌতুহলী হয়ে উঠলুম, কবির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের

বিষয় শোনবার জন্যে। শরৎবাবু চাকরের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন এবং চাকর আসতে বললেন—যা হীরেনের চা করতে বল। আমার জন্যেও একটুখানি করতে বলবি।

চাকর চলে যেতে সে কৌতুকে বললেন, বাড়িতে এক কাপের কাপের বেশী চা খেতে চাইলে দেয় না। তোমরা এলে এমনি করে চা আদায় করি বলে তিনি সম্পূর্ণ অন্য গল্প জুড়ে দিলেন।…

শরৎবাবুর একটা জিনিস প্রায়ই চোখে পড়ত কোন একটা অভি-চিত্তাকর্ষ কাহিনীর অবতারণা করে শ্রোতাদের কৌতুহলী করে তিনি সে প্রসঙ্গ ত্যাগ করতেন, চলে যেতেন অন্য প্রসঙ্গে। আমিও নাছোড়বান্দা। অবশেষে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে এসে বললেন যে কবি চন্দননগরের গঙ্গার ওপর বোসে আছেন। হরেন ঘোষ কাল তাঁকে এসে নিয়ে যায় কবির কাছে।

শরৎবাবু বললেন—কবির কাছে ঘণ্টা দুই ছিলাম। কবি ঠিক আধ ঘণ্টা অন্তর চা, খাবার এটা-ওটা ছুতো করে তাঁর সামনে থেকে আমাকে সরিয়ে অনিলচন্দ্রের ঘরে চালান দিচ্ছিলেন। কবি তো শুনেছেন আমার কি রকম শট্‌কা চলে।

শরৎচন্দ্র অত্যন্ত ধূমপায়ী ছিলেন এবং ঘন ঘন ধূমপান করতেন। রবীন্দ্রনাথ এ কথা জানতেন।

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁর সামনে ধূমপান করতেন না। তাই রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের ধূমপানের সুযোগের জন্যই আধঘণ্টা অন্তর চা, খাবার, এটা-ওটা ছুতো করে তাঁর সেক্রে-টারীর ঘরে শরৎচন্দ্রকে চালান করে দিয়েছিলেন।"

কথা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের অন্যতম একজন অনুরক্ত বললেন, শরৎদা কবির অভিযোগগুলি দেখছেন তো? মনে হয় কবি আপনাকে এড়িয়ে ঐ অভিযোগ উত্থাপন করেছেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ নিয়ে 'শরৎচন্দ্রের পরিহাস' নামক একটি আলোচনায়

লেখেন :—

"... রবীন্দ্রনাথ আমার কী ক্ষতি করবেন শুনি? আমি তাঁর যা ক্ষতি করে দিয়েছি, তার তুলনায় ও কিছু নয়।"

শরৎচন্দ্রের এই কথায় উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হলেন।

একজন বললেন, শরৎদা আপনি গুরুদেবের ক্ষতি করেছেন?

—হ্যাঁ করেছি তো।

—কী ক্ষতি করেছেন শুনি?

—সে আর শুনে তোমরা কী করবে?

—তবু শুনিই না।

সকলেই শুনবার জন্য পীড়াপিড় করতে লাগলেন।

তখন শরৎচন্দ্র বললেন, ক্ষতি কি করেছি শুনবে? রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গিরিজা বোসের আলাপ করিয়ে দিয়েছি।

—তাতে আর রবীন্দ্রনাথের ক্ষতি হবে কেন?

—হবে না? তোমরা কি তার বুঝবে? যার ক্ষতি করে দিয়েছি তিনিই টের পারেন।

এরপর শরৎচন্দ্র আরও গম্ভীর হয়ে বললেন,—জানো তো গিরিজা কি রকম গল্পের লোক। তার ওপরে কবিতা লেখার ব্যারাম আছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ হয়ে, এমন কি দুবেলা রবীন্দ্রনাথের কাছে যাবে। আর রবীন্দ্রনাথের স্বভাব তো' জানই। নিজের শত অসুবিধা হলেও, কারও মুখের উপর একটি কথা বলে তাকে বিদায় করতে পারেন না, আর গিরিজা এখন থেকে রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতে থাকবে, তার ফলে রবীন্দ্রনাথকে আর একটি লাইনও লিখতে হবে না।

শরৎচন্দ্র হাত নেড়ে এমনভাবে—'আর একটি লাইন লিখতে হবে না'—। বললেন যে উপস্থিত সকলেই হো হো করে উঠলেন।

শরৎচন্দ্রের ঘরোয়া সভা আর বৈঠকের গল্প কে না জানে?

আমি দুটি গল্প বলছি। গল্পটি আমার শোনা শ্রদ্ধেয় স্বর্গত

মনিলাল বন্দোপাধ্যায়ের কাছে।

একবার শরৎচন্দ্রকে কোন এক সভায় সভাপতি করবার জন্য একদল কলেজের ছেলেরা এলো। শরৎচন্দ্রকে নিয়েও গেলো।

সেই সভায় শরৎচন্দ্রকে গান শোনাবার জন্য গাইয়েকে ডাকা হয়েছিল।

তাঁদের মধ্যে একজন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গায়ক ছিলেন। শুরুতেই তার গান ছিল। গান আরম্ভ হবার পূর্ব মুহূর্তে শরৎ পরিহাস করে বললেন: "দাঁড়াও বাপু গাইতে জান কিন্তু থামতে জান তো।"

শরৎচন্দ্রের এই কথা শুনে সবাই হেসে উঠলেন। শরৎচন্দ্র বললেন আমার আবার সে সময় নেই। তাই গানটা পরে কর। বলেই শরৎবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন: বাড়ীতে গিরিজা বসু বসে আছে— ও আমাকে নিয়ে কি করবে তাই বা কে জানে···

আর একবার শরৎচন্দ্রকে নিয়ে তাঁর কয়েকজন অনুরক্ত এক জুতোর দোকানে গেলেন। শরৎচন্দ্র বললেন, চলো চীনে পাড়ায় ওদের জুতো ভালো টেঁকেও বেশ!

শুনে একজন বললেন, কী বলেন দাদা? এই ঠনঠনে ছেড়ে— অগত্যা শরৎচন্দ্রকে আসতে হলো। একটা পছন্দমত জুতো ঠিক করার পর দাম জিজ্ঞেস করা হল। দামটা যা বললে দোকানী, তারপর সেই দামের অনেক কম বললে।

শরৎচন্দ্র বললেন, না। এখানে কেনা চলবে না।

—কেন দাদা? পছন্দ হয়নি?

—পছন্দ হয়েছে। কিন্তু দামটা যা বলেছিল সেটা আবার কমালো কেন? লেখা তো আছে একদর'। বলছে কম।

অগত্যা চীনের পাড়ার দোকানে এসে অনেক দরাদরি করেও এক পয়সাও কমানো গেল না. যা দাম তাই দিতে হল।

শরৎচন্দ্র দোকান থেকে বেরোবার পর বললেন; দেখলে তো?

ওদের আমাদের মধ্যে কত তফাৎ। ওরা যা বলে তাই করে, আর আমাদের—

এই বলে শরৎচন্দ্র প্রাণভরে হাসতে লাগলেন।

শরৎদা

রাধারাণী দেবী

একত্রিশে ভাদ্র। এদেশের আপামর সাধারণের প্রিয় লেখক শরৎচন্দ্রের জন্মদিন। যে লেখক প্রথম রচনাসাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেই যেন নিঃশব্দে উচ্চারণ করেছিল, "আমি এলাম, দাঁড়ালাম জয় করলাম"। চারিদিকে বিপুল বিস্ময় সৃষ্টি করে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

বাংলাদেশের মানুষের বিশেষ ধরণের মানসিকতা আর বিশেষ গড়নের চরিত্রের আধারে যিনি চিরন্তন মানবহৃদয়ের বিভিন্ন অনুভূতিগুলি স্বচ্ছন্দে জীবনায়িত করে তুলেছিলেন। যার মূল উৎপত্তি স্থল হৃদয়াভ্যন্তর—কেবল মস্তিষ্ক মাত্র নয়। মস্তিষ্কতার শিল্পের সহকারী মাত্র। প্রভু নয়। আজ মস্তিষ্ক-নির্ভরের অতি উজ্জ্বল সাহিত্যের দিনে তাই শরৎচন্দ্রকে মানুষ ভুলতে পারে নি। পারা কঠিন। কারণ হৃদয়ানুভূতিকে অস্বীকার সম্ভব নয়।

শরৎচন্দ্রের জন্মদিনে শরৎচন্দ্রের কথাই বলি। তাঁর সাহিত্য তো আমাদের ঘরেই রয়েছে আদরে হোক আর অনাদরেই হোক। সাহিত্য নিয়ে বিশ্লেষণ করা, বিদ্বজ্জনেরা আলোচনা করবেন, মূল্য নির্ণয় করবেন। সেই সহৃদয় মানুষটি সংসার থেকে অন্তর্হিত হয়েছেন—কিছুকাল আগেও আমাদের মধ্যে আমাদেরই মত জীবন্ত ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের পরিচিত মানুষ এখনও বাংলাদেশে অনেকেই আছেন।

কিছুকাল বাদে আর কেউ থাকবে না। যেমন মাইকেল মধুসূদন বা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষপরিচিত কেউ নেই। কাল প্রবাহ তার অমোঘ নিয়মে সংসারে আসা মানুষের চিহ্ন ধুয়ে মুছে ফেলে।

তারই মধ্যে অল্প কিছু কিছু মানুষের কীর্তি তাঁদের মানটিকে মাত্র ধরে রেখে দেয়। তাঁদের ব্যক্তিত্বের কিছু কিছু চিহ্ন সমকালীনেরা সংগ্রহ করে তুলে রাখেন উত্তরকালীন জন্য। এই সংগ্রহ নির্ভুল নির্ভেজাল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দীর্ঘকাল ধরে অনেক মানুষই আমাকে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে লিখতে অনুরোধ করেছেন। আমি লিখতে পারি নি। না পাবার কারণ— আমার ধারণা কারুর সম্পর্কে স্নেহভূত ও শ্রদ্ধাবিভূত থাকলে তাঁর সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের অধিকার কমে যায়, ঠিক অবাধভাবে বোধ হয় লেখা যায় না। অতি প্রিয়জন সম্পর্কে কথা বলা বৈকি। নিজের অজ্ঞাতেই হয়তো হৃদয়ানুরঞ্জনে রঞ্জিত করে ফেলতে পারি। তাই বক্তা না হয়ে শ্রোতা হয়ে বেঁচে আছি।

* * *

শরৎচন্দ্র অতি সহজ মানুষ ছিলেন। বাইরে জীবনযাত্রায় আলাপে, আচরণে—এত বেশী সাধারণ যে অনেক সময় আমাকে বিখ্যাত লেখক শরৎচন্দ্রকে দেখে কিছুটা হয়তো হতাশ হয়েই ফিরেছেন। সফিস্টিকেশন-বিরহিত অতি সাদাসাদি গ্রামীন মানুষ। গ্রামের সবুজ স্নিগ্ধতা ছিল তাঁর হৃদয়ে, আলাপে, আচরণে। কোন খানে কিছুটা কৌতুকের রং চড়ানো। সে কৌতুক হয়তো কিছুটা গ্রাম্য কিছুটা স্থূলতার পর্য্যায়েই পড়তো। এ নিয়ে তাঁর কাছে অভিযোগ করলে বা তাঁকে সতর্ক করতে চাইলে তিনি আরও উৎসাহিত হয়ে বেশি করে নিজেকে স্থূলরসিক প্রমাণ করতে তৎপর হয়ে উঠতেন। তাকে যখন বলেছি—আবার লেখার মধ্যে তা কৈ কোথাও কখনো এমন স্থূলরসিকতা দেখেনি।

হেসে বলতেন – কলম আর জিভ্ তো এক নয় বাপু। কলমের কি রক্ত মাংস আছে। জিভ্ চড়া ঠাণ্ডায় চড়া গরমে ছ্যাঁৎ করে করে লাফিয়ে ওঠে, ঝালে জ্বলে ওঠে, মিষ্টিতে অভিভূত হয়, কলম নির্বিকার থাকে। তাই, কলম কেবলমাত্র ভদ্রলোক জিভ খাঁটিলোক।

বলতেন—কলম লেখে ভেবেচিন্তে হিসেব করে মেপেজুপে। অনেক কিছু ফেলতে ইচ্ছে হলেও, তার গলাটিপে বন্ধ করে রাখতে হয়। তার বলার জায়গা বাঁধা উঠোনে। জিভের তেপান্তরের খোলা মাঠে। যা খুশি বলে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলুম কোথাও চিহ্ন রইল না। কতো সুবিধে বলো দিকি! ঐ জন্যে শাস্ত্র লিখছে – 'শতং বদ মা লিখ।'

শরৎচন্দ্রের অন্তঃপ্রকৃতি গভীর ছিল। কোনও দুঃখের ক্ষণে বা দুঃখের আলোচনায় তা ধরা যেত তিনি নিজের সম্বন্ধে বা নিজের সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতেন না। কিন্তু অন্যের মুখে শুনতে খুবই ভালবাসতেন। বালকের মত উজ্জ্বল সরল আনন্দে খুশি মুখে নিজের লেখার সপ্রশংস সমালোচনা উৎসাহিত হয়ে শুনতেন। এ উৎসাহ দেখে তাঁকে পরিহাস করে বলেছি এমনভাবে আশ্চর্য মুখে আনন্দ বিগলিত হয়ে আপনি বাঘা-বাঘা অধ্যাপকের সামনে আপনার নিজের লেখা সম্বন্ধে ওদের প্রশংসা শুনে অভিভূত হচ্ছিলেন আপনাকে হয়তো খ্যাতি লোভী প্রশংসা কাঙাল ভাববেন ওঁরা।

উত্তরে উচ্চ হেসে বলেছেন—পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যের রসদ যদি মূর্খদের লেখা থেকে বার হয়, অবাক হবো না? বলো কী তুমি। ভেবে দেখ রবিবার স্কুল-পালানো ছেলে তার ভাবনা চিন্তা গদ্য-পদ্য নিয়ে এখন বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা কতো উঁচু উঁচু পর্বত করতে লেগে গেছেন। আমারই ওঁদের বিদ্যার পর্বতের দিকে ঘাড় উঁচু করে তাকাতে গিয়ে ঘাড়ে ব্যথাধরিয়ে ফেলি। ওঁদের মুখে প্রশংসা শুনে আহ্লাদ করব না?

এই রকমই ছিল তাঁর বাক্যালাপের ভঙ্গী।

শরৎচন্দ্রের মধ্যে কোমলতা ছিল মাতৃহৃদয়ের মতো অকৃত্রিম এবং প্রগাঢ়। সত্যিই এমন মমতা-কোমল মন সংসারে অল্পই দেখা যায়। কিন্তু তার মধ্যে একটি ঋজু দৃঢ়তাও ছিল। সেখানে তিনি ছিলেন অনমনীয়। দেশকে ভালবাসতেন প্রাণ দিয়ে। দেশের জন্য মমতা ব্যাকুল অসহায় মায়ের ছটফট করতেন তার দুর্দশার প্রতি তাকিয়ে। কুসংস্কার, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, দারিদ্র দিরন্নতা এ নিয়ে তাঁর দুর্ভাবনা ও বেদনার সীমা ছিল না। দেশের মানুষদের চিনতেন তাদের চারিত্রিক দুর্বলতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত ছিলেন। সেই দুর্বলতার প্রতি তাঁর তীব্র বিরাগ ছিল কিন্তু বিদ্বেষ ছিল না। ঘৃণা ছিল না। বরং একটি অসহায় করুণাবোধ ছিল। এটি তাঁর সাহিত্যের নানা চরিত্রের মধ্যে বার বার ব্যক্ত হয়েছে। মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধা যেন সহজাত। এ শ্রদ্ধা তাঁর নিজ জীবন থেকেই বাল্য কৈশোর ও যৌবন আহরিত। মেয়েদের দুর্বলতা সম্পর্কেও অভিজ্ঞ ছিলেন। সেখানে তাঁর আঘাত কঠোর অথচ নিঃশব্দ ছিল। পুরুষ চরিত্রের দুর্বলতায় যেমন খোলা গলায় স্পষ্ট প্রতিবাদ তুলতেন, মেয়েদের বেলায় সেটি তুলতেন ইঙ্গিতে। তাঁর সাহিত্যেও এটি লক্ষ্য করা যায়।

শরৎচন্দ্রের ব্যক্তি জীবনে একটি বেদনাসিক্ত অভিমান ছিল।

এ বেদনা বা এ অভিমান তাঁর একান্তই নিজস্ব ছিল। এখানে তিনি কখনও কাউকে প্রবেশ করতে দেননি, অংশ দিতে চাননি। আপনি জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত এই বেদনাই তাঁর সাহিত্যকে মানুষের মর্মস্পর্শী করে তুলতে সহায়তা করেছে এই তাঁর ধারণা ছিল। তিনি নিজে জীবনের নানা দিক দিয়ে বঞ্চিত না হতে পেলে এই গভীর হার্দ্য সাহিত্য আমরা পেতাম না।

শরৎচন্দ্রের জন্ম আমাদের দেশে অক্ষয় হয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হতে থাকুক এই প্রার্থনা করি।

বাংলা সাহিত্যে কথাশিল্পী

—গোপাল ভৌমিক

বাংলা সাহিত্যে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অবস্থা অনেকটা রূপকথা জাদুকর হ্যান্‌স্‌ ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ডারসনের গল্পের রাজপুত্রের মত। জীবনে বহু বাধা বিপত্তি ও দুঃখ ঝঞ্ঝাট পেরিয়ে রাজপুত্র যেমন করে তার প্রার্থিত রাজকন্যাকে লাভ করেছিল, তেমনই শরৎচন্দ্রও অজ্ঞাত নিঃস্ব জীবনে বহু ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করে মধ্য বয়সে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে রাতারাতি সাহিত্য সরস্বতীর বরমাল্য অর্জন করেছিলেন। এরূপ সাফল্যের নজির বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সুলভ নয়। শরৎচন্দ্রের পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক কালের বাংলা সাহিত্যের যাঁরা স্মরণীয় পুরুষ, যেমন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন সমৃদ্ধ পরিবারের সন্তান এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁদের বহুমুখী কৃতিত্ব ছিল। সাহিত্য রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাবের পূর্ব সমাজে এ ধরণের কোন পূর্ব স্বীকৃতি তো শরৎচন্দ্রের ছিলই না বরং জীবনের অর্থাভাবের দরুণ তিনি তাঁর শিক্ষা জীবন অসমাপ্ত রেখে জীবনের অসহ্য তাড়নায় সামান্য কেরানীর চাকুরী নিয়ে সুদূর ব্রহ্মদেশ পাড়ি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের যখন আবির্ভাব তখন রবীন্দ্র প্রতিভার আলোকে চারদিক সমুদ্ভাসিত। জীবনের প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের প্রকার ভেদ করে রবীন্দ্র যুগে শরৎচন্দ্রের আকস্মিক আবির্ভাব এবং প্রায় সাঙ্গ সঙ্গে যশের শিখরে আরোহণ বাংলা সাহিত্যের এক অভূতপূর্ব ঘটনা। বিদেশে না হলেও স্বদেশে ঔপন্যাসিক হিসাবে শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তাকেও

ছাপিয়ে গিয়েছিল। তবুও রবীন্দ্র প্রতিভার সঙ্গে শরৎ প্রতিভার তুলনা হয় না। বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সব্যসাচী —আমাদের সাহিত্যে এমন কোন দিক নেই যা তাঁর প্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শে সমুদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নি। অপর দিকে শরৎ-চন্দ্রের প্রতিভা ছিল একমুখী—তা সীমাবদ্ধ হয়েছিল আমাদের কথা সাহিত্যের মধ্যে তাঁর প্রতিভার প্রসারক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হলেও, তাঁর নিজের সৃষ্টির জগতে তিনি ছিলেন প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

বাংলা কথা-সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের দানের পরিমাপ নিয়ে তাঁর জীবিতকালে যেমন বিতর্কের শেষ ছিল না, আজও সে বিতর্কের অবসান হয়নি। শরৎচন্দ্রকে নিয়ে এই বিতর্ক থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে বাংলা সাহিত্যে তাঁর দানের মধ্যে অভিনবত্ব ছিল, ছিল কিছু ব্যতিক্রম। তিনি যদি চিরাচরিত ধারার অনুসারী হচ্ছেন তা হলে তাকে নিয়ে এমন বিতর্কের ঢেউ উঠত না। তবে তাঁকে নিয়ে গত ৫০ বৎসরে বিতর্কের স্বরূপ অনেক পাল্টেছে। তাঁর সৃষ্টির প্রথম জীবনে যে সব বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছিল সেগুলি মূলতঃ তাঁর নীতিবোধ সম্পর্কিত। এ সমালোচনা এসেছিল মুখ্যত সমাজের রক্ষণশীল অংশের কাছ থেকে এঁদের মতে তাঁর সাহিত্য ছিল অশ্লীল এবং দেশের তরুণ সমাজের নৈতিক মান অবনমনে সহায়ক। বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্রের সৃষ্টনারী চরিত্র অচলা, কিরণময়ী, সাবিত্রী, চন্দ্রমুখী প্রভৃতি এই ধরণের অভিযোগের মূল কারণ ছিল। আমাদের সমাজে নারী সম্পর্কে যে সতীত্ববোধ প্রচলিত আছে তার চেয়ে নারীর নারীত্ব যে অনেক বেশী বড়, আলোচ্য চরিত্রগুলির মাধ্যমে শরৎচন্দ্র সেই কথাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রচলিত সামাজিক মতবাদকে আঘাত করলে তার তীব্র সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল একাংশের সমর্থন পেয়েছিলেন, তেমনই প্রতিক্রিয়াশীল অপরাংশের বিরূপতাও তাঁকে কিছু করতে হয়েছিল।

তবে এ বাধা কাটিয়ে উঠতেও তাঁর বিলম্ব হয়নি। কেননা যুগ পরিবর্তনের ফলে দেখা গেছে যে সত্যদ্রষ্টা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের মতবাদই সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছে এবং প্রতিক্রিয়াপন্থীদের কণ্ঠ গেছে ডুবে।

শরৎ কথা সাহিত্যিক ছিলেন বলে তাঁর গল্প উপন্যাসের মূল উপজীব্য ছিল মানুষ। সে মানুষ আমাদের ব্যষ্টি জীবন ও সমষ্টি জীবন নানা স্তরের অধিবাসী। ফলে আমাদের চারিদিকে সমাজের নানা ভাবে তাঁর সাহিত্য রূপায়িত হয়ে উঠেছে। আর তিনি মূলত বাস্তবধর্মী লেখক হলেও যেহেতু আলোকচিত্রী মাত্র ছিলেন না, সেজন্য ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবন সম্পর্কে তাঁর ধ্যান ধারণা রূপায়িত হয়ে উঠেছে তাঁর গল্প উপন্যাসের মাধ্যমে। তাঁর নিজস্ব ধ্যান ধারণার সঙ্গে প্রচলিত সামাজিক অনেক ধ্যান ধারণার মিল হয় নি—অনেক সংস্কার ও প্রচলিত বিধি ব্যবস্থা তাঁর প্রগতিশীল শিল্পী মনের সমর্থন পায়নি। তাই তিনি সেগুলিকে কঠিন হাতে আঘাত করেছেন। যে সব সামাজিক মানুষ স্থিতিশীল মনের অধিকারী তারা যে কোন নতুন ভাবধারাকেই সন্দেহের চোখে দেখেন এবং বিরুদ্ধাচরণ করেন। শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রেও রক্ষণশীল জনসমাজের এরূপ একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভিত্তি কাঁচা ছিল বলে তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।

শরৎচন্দ্রের পরলোকগমনের পর ইদানিং তাঁকে নিয়ে আর এক ধরণের সমালোচনার উদ্ভব হয়েছে। যে সমালোচনায় পণ্ডিত শ্রেণীর অনেক ব্যক্তিকে আমরা অংশ গ্রহণ করিতে দেখি। এই ধরণের সমালোচকদের মূল বক্তব্য এই যে পাঠকদের কাছে শরৎ সাহিত্যের আবেদন ব্যাপক হলেও মহাকালের বিচারে এ সাহিত্য স্থায়িত্ব দাবী করতে পারবে না। এ সমর্থনে যে সব যুক্তি তাঁরা দেখান সেগুলি মোটামুটি নিম্নোক্তরূপ: (১) শরৎ সাহিত্য প্রচারধর্মী (২) শরৎ সাহিত্যে বুদ্ধিবাদ অপেক্ষা হৃদয়বাদের প্রাবল্য সমধিক

(৩) শরৎ সাহিত্যে সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থা ও ঘটনাবলীর প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এসব অভিযোগ যদি সত্য বলেও ধরে নিই, তাহলেও কালের দরবারে শরৎ সাহিত্য একবারে নাকচ হয়ে যাবে এরূপ কথা জোরের সঙ্গে বলতে পারি না। আমাদের সমাজে যে অবস্থায় শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছিল ইতিমধ্যে তাঁর বহু রূপান্তর ঘটে গেছে। যে সব সামাজিক সমস্যা শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাসে আলোচিত হয়েছে, সেগুলির অধিকাংশ আজ হয়তো অনুপস্থিত? তাই বলে শরৎসাহিত্য কি ইতিমধ্যে পাঠক পাঠিকাদের কাছে অপাংক্তেয় হয়ে উঠেছে? শরৎচন্দ্রের অক্ষুণ্ণ জনপ্রিয়তা কিন্তু তা বলে না। এখন তার কোন কোন বই-এর বিক্রয় এত বেশী যে কোন জীবিত প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের ঈর্ষার বস্তু।

আগামী ৫০ বা ১০০ বছর পরে শরৎসাহিত্যের কি অবস্থা হবে তা যেমন তাঁর পণ্ডিত সমালোচকেরা বলতে পারেন না, তেমনি আমিও পারি না। তবে আমার বিশ্বাস সেদিন তাঁর গল্প উপন্যাসে বর্ণিত সামাজিক পটভূমিকার আমূল পরিবর্তন হলেও শরৎসাহিত্য নাকচ হয়ে যাবে না, তার কারণ যে প্রাণধর্মে সাহিত্য মহৎ হয়ে ওঠে সেই প্রাণধর্মে তার সাহিত্য সৃষ্টি সমুজ্জ্বল এবং তার আবেদন যুগের পর যুগ থাকবেই এই হিসাবে প্রত্যেক গল্পকার ও ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিই সমসাময়িককালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সমসাময়িক কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সমসাময়িক কালের পটভূমিকায় গল্প উপন্যাস লেখেননি এরূপ কথা সাহিত্যিক খুব কমই আছেন। তবু তাঁরা নিজেদের যুগের বাইরে বেঁচে থাকেন কি করে? বেঁচে থাকেন তাঁদের সাহিত্য সমসাময়িকতার ঊর্দ্ধে উঠে যে চিরন্তনতার স্বাক্ষর তাঁরা রাখেন তার জোরে। তা যদি না হত তাহলে ডিকেন্সের গল্প উপন্যাস আজ আমরা পড়তাম না, পড়তাম না শরৎচন্দ্রকে। ডিকেন্সের যে সামাজিক পটভূমিকা অনেককাল আগেই তা পরিবর্তিত

হয়েছে। তাই বলে তার সৃষ্ট চরিত্রগুলির মূল্য কিছু কমেনি। যদি ধরে নিই শরৎচন্দ্রের রমা ও রমেশ যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, তার অস্তিত্ব আজ নেই, তাহলে কি তাদের জীবনের ট্রাজেডি আমাদের মনে কোন রেখাপাত করবে না? আমরা যখন এইভাবে সাহিত্যের বিচার করি তখন একটা জিনিস ভুলে যাই যে সাহিত্যের সত্য জীবনের সত্য এক নয়। কোন গল্প, উপন্যাসের চরিত্র বিচার করতে গেলে আমরা প্রথমেই দেখি—যে পটভূমিকায় লেখক তার চরিত্রগুলির অবতারণা করেছেন সেই পটভূমিকায় তারা সত্য ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে কিনা। তা যদি হয়, তাহলে সাহিত্যের জগতে তাদের মৃত্যু নেই—বাস্তব জগতে তাদের অস্তিত্ব থাকুক আর নাই থাকুক। এদিক থেকে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে শরৎ সাহিত্য আবেদন বিশেষ কোন গোষ্ঠীর বা শ্রেণীর কাছেই নয়, এমনকি বিশেষ কোন কালের কাছেও নয়, তাহার আবেদন সার্বকালীন। মানুষ যদি তার হৃদয় ধর্ম না ভোলে তাহলে সে কি করে শরৎ সাহিত্যের আবেদনে সাড়া না দিয়ে পারবে?

শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে আর একদল সমালোচক এই বলে অভিযোগ করেন যে তাঁর সাহিত্য নানাবিধ সমস্যার ইঙ্গিত করেছেন কিন্তু সেগুলি সমাধানের কোন পথ নির্দেশ করে যাননি। আমার কাছে এরূপ সমালোচনাও অর্থহীন বলে মনে হয়। শরৎচন্দ্র সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না—তিনি ছিলেন চিন্তাশীল গল্পলেখক। দেশের দুঃখদুর্দশার দৈন্য কুসংস্কার দেখে তিনি অন্যান্য চিন্তাশীল নরনারীর মত বেদনা বোধ করেছেন এবং সেই বেদনার প্রতিফলন হয়েছে তাঁর সাহিত্যে। তিনি মূলত ছিলেন সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক নন। এইসব সমাজ সৃষ্টির প্রয়োজনে তাঁকে সামাজিক পটভূমিকার আশ্রয় নিতে হয়েছে—সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য নয়। সমাজ সংস্কারের কোন উদ্দেশ্য যদি তাঁর থেকে থাকে, তাহলে সেটা গৌণ। মূল উদ্দেশ্য তাঁর

রসসৃষ্টি। রসসৃষ্টিতে তিনি যদি সফল হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য কতটা সফল হয়েছে সেটা অবান্তর। সমাজ সংস্কারের স্পষ্ট পথ নির্দেশ যে শরৎ সাহিত্যে নেই, সেটা দোষের নয়, বরং শিল্পী হিসাবে তাঁর বিশেষ মনের পরিচায়ক।

যাই হোক মনে করি যে শরৎচন্দ্র বাংলা গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে এক স্মরণীয় পুরুষ এবং আমাদের কথা-সাহিত্যে যে শ্রদ্ধার আসন তিনি পেয়েছেন তা দীর্ঘস্থায়ী হবে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পরেই এক্ষেত্রে কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। গল্প বা উপন্যাসের আঙ্গিকে তিনি অবশ্য কোন বৈপ্লবিক গঠন-শৈলীর প্রবর্তক করেননি। গল্প উপন্যাসের প্রচলিত কাঠামো অবলম্বন করেই তিনি তাতে করেছিলেন নতুন প্রাণ সঞ্চার। গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন তা আঙ্গিকগত নয়—তা মূলত ভাবগত এবং বিষয়গত। যে অজ্ঞাত জন-জীবনের কথা তিনি আমাদের কাছে প্রথম তুলে ধরেছিলেন তা তৎপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা রবীন্দ্রনাথের কথা সাহিত্যে রূপ পায়নি। তার প্রতিভার যাদুস্পর্শে দেশের সাধারণ মানুষ সর্বপ্রথম নিজেকে সাহিত্যের দর্শনে প্রতিফলিত হতে দেখল। আজ অবশ্য আমাদের দেশের প্রায় সকল কথাসাহিত্যিকেরই গল্প উপন্যাসের মূল উপজীব্য দেশের সাধারণ মানুষ। আজকের এই গণতান্ত্রিক অবস্থা সৃষ্টিতে শরৎসাহিত্যেই সর্বাধিক সাহায্য করেছে সেকথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই সে দুর্গম পথের পথিকৃৎকেও আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়। শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয় কৃতিত্ব তার অপূর্ব গল্প বলার কৌশল। তার কাহিনীর বিষয়বস্তু যাই হোক না, তিনি এমনভাবে গল্প বলতে থাকেন যে তার যে কোন কাহিনী একবার পড়তে শুরু করলে তা শেষ না করে উপায় থাকে না। এ ধরণের গল্প বলার কুশলতা ইতিপূর্বে আর কোন বাঙলা কাহিনী কাব্যের মধ্যে আমরা দেখতে পাইনি। আজকের দিনেও আমরা

এদিক থেকে শরৎচন্দ্রকে বেশী দূর ডিঙোতে পারিনি। বরং তিনি গল্প উপন্যাসের যে রীতি দেখিয়ে গেছেন আমরা তারই অনুসরণ করে চলেছি মাত্র। যুগ পরিবর্তনের ফলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর হয়তো পরিবর্তন হয়েছে, সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থার হয়েছে রূপান্তর। তার ফলে আমাদের সমসাময়িক কালের গল্প উপন্যাসে এসেছে নতুন কাহিনী ও নতুন আস্বাদ। এছাড়া আমাদের কথাসাহিত্যের চরিত্রগত কোন বড় পরিবর্তন হয়নি। গল্প উপন্যাস রচনার আঙ্গিকের দিক থেকেও আমরা এ পর্যন্ত কোন অভিনব পদ্ধতির পরিচয় দিতে পারিনি। সুতরাং শরৎচন্দ্রের মরদেহের অবসান হলেও তার সাহিত্যিক সত্তা আজও আমাদের নানাভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

যুগে যুগে প্রত্যেক স্রষ্টারই পুনর্মূল্য নির্দ্ধারণ হওয়া আবশ্যক। সেদিক থেকে শরৎ সাহিত্যেরও পুনর্মূল্য নির্দ্ধারণ হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। তবে সে পুনর্মূল্য নির্দ্ধারণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে হওয়া বাঞ্ছনীয়। রবীন্দ্রনাথের গভীরতা ও ব্যাপকতা হয়তো শরৎ সাহিত্যে নেই। কিন্তু তার সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে শরৎচন্দ্রেরও জুড়ি নেই। অন্তত আজ শরৎচন্দ্রের অভাব পূরণের ক্ষমতা নিয়ে কোন সাহিত্যিক জন্মায় নি। তার যেটুকু সত্য মূল্য সেটা দিতে আমরা কুণ্ঠিত হই, তাহলে শরৎচন্দ্রের কোন ক্ষতি হবে না— আমরাই আমাদের পাটোয়ারির ও ভ্রান্তির সাহিত্যবোধের পরিচয় দেব। শরৎচন্দ্রের স্মরণ করা মানে আমাদের একটা উক্ত মানের মানের স্মরণ করি।

শরৎচন্দ্রকে যেমন দেখছি

অখিল নিয়োগী

তখন আমাদের কৈশোরের যুগ চলছে।

স্কটিশ চার্চ স্কুলের নীচু ক্লাশে পড়ি। কিন্তু বাঙলা বই কিছু হাতের কাছে এলে দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকের মত বাছ-বিচার না করে গিলতে থাকি।

বাসায় প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা আসে। সেগুলোও লুকিয়ে পড়ে থাকি।

এ যুগে হঠাৎ একদিন একখানি চটি বই টেবিলের ওপর কুড়িয়ে পেলাম। বিকেল বেলা বেড়াতে যাবারই কথা ছিল। কি সে সংকল্প ত্যাগ করে বইখানি নিয়ে ছাদের উপর উঠে গেলাম। বই খানির দাম আট আনা—নাম 'অরক্ষণীয়া'।

যত বইখানির পাতা ওল্টাই—তত সেই অজানা মেয়েটির দুঃখে বুক ভারী হয়ে ওঠে।

অবশেষে নিজেই এক সময় অবাক হয়ে গেলাম—বই পড়ে আমি কাঁদছি। গল্প পাঠ করে চোখের জল ফেলার যে সুখ তা জীবনে সেই দিনই প্রথম জানতে পারলাম। যখন কাহিনী শেষ হল—তাকিয়ে দেখি—পশ্চিমের লাল রঙের মেঘের সঙ্গে আমার মন রক্তাক্ত বেদনায় যেন একেবারে মাখামাখি হয়ে গেছে।

সেই জ্ঞানদা, সেই পোড়াকাঠ—সেই সব চিরকালের জানা মানুষগুলি যেন আমার মনে সবার অজান্তে বাসা বাঁধল।

সেই থেকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা বাসায় এলেই লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ি।

এই মানুষটিকে সামনা-সামনি দেখলাম—এই ঘটনার অনেক পরে।

রামমোহন লাইব্রেরীতে শরৎচন্দ্র তার 'পল্লীসমাজ' সম্পর্কে আলোচনা করবেন—এই কথা শুনে ছাত্রমহল সহসা চঞ্চল হয়ে উঠল।

আমরাও দল-বেঁধে গিয়ে সেখানে হাজির হলাম। সত্যি কথা বলতে কি,—শরৎচন্দ্রের বক্তৃতা শুনে সেদিন আদৌ খুশি হতে পারি নি। বরং একটা আশা-ভঙ্গের বেদনা নিয়ে ঘরে ফিরে এসেছিলাম।

কেবল থেকে থেকে মনে হচ্ছিল,—যে লেখক তার গল্প বলার গুণে মানুষের চোখ দিয়ে জল বের করে আনেন,—বক্তৃতার ব্যাপারে তাঁর এত দৈন্য কেন।

শরৎচন্দ্র বলতে চেয়েছিলেন রমা ও রমেশের কেন তিনি মিলন ঘটান নি—এই সম্পর্কে প্রায়ই তাঁর কাছে অনুযোগ আর অভিযোগ আসে। সেই অভিযোগ খণ্ডন করার জন্যেই তাঁর বক্তৃতা। কিন্তু আমাদের সেই বয়সেই মনে হয়েছিল, কোনো কথাই তিনি যেন গুছিয়ে বলতে পারলেন না।

সেদিন ছাত্র সমাজের ক্ষোভের সীমা ছিল না।

শরৎচন্দ্রকে আরো কাছে আরো ঘরোয়াভাবে পেলাম—এই ঘটনার অনেক পরে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গবাণী' দৈনিক কাগজে যোগদান করেছি। বর্তমানে সরস্বতী প্রেস যেখানে অবস্থিত, সেই বাড়ীতেই ছিল—ফরওয়ার্ড, বঙ্গবাণী ও নবশক্তির কার্য্যালয়। বন্ধুবর গোপাল সান্যাল তখন বঙ্গবাণীর সম্পাদক। বন্ধুবর প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি তরুণ সাহিত্যিকরা যেখানে সাংবাদিকতায় হাত পাকান। নবশক্তির সম্পাদক তখন নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। আমি যাই—

দোতালার ঘরে দিব্যি চায়ের আড্ডা ও সাহিত্যের আসর।

একদিন গোপাল সান্যাল মশাই হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন, শরৎচন্দ্রের পঞ্চাশ বছরে দেশের যে ত্রুটি হয়েছে—তিপান্ন বছরে তার সংশোধন করতে হবে। বিরাটভাবে শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। গোপালবাবু জোর করে আমাকে উৎসব কমিটির সহকারী সম্পাদক করে দিলেন। সুতরাং ছুটোছুটি খাটা-খাটুনি প্রচুর করতে হবে। দেশের গণমান্য সবাই অভ্যর্থনা সমিতিতে এলেন। 'নির্বাসিতের আত্মকথা'র উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, দিলীপ রায় প্রভৃতি কোমর বেঁধে কাজে লাগলেন। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে কোমর বেঁধে কাজে লেগে গেলাম। সারা দেশময় ছাত্রসমাজের তখন কি উত্তেজনা! কাজী নজরুল নতুন গান বাঁধলেন

"কোন্ শরতে পূর্ণিমা-চাঁদ আসিলো এ ধরাতলে!"

বিরাটভাবে শরৎচন্দ্রের সম্বর্ধনা হয়ে গেল—তাঁর তিপান্ন বছর বয়সে।

বেহালার মণীন্দ্র রায় ছিলেন শরৎচন্দ্রের বিশেষ অনুরাগী। শরৎ সম্বর্ধনা যাঁরা কর্মকর্তা ছিলেন এবং খাটা-খাটুনি করেছেন—তাঁদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মণীন্দ্রবাবু এক বিরাট ভোজের আয়োজন করলেন। তাঁর বেহালার বাড়ীতে এক সন্ধ্যায় বসল আসর। তাঁর মধ্যমণি শরৎচন্দ্র নিজে। প্রাণ খুলে গান গাইছেন—দিলীপ রায় আর কাজী ইসলাম। গান যখন বন্ধ হল,—তখন শরৎচন্দ্রের রসালো গল্প চলতে লাগলো। মণীন্দ্র রায় মশায় এমন করে প্রত্যেকটি থালা দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলেন—যেন নাতজামায়ের দল এসেছে। গানে, গল্পে, ভোজে সে ছিল এক স্মরণীয় সন্ধ্যা। সেই ভোজের রসালো বিবরণ আমি তৎকালীন দৈনিক কাগজ "বঙ্গবাণী"তে প্রকাশ করেছিলাম।

"রসচক্রে" আমরা শরৎচন্দ্রকে আরো কাছাকাছি আরো ঘনিষ্ঠ-

ভাবে পেয়েছিলাম। কবিশেখর কালিদাস রায় এই "রসচক্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রতি সপ্তাহে এখানে প্রবীণ নবীন বহু সাহিত্যিকের সমাগম হত। শরৎচন্দ্র এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যমণি ছিলেন। বিশ্বপতি চৌধুরী, অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ, প্রেমেন শৈলজা, সুনির্মল থেকে শুরু করে সকলেই এখানে এসে সেই সাহিত্য তীর্থের পুণ্য সলিলে অবগাহন করে যেতেন। আমরাও সুযোগ পেলেই এসে হাজির হতাম। শরৎচন্দ্রের গল্প আর বিশুদার (বিশ্বপতি চৌধুরী) টিপ্পনী বিশেষ উপভোগ্য ছিল। রসচক্রের' পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে উদ্যান-সম্মেলন হতো। শরৎচন্দ্রের উৎসাহ তাতে সব চাইতে বেশী। তিনি আমাদের নিয়ে হুঁকো হাতে এক গাছের তলায় বসতেন—আর তাঁর ছেলেবেলার গল্প, সাপ ধরার গল্প, যাত্রা দলের গল্প, রেঙ্গুনের গল্প, সব ধীরে ধীরে আমেজ করে শোনাতেন। সে যে কত বিচিত্র কাহিনী —তখন লিখে রাখলে এক উপভোগ্য গ্রন্থ হত।

এই রকম এক উদ্যান-সম্মেলনে শরৎচন্দ্র একদিন আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কে কে কবিতা লেখো—হাত তোল। আমরা মহাগর্বের সঙ্গে হাত তুললাম। শরৎচন্দ্র তখন সবাইকে অবাক করে দিয়ে বললেন, আজ থেকে সকলেই কবিতা লেখা ছেড়ে দাও।

তরুণ সাহিত্যিকরা ত' সবাই হতবাক্। শরৎচন্দ্র এ আবার কি বলছেন?

আমাদের সবাইকার মুখের চেহারা দেখে—শরৎচন্দ্র বললেন, দেখ আমি ঠিক কথাই বলছি। যে দেশে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছেন—সেখানে নতুন করে কবিতা রচনা কোনো মানে হয় না। আমি প্রথমে কবিতা দিয়েই শুরু করেছিলাম। তারপর রবীন্দ্রনাথের লেখা কবিতা পড়ে বেমালুম ছেড়ে দিয়েছি। আচ্ছা, তোমরাই বলো না, নতুন করে কি আর লেখবার আছে—রবীন্দ্রনাথের পর? সব কিছুই তিনি সুন্দর করে বলে গিয়েছেন।

অবশ্য এর পরে কোনো তরুণ সাহিত্যিকই কবিতা রচনা ছেড়ে দেন নি। তবে শরৎচন্দ্র সেদিন খুব সত্যি কথা বলেছিলেন।

এই রসচক্রে তিনি অনেক সাহিত্যিকের সম্বর্ধনার আয়োজন করতেন। তিনি বলতেন, নতুন যারা শিখছে—তাদের প্রেরণার প্রয়োজন আছে। আমরা ছেলেবেলায় কোন রকম উৎসাহ বা প্রেরণা পাইনি লেখবার জন্যে।

শরৎচন্দ্র যখন দক্ষিণ কলিকাতায় নিজের গৃহ তৈরী করলেন তখন তাঁর স্নেহভাজন অনুজ সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন—সেই নব-ভবনে। আমরাও সেই মহোৎসবে উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের গ্রন্থের নায়িকার মতোই তিনি সবাইকে খাওয়াতে বড় ভালবাসতেন। দোতলায় খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। তিনি নিজে কখনো মোড়ায় বসে কখনো ঘুরে ঘুরে সবাইকার খাওয়া দেখে বেড়াচ্ছিলেন। কার পাতে কি দরকার—সেদিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। শরৎচন্দ্র নিজে বসে খাওয়াচ্ছেন—এই দুর্লভ সৌভাগ্য আমরা লাভ করেছিলাম।

এর পরেও শরৎচন্দ্রের গৃহে কতবার গেছি, তাঁর থাকা কালে, কখনো তাঁর অনুপস্থিতিতে—কিন্তু তাঁর সেই স্নেহ-ভরা মুখখানি কখনো ভুলতে পারিনি। সাহিত্যকে ভালবেসে তিনি দেশের সাহিত্যিকদেরও আপনার করে নিয়েছিলেন।

রূপবাণীর গোড়া-পত্তন থেকেই আমি তার প্রচার সচিব ছিলাম। যখন নিউ থিয়েটার্স তাঁর "দত্তা" উপন্যাসকে অবলম্বন করে "বিজয়া" ছায়াচিত্র নির্মান করলেন, তখন স্থির হল যে, রূপবাণীতেই সেই বিজয়া মুক্তিলাভ করবে।

আমি আর অবিনাশ ঘোষাল রূপবাণীর পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করে এলাম যাতে তিনি উদ্বোধন উৎসবে রূপবাণীতে উপস্থিত

থাকেন। শরৎদা একটু কুনো স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি লোকজনের ভীড়ে কিছুতেই আসতে রাজী হবেন না, আর আমরাও তাঁকে ছাড়বো না। একটা যেন টাগ-অফ-ওয়ার চললো। অবশেষে আমাদের আবদারে তাঁকে শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হল।

উৎসবের দিন বিকেল বেলা আমরাই গিয়ে গাড়ী করে তাঁকে নিয়ে এলাম। তিনি সন্ধ্যার শো-তে 'বিজয়া' দেখলেন। উৎসব শেষে দোতলার লবীতে এসে বসতেই আমি একখানি খাতা নিয়ে তাঁর সামনে ধরলাম।

—শরৎদা 'বিজয়া' আপনার কেমন লাগছে একটু লিখে দিন।

এতক্ষণ শরৎচন্দ্র ধৈর্য ধরে কোন রকমে চুপচাপ ছিলেন। এই-বার একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন, ওই তো তোমাদের দোষ অখিল, সব ব্যাপারেই একেবারে নগদ বিচার চাই। এক্ষুনি আমি কি লিখবো বল ত?

অবশ্য এই নগদ-নগন লিখিয়ে নেবার কাজে আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল। রাতারাতি শরৎদার অভিমত ব্লক করে পরের দিনের সংবাদ পত্রে ছাপিয়ে দেবো,—এই ছিল আমার আন্তরিক বাসনা। শরৎদা প্রথমটা যতই রাগ করুন না কেন,—আমি শেষ পর্যন্ত লেগে থেকে কাজ হাসিল করতে পেরেছিলাম। পরের দিন সংবাদপত্রে শরৎদার নিজ হাতে লেখা অভিমত ব্লক করে প্রকাশ করা হয়েছিল।

রবি-বাসরেও আমরা শরৎচন্দ্রকে একান্ত আপনার করে পেয়ে-ছিলাম। রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে নামকরা ৪০ জন সাহিত্যিক এই রবিবাসরে সভ্য ছিলেন। এক এক অধিবেশন এক একজন সভ্যের গৃহে আহ্বান করা হত। আর তাতে ভোজের একটা প্রতি-যোগিতা চলত। ওইসব সভায় সাহিত্য আলোচনা, সঙ্গীত ইত্যাদি চলত; আর চলত শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প। সে যে কী মজাদার জিনিস—সামনা-সামনি না শুনলে ঠিক হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

আমরা ভেবে অবাক হয়ে যেতাম, যে মানুষ সভা-সমিতিতে আদৌ বক্তৃতা দিতে পারেন না, তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কি করে মজলিস জমিয়ে রাখেন।

রবি-বাসরের প্রায় প্রত্যেকটি অধিবেশনেই শরৎচন্দ্র উপস্থিত থাকবার চেষ্টা করতেন। নেক্ষাৎ শরীর অপটু হলেই তিনি আসতে পারতেন না। তা ছাড়া, শেষ বয়সে তিনি পানিত্রাসে নদীর ধারে নিরিবিলি গ্রামাঞ্চলে একটি বাড়ী তৈরী করেছিলেন। মাঝে মাঝে সেখানে গিয়েও থাকতেন। তখন আর তাঁর রবিবাসরে আসা সম্ভব হত না।

শেষের দিকে তিনি প্রায়ই নানা রোগে ভুগতেন। সকলের সঙ্গে দেখা হত না বলে তাঁর মনোবেদনার অন্ত ছিল না। ছেলেমানুষের মতো বলতেন, আমি বাড়ীতে ফোন নিয়েচি, তোমরা সবাই ফোনে আমার সঙ্গে কথা বোলো। মানুষকে যে তিনি কতটা ভালবাসতেন এই সব ছোট ছোট কথাতেই বোঝা যায়।

আর তাঁর কুকুর-প্রীতি ত গল্প কথা হয়ে আছে।

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সেনের গৃহের রবি-বাসরে অধিবেশন চলেছে—এমন সময় খবর এলো নার্সিংহোমে আমাদের সবাইকার প্রিয় শরৎদা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে অধিবেশন বন্ধ হয়ে গেল, আমরা সবাই পথে বেরিয়ে পড়লাম।

শরৎচন্দ্রের শ্রাদ্ধ-বাসরে অনুজ সাহিত্যিকবৃন্দ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন সেখানে গিয়ে দেখি এক শিল্পী শরৎদার পূর্ণাবয়ব মূর্তি তৈরি করে রেখেছেন—শরৎদা বসে বসে গড়গড়া টানছেন। দেখে আর ফেরাতে পারিনি।

এই ঘটনার বহুদিন পর শরৎচন্দ্রের পল্লী তখন পানিত্রাস থেকে আমন্ত্রণ এলো –সেখানকার ছেলেমেয়েরা শরৎচন্দ্রের গৃহে একটি সব পেয়েছির আসর প্রতিষ্ঠা করবে। সেই আসরের নামকরণ করা

হয়েছে "শরৎচন্দ্র সব পেয়েছিল আসর।"

এর চাইতে আনন্দের সংবাদ আমার কাছে আর কি হতে পারে? বেঁচে থাকতে নানাভাবে তাঁর স্নেহ লাভ করে ধন্য হয়েছি। আজ যদি তাঁর পল্লীভবনে একটি আসর গড়ে ওঠে—তা হলে যিনি সেই আসরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন। আরও সংবাদ পাওয়া গেল যে, শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব ও আসরের প্রতিষ্ঠা-উৎসব একই দিনে সম্পন্ন করা হবে।

যথাসময়ে ছেলেরা এসে আমায় পানিত্রাসে শরৎদার গৃহে নিয়ে হাজির করল। বাড়ীর সামনেই একটি পুকুর। দেখে মনে হল, এরই জলে বোধ করি "কার্তিক-গণেশ" এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেপরোয়া রাম এক্ষুণি ভোলাকে নিয়ে এই নিয়ে এই ঘটনায় এসে হাজির হবে। সামনে একটা পেয়ারা গাছ। এই পেয়ারা গাছে উঠেই কি রাম নারায়ণীর দজ্জাল মাকে পেয়ারা ছুঁড়ে মেরেছিল? মনে মনে আশা জাগল, বাড়ীর ভেতরে ঢুকলেই বোধ করি অনেকের সঙ্গে দেখা হবে।

শরৎদা যে ঘরে বসে লিখতেন—ছেলেরা সেই ঘর আমায় দেখালো। শরৎচন্দ্র যেভাবে ঘরখানি ব্যবহার করতেন ঠিক সেই রকম ভাবেই সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

একটু দূরে নদীর ধারে শরৎচন্দ্রের ও তাঁর সন্ন্যাসী ভাইয়ের চিতা-ভস্ম রাখা হয়েছে। দুটি ছোট স্তম্ভ নির্মাণ করা আছে। মর্মর প্রস্তরে খোদিত আছে জন্ম মৃত্যু সন তারিখ।

সেদিনকার উৎসবে প্রচুর জনসমাগম দেখে বুঝতে পারলাম, এই পল্লী অঞ্চলে আমাদের শরৎদা কতখানি জনপ্রিয় ছিলেন। শহরের লোকের মুখে তারা তাদের দা'ঠাকুরের কথা ভালো করে শুনতে চায়। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই উৎসবে যোগদান করতে কলকাতা থেকে গিয়েছিলেন। ইনি বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষের

পুত্র। একদিন এঁরই প্রতিষ্ঠিত মাসিক কাগজ বঙ্গবাসীতে শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী" ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হ'ত। সেদিন বাংলা দেশে সে কী উত্তেজনা।

অনুষ্ঠানের পর উমাপ্রসাদ ও আমাকে আমাদের পূজনীয় বৌ-ঠাকুরুণ হিরন্ময়ী দেবী (শরৎচন্দ্রের সহধর্মিণী) ওপরে দোতলায় ডেকে পাঠালেন।

প্রচুর জলখাবারের আয়োজন। তিনি কাছে বসে নানা কথা বলে আমাদের খাওয়ালেন। শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্রের স্নেহ প্রীতি-মমতার কথা নতুন করে মনে পড়ায় আমাদের চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠল।

আসবার সময় নীরবে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে এলাম।

মনে মনে প্রশ্ন জাগল, আমাদের এই প্রণাম শরৎচন্দ্রের কাছেও পৌছুবে ত?

শরৎচন্দ্র

নলিনীকান্ত সরকার

রেডিওতে আমরা স্বনামধন্য কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিবস পালন করতাম।

অনুষ্ঠানটির নাম ছিল 'শরৎ শর্বরী'। বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন।

একবার 'শরৎ শর্বরীর' অধিবেশনে নিমন্ত্রিত হয়ে দাদাঠাকুর কলকাতা বেতার কেন্দ্রে শুভাগমন করেছেন। প্রোগ্রাম আরম্ভ হবার পূর্ব্বে সমবেত সাহিত্যিকরা দুই শরৎচন্দ্রকে—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র (দাদাঠাকুর) নিয়ে রসালাপ চালিয়েছেন। দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দাদা সম্বোধন করছেন দেখে একজন সাহিত্যিক দাদাঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—'আচ্ছা আপনাদের মধ্যে কে বড়।

উত্তর দিলেন কথাসাহিত্যিক শরৎ—'আমি'।

দাদাঠাকুরের চেয়ে শরৎচন্দ্র প্রায় পাঁচ বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন কিন্তু শরৎচন্দ্র সে কথা জানতেন না, বা সে দিকটার কথা তিনি ভাববার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

শরৎচন্দ্রের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—একটুখানি খোঁচা মেরে দাদাঠাকুরের ভিতর থেকে কিছু রস নিষ্কাশন করা। সে উদ্দেশ্য তাঁর সফল হয়েছিল।

পরে বলছি।

শরৎচন্দ্রের এই বেতার অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেছিলেন জলধর সেন মহাশয়।

রাধারাণী দেবী, নরেন্দ্র দেব, নাটোরাধিপতি যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর, অঘোর অধিকারী প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কয়েকজন বক্তার ভাষণের পর ঘোষিত হলো দাদাঠাকুরের নাম। ঘোষকে বলিলেন—'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মদিনে এবার শরৎচন্দ্র পণ্ডিত কিছু বলিবেন।

দাদাঠাকুর দাঁড়ালেন মাইক্রোফোনের সামনে। তখনকার কালের বেতার অনুষ্ঠানে বক্তাদের বক্তব্য বিষয়ে পাণ্ডুলিপি অনুমোদনের জন্য বেতার কর্তৃপক্ষের কাছে পূর্বাহ্ণে পেশ করতে হতো না। এ অনুষ্ঠানে বক্তারা ভাষণই দিয়েছিলেন, লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন নি।

. দাদা ঠাকুর ঘোষকের ব্যাখ্যাটিকে অবলম্বন করে তাঁর ভাষণ শুরু করলেন।

আমারও নাম শরৎ। ওঁর নামও শরৎ উনি দেশের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। নামের মিল হলেই হয় না—কালি তিন রকমের। মা কালী, দোয়াতের কালি, আমার জুতোর কালি। ভক্তেরা মা কালীর পুজো করে, স্বরস্বতী পুজার দিনে দোয়াতের কালি ফুল দূর্বা পায়। কিন্তু জুতোর কালি পরের পদশোভা বর্ধনেই তার আনন্দ। আমাদের দুই শরতের ব্যবধান বিপুল। তবু তিনি আমাদের নিকটতম আত্মজন, তাই জন্মদিনে তাঁকে অভিনন্দিত করার জন্য আমরা সমবেত হয়েছি।

এই ভূমিকাটুকু করে দাদাঠাকুর বললেন, একটু আগে শরৎদা কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন, তিনি আমার চেয়ে বড়। এ কথার একটা প্রতিবাদ করা উচিত। হলেনই বা তিনি আমার বয়োঃজ্যেষ্ঠ, হলেনই বা তিনি দেশের ও দশের মধ্যে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, তাঁকে দেশশুদ্ধ লোক বড় মানলেও তিনি নিতান্ত ছোট।

ইতিপূর্বে একজন বক্তা একটা বেফাঁস কথা বলে শরৎচন্দ্রের

বিরক্তি উৎপাদন করেছিলেন। আবার দাদাঠাকুর এমন সুর ভাঁজতে সুরু করলেন যাতে বেতার কর্মীরা এবং উপস্থিত সাহিত্যিক-বৃন্দ একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

দাদাঠাকুর বলে চললেন, আমি আজ প্রমাণ করে দেবো—শরৎদা ছোট তো বটেই –সবার চেয়ে ছোট। একটা গল্প বলি: একদিন নারদ বৈকুণ্ঠে গিয়া নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করলেন সবচেয়ে বড় কে? নারায়ণ উত্তর দিলেন, 'সবচেয়ে ছোট আমি আর নারদ তুমি সবার চেয়ে বড়। এই জল-স্থল-অন্তরীক্ষে আমি সবার স্রষ্টা এবং এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা আমি। সুতরাং তোমার মনে হতে পারে আমি বড় কিন্তু তুমি আমার চেয়েও বড়। কারণ তোমার হৃদয়ে আমার স্থান। আগের বড় হতে পারে না। ভক্তের হৃদয়ে আমার আসন সেখানে আমি ছোট বৈকি?

শরৎচন্দ্রের দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দাদাঠাকুর বললেন—অগণিত ভক্তের হৃদয়ে শরৎদার আসন, আজ সেখানে তিনি তো নারায়ণের নজির—একথা মানতেই হবে।

তারপর শরৎচন্দ্র দাদাঠাকুরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

একটি মহৎ জীবন

—খগেন্দ্রনাথ মিত্র

শরৎচন্দ্র জীবদ্দশায় যে সমাদর, সম্মান খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে। বাঙ্গালী নরনারীদের হৃদয়াসনে তিনি রাজ সম্মান পাইয়া গিয়াছেন। তরুণদিগের মনে তিনি একাধিপত্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। তরুণ, অ-তরুণ সকলেই তাঁহাকে অসামান্য প্রতিভার অধিকারী বলিয়া একবাক্যে স্বীকার করিয়াছে। অবশ্য প্রতিকূল সমালোচনা যে তার ভাগ্যে জুটে নাই তাহা নহে। সাহিত্যে যাঁহারা প্রাচীন, যাঁহারা পুরাতনের পক্ষপাতী এবং আদর্শবাদী, তাঁহারা শরৎচন্দ্রকে ভাল চোখে দেখিতেন না। নূতনের প্লাবনে সমাজতন্ত্রে নিমজ্জমান বলিয়া যাঁহারা সন্ত্রস্ত হইতেন, তাঁহারা যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবে শঙ্কান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন একথা সত্য। কিন্তু শরৎচন্দ্রের যশ এই প্রতিকূল সমালোচনা বা আশঙ্কা-প্রণোদিত আচরণে ম্লান হয় নাই একথাও সত্য।

শরৎচন্দ্র এ বিষয়ে উদাসীনতা অবলম্বন করিলেও, কখনও কখনও ইহাতে একটুখানি উত্তেজিত না হইতেন, তাহা বলা যায় না। একবার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা সম্বর্ধনা করিবার জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিল, তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার ভার আমার প্রতি ন্যস্ত হইয়াছিল। আমি অবশ্য তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান অকুণ্ঠিতভাবে দিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি যখন বক্তৃতা করিতে উঠিলেন, তখন শুধু প্রতিকূল সমালোচনার কথাই বলিলেন। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার মনে আছে। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার লেখা কুরুচি দোষে দুষ্ট, ইহা কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু

তাঁরা যা' কুরুচি-পূর্ণ মনে করেন, সকলেই যে তা' মনে করবে এমন নাও হতে পারে। আবার এমনও কি হতে পারে না যে আজ কারও কারও কাছে শ্রুতিকটু থাকবে না?" এইরূপ ভাবের অনেক কথা তিনি সেদিন এবং আরও অনেকদিন বলিয়াছেন। আমার ইহাতে মনে হইয়াছে যে আঘাতের বেদনা হইতে তিনি তাঁহার চিত্তকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ তাঁহার মন-সংসারের নিষ্পেষণে কঠিন হইয়া যায় নাই এবং তাহার জীবনের ঘটনা এবং তাঁহার আচরণ হইতে এমন অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে তাঁহার হৃদয় কোমল ছিল, পরদুঃখে কাতর হইয়া পড়িতেন এবং সামান্য আঘাত করিলেও সে ব্যথা তাঁহাকে সহজেই পীড়া দান করিত।

তাঁহার লেখা পড়িলে বুঝা যায় যে, তাঁহার অনুভূতি শুধু সূক্ষ্ম ছিল না, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিও ছিল অতি প্রখর। তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে চরিত্র সৃষ্টি ও ঘটনার পরিস্থিতি এমন স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত হইয়াছে যে, মনে হয় শরৎচন্দ্র যেন অসামান্য অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারী ভাণ্ডারী ছিলেন। এই অভিজ্ঞতা তাঁহার শ্রমলব্ধ সাধনার ফল বা তাঁহার ইনটুইশান, তাহা আমরা বলতে পারি না। ঘটনার পর ঘটনা তাঁহার লেখনী সাজাইয়া চলিয়াছে—প্রত্যেকটি যেন প্রত্যক্ষের বিষয়, যেন বায়োস্কোপের ছবি। এই অসামান্য শক্তি তিনি কিরূপে লাভ করিলেন? কেহ কেহ বলেন যে, শরৎচন্দ্র যৌবনে বহু অধ্যায়ন করিয়াছিলেন, অক্লান্ত সহকারে জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। আমাদের নিকট সে সকল অবশ্য নেপথ্য ভাগে। আমরা তাঁহাকে পরিশ্রমশীল সাধক হিসাবে দেখি নাই—আমরা তাঁহাকে পাইয়াছি বীণাপাণির বরের মত, প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত উৎসবের মত।

তিনি সাহিত্যের আসরে যে দিন আসিলেন, সেইদিনই যেন সুর জমিয়া গেল। যাঁহারা সুরজ্ঞ, তাঁরাই বলিবেন, সুর থাকিলেই হয় না, সুর লাগাইতে পারা বহু ভাগ্যের কথা। একবার যদি সুর লাগে

তাহা হইলে আনন্দের অফুরন্ত ঝর্ণাধারা আপনা হইতে উথলিয়া উঠে। শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে এই কথাটি খাটে! শরৎচন্দ্র সু-বক্তা ছিলেন না, তাঁহার ব্যক্তিত্বও প্রথমে কিছু ছিল না। কিন্তু উপহাস সাহিত্যে তিনি এমনই এক গ্রামে সুর ধরিলেন যে, অচিরে বাঙ্গলা-দেশে মাতাইয়া তুলিলেন।

শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব শান্ত ধরনের ছিল। যাঁহারা সেই চুম্বকের সম্মুখে আসিতেন কেবল তাঁহারাই আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেন। এইরূপে তিনি তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের পরম প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবহারে আড়ম্বরপূর্ণ সৌজন্যের বিকাশ ছিল না কিন্তু তাঁহার এমন একটি স্বভাব সুলভ মাধুর্য্য ছিল, যাহা অল্প পরিচয়েই সমস্ত দ্বিধা-সঙ্কোচ ঘুচাইয়া দিত।

তাঁহার স্বভাবজাত 'উদারতা সম্বন্ধে আমার একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। আমি গত বৎসর বিলাত হইতে যেদিন বোম্বাই-এ পৌঁছিলাম, সেই দিন আমার এক বন্ধু আমাকে একখানি সংবাদপত্র দেখাইলেন তাহাতে দেখিলাম যে শরৎবাবু ঢাকায় এক সভায় আমাকে লক্ষ্য করিয়া কতকগুলি অপ্রিয় ভাষণ করিয়াছেন। তিনি সে সভায় বলিয়াছেন যে তাঁহার 'মহেশ' গল্পটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তক হইতে হঠাৎ বাদ দেওয়া হইয়াছে। কারণ তাহাতে হিন্দুয়ানির বিরোধী ঘটনা অর্থাৎ গো-হত্যা বর্ণিত হইয়াছে, আর সেই স্থলে হিন্দুভাবাশ্রিত গল্প দেওয়া হইয়াছে। আমি ইহা পড়িয়া ভাবিলাম, হয়তো আমার কোন হিতৈষী. বন্ধু তাঁকে এই মূল্যবান তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়া দিয়েছেন। সত্য প্রকাশিত হইলে শরৎবাবু তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। তাহার পরে কলকাতায় এক সভায় আমাকে অভিনন্দিত করা হইল। শরৎচন্দ্র, জলধর সেন প্রভৃতি অনেকে সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল—"ছোট গল্প"। আমাকে কিছু বলিবার অনুরোধ করিলে আমি প্রসঙ্গক্রমে মহেশের

কথা তুলিলাম, গল্পটির প্রশংসাই করিলাম। তখন শরৎচন্দ্র মহেশের
কথা তুলিলাম, গল্পটির প্রশংসাই করিলাম। তখন শরৎচন্দ্র বলিলেন "আমার ধারণা ছিল, 'মহেশের' সম্বন্ধে আপনার অভিমত অন্যরূপ।" তখন আমি বুঝাইয়া দিলাম যে, 'মহেশ' অনেকদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে বলিয়া তাহার স্থলে বৃহত্তর গল্প রামের সুমতি' দেওয়া হইয়াছে। এরূপ পরিবর্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারেই এবং বোর্ডের নির্দেশক্রমেই হইয়া থাকে। ব্যক্তি বিশেষের রুচির উপর নির্ভর করে না। এই নিয়মানুসারে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প 'কাবুলিওয়ালা' বাদ পড়িয়াছে। 'মহেশ' বাদ দিয়া আমার 'প্রেমের ঠাকুর' দেওয়া হইয়াছে, এ কথা একেবারেই ভিত্তিহীন; কেন না উভয় গল্প প্রায় ছয় সাত বর্ষাকাল পাশাপাশি পাঠ্যপুস্তকে স্থান পাইয়াছে। ইত্যাদি।

এই সব শুনিবার পর শরৎবাবু কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। পরে আমাকে অত্যন্ত সহজ সুরে বলিলেন, "আমার ভুল হইয়াছে। কিছু কিছু মনে করিবেন না।"

আমার মনে হইল, যে চিন্তা প্রণালীর দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ঐ সকল কথা বলিয়াছিলেন, তিনি তাহাই আরার স্মৃতিপথে আনিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল এমন নির্দোষ সরলতায় পূর্ণ হইল যে আমি বুঝিলাম, ঐ সকল উক্তির জন্য তাঁহার এতটুকু দায়িত্বও ছিল না। পরদিন সংবাদপত্রে এই সভার বিবরণ সূত্রে অনেকেই ইহা দেখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ সত্যনিষ্ঠা এই অনিচ্ছাকৃত বাধাকে তুচ্ছ করিয়া কিরূপে স্বপ্রতিষ্ঠ হইল তাহাই আজ শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সহিত স্মরণ করিতেছি।

তাঁহার পরিহাসপ্রিয়তাও ছিল অসাধারণ। তিনি অল্প লোকের মধ্যে বসিয়া অল্প সময় মধ্যে এমন গল্প জমাইয়া তুলিতে পারিতেন যে আমার আর একজন বন্ধুকে মনে পড়িত, তিনিও দুষ্ট ক্ষত রোগে অল্প

বয়সেই ইহধাম পরিত্যাগ করেন আমি কবি রজনীকান্ত সেনের কথা বলিতেছি। তাঁহার সঙ্গ করিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। এমন সুরসিক, মজালসী বন্ধু জীবনে অধিক দেখি নাই। শরৎচন্দ্র এবং রজনীকান্ত এই যে স্বচ্ছরসের স্রোত বহাইতে পারিতেন, ইহা তাঁহাদিগের পুলকোচ্ছল মনের উদারতার জন্য, যে উদারতায় সমস্ত জগৎ-সংসার সমস্ত স্থাবর জঙ্গল—সকলই আনন্দের তড়িৎসঞ্চারে, রসময়, হাস্যময়, শোভাময় হইয়া ফুটিয়া উঠে।

শরৎচন্দ্র

—সুকুমার সেন

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় যখন ইস্কুলে পড়ি। শরৎচন্দ্র সেই মাত্র আত্মপ্রকাশ করেছেন। থার্ড ক্লাসে কি সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি। অন্য ইস্কুল থেকে এক নতুন সহপাঠি এলেন। এর সঙ্গে সৌহার্দ্র্য হল। একদিন এঁদের বাড়ী গিয়ে দেখলুম অনেক মাসিক পত্র নেওয়া হয়। তার মধ্যে কতকগুলি নাম পর্য্যন্ত আমার অজানা ছিল। ইস্কুলে ভর্ত্তি হবার আগে থেকেই আমি বেজায় গল্পখোর। ইস্কুলে ঢুকে সে নেশা বাড়ল বই কমল না। তখনকার দিনে নতুন নতুন গল্প উপন্যাস টাট্‌কা পড়তে গেলে মাসিক পত্রের দ্বারস্থ হতে হত। ভারতী, সাহিত্য ও প্রবাসী এই তিনটি কাগজ নিয়মিতভাবে পড়তুম। পরে অবশ্য এই লিষ্টে ভারতবর্ষ, মানসী, সবুজপত্র যোগ হয়েছিল। সহপাঠি বন্ধুর ঘরে দেখলুম গল্প-লহরী, মালঞ্চ, যমুনা ইত্যাদি ইত্যাদি। রীতিমত ভোজের আয়োজন। বন্ধুর অনুগ্রহে এ ভোজ থেকে বঞ্চিত হলুম না। যমুনায় পেলুম রামের সুমতি, পথনির্দেশ, পরিণীতা ইত্যাদি গল্প। পড়ে চমকিত হলুম। লেখকের নাম তো অপরিচিত। এতদিন ইনি ছিলেন কোথায়?

যে বয়সে শরৎচন্দ্রের লেখা সবচেয়ে অভিভূত করতে পারে ঠিক সেই বয়সেই এঁর লেখা আমি প্রথম পড়েছিলুম। তখনি বুঝেছিলুম যে, ইনি গল্প লিখতে পারেন বটে। তারপরে ভারতবর্ষে ও অন্য পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের লেখা পড়ে গেছি। বেশ ভালোও লাগত কিন্তু

এই কৈশোরের প্রথম ভাল লাগার মত লাগেনি। এখন একথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই।

শরৎচন্দ্র পাকা গল্প লিখিয়ে। একদা আমাদের দেশে গল্প বলা একটা শিক্ষাকর্মের মত ছিল। সেথায় সে কাজে সিদ্ধকাম হলেন শরৎচন্দ্র। এইটাই এঁর সাহিত্য-কীর্তির প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বলে আমি মনে করি। যেমন শরৎচন্দ্র গল্প বলার অবকাশ পেয়েছেন সেখানে তিনি স্বচ্ছন্দবিহারী আর যেখানে তত্ত্বকথা বলতে গেছেন সেখানে গল্পের খেই হারিয়ে যেন দিশেহারা হয়ে ঘুরেছেন। এ দোষ গুণের কথা নয়। শরৎচন্দ্র তত্ত্বকথা বলতে গেছেন ইচ্ছা করেই।

বাঙ্গালী চিরকিশোরের জাত। চির কিশোর শরৎচন্দ্র গল্পরস যুগে যুগে পান করবে।

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে অগণিত গ্রন্থ ও সংকলন গ্রন্থ রয়েছে; তবুও তারই মিছিলে আমরা একটি সংকল গ্রন্থ পাঠক সাধারণের কাছে নিবেদন করলাম।

প্রশ্ন উঠতে পারে, নানাভাবে, নানাদিক নিয়ে, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে স্মৃতিমাল্য গ্রন্থ কেন? প্রশ্নটা বিবেচনার বিষয় হলেও এইটুকু নিবেদন করলে অন্যায় হবে না, ইতিপূর্বে প্রকাশিত সংকলন গ্রন্থগুলির মধ্যে এই গ্রন্থটির স্বাদ ও বিষয় বৈচিত্র ভিন্নতর। বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল পাঠক মাত্রেই এ গ্রন্থের লেখক ও লেখার তালিকায় তার দৃষ্টান্ত সহজেই পাবেন।

এই সংকলন যাঁদের লেখা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে সংগৃহীত করা হয়েছে তার উল্লেখ আমরা প্রতিটি লেখার সঙ্গে কৃতজ্ঞ চিত্তে উল্লেখ করছি।

মাসিক ভারতবর্ষ, মাসিক প্রবাসী, সাপ্তাহিক বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকার নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। পত্র-পত্রিকা ও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক গ্রন্থ সমূহ থেকেও এই সংকলনে কিছু রচনা স্থান পেয়েছে। এই সুযোগে প্রত্যেকের কাছেই আমরা চিরঋণী হয়ে রইলাম।

ইতি পূর্বে আমার সম্পাদনায় "সুভাষ স্মৃতি মাল্য" প্রকাশিত হ'য়েছে সেই কারণে সংকলন গ্রন্থের সমতা বজায় রাখার জন্য গ্রন্থের নাম "রবীন্দ্র স্মৃতি মাল্য" রাখা হল। এই সংকলন গ্রন্থে শ্রীমতী জয়শ্রী নাগ আমাকে সাহায্য করেছেন এই জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা
২৪শে, বৈশাখ ১৩৮৩

বিনীত—
শ্রীসুজিত কুমার নাগ

সূচীপত্র

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রথম পরিচয়	৫
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	ফিরে ফিরে চাই	১৩
অন্নদাশঙ্কর রায়	রবীন্দ্রনাথ আমি	২২
প্রিয়তোষ ভট্টাচার্য	রবীন্দ্র কাব্যের শেষ পর্ব	২৭
জয়শ্রী দে	কবির গ্রাম বাংলা ও স্বদেশ প্রেম	৪২
রাসবিহারী ভট্টাচার্য	রবীন্দ্রনাথের শেষ সপ্তক এ প্রেমানুভূতি	৪৫
জয়দেব রায়	রবীন্দ্র সঙ্গীতের ধারা	৫৫
ডঃ দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথের ভগ্ন হৃদয় গ্রন্থে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব	৬২
গোপাল ভট্টাচার্য	রবীন্দ্র প্রতিভা	৭৯
নরেন্দ্র দেব	কবিগুরুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়	৮২
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য	রাখীবন্ধন ও রবীন্দ্রনাথ	৮৬
অখিল নিয়োগী	রবীন্দ্র সকাশে	৯২
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ও একালের পাঠক	১০৭
সতী কুমার নাগ	কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ	১১৩
সুজিত কুমার নাগ	দুই ধারায় একমন	১১৬
সুধাংশু বিমল বড়ুয়া	বিশ্ব ভারতী ও বৌদ্ধ ভাবধারা	১২৩

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ যখন বয়স সত্তর পার হয়ে গিয়েছে, যখন আমার বাইরের পৃথিবী স্তিমিত হয়ে আসছে, বহু চেনা মুখ, জানা জিনিষ চোখের সামনে থেকে মুছে গিয়েছে, তখন বাইরের শূন্যতা এসে মনের ভিতরটা জুড়ে বসেছে। ঘর-খানায় সঞ্চয় করা, কিনে-কেটে আহরণ করা কোন সামগ্রীই নাই।

হারিয়ে যাওয়া চেনা মুখ, আর জানা জিনিষগুলি মনের ভিতর জ্বলছে স্মৃতির প্রদীপ হয়ে। সেই সারি সারি দীপমালার মধ্যে শ্রদ্ধার মণি দীপদণ্ডের মাথায় যে দীপগুলি জ্বলছে তার মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল হল মহাকবির স্মৃতি তাঁকে দেখেছিলাম, তাঁর সংগে পরিচিত হয়েছিলাম। তাঁর স্নেহলাভ করেছিলাম এ আমার জীবনের শ্লাঘ্যতম স্মৃতিদীপ হিসাবে অনির্বাণ রয়েছে।

মহাকবির জন্ম যে সময়ে, সেই সমসাময়িক কালেই আমার পিতারও জন্ম হয়েছিল। মহাকবি আমার বাড়ীর অনতি দূরে, দশ ক্রোশের মধ্যেই, শান্তিনিকেতনে তখন তাঁর সাধনার সাধনপীঠ স্থাপন করেছেন। পৌষ মেলার উৎসবে লাভপুর থেকে ছেলেবেলাতেই গিয়েছি শান্তিনিকেতনে। সেখানে অসংখ্য মানুষের সংগে তাঁকেও নিশ্চয় দেখে থাকব। কিন্তু তখন তাঁকে চিনতে পরিনি।

কিশোর পুত্র যেমন করে পিতার স্নেহচ্ছায় মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায়, আশ্রয় নেয়, আশ্বাস পায় তেমনি করেই সেদিন তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারতাম, কিন্তু সে সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয়নি। তাদের মহানগরের সভ্যতা ও আভিজাত্যের সঙ্গে আমাদের গ্রাম্য গৃহস্থ বংশের অনেক পার্থক্য ছিল।

তারপর অনেক কাল পার হয়ে গিয়েছে, প্রথম যৌবন তখন। দেশসেবা করি আর সাহিত্যচর্চা করি। সাহিত্যিক হইনি তখনও। সহিত্যের নেপথ্যলোক আর প্রাকাশ্য রঙ্গমঞ্চের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে আছি। নেপথ্যলোকও তখন আর নেই অথচ সাহিত্যের প্রশস্ত মঞ্চেও তখনও পর্যন্ত অবতীর্ণ হইনি। সেই সময় সাক্ষাৎ ঘটল। স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের উদ্যোগে মহাকবি বীরভূমে পল্লীকর্মী ও সেবকদের সঙ্গে এক সাক্ষাতে মিলিত হলেন।

সেদিন আমি সকলের মুখপাত্র হয়ে কথা বলেছিলাম, সেদিন কবির সন্নিধ্যে গিয়ে সচেতনভাবে চিনলাম মহাকবিকে। আমি চিনলাম, কিন্তু তিনি সাহিত্যিক আমাকে চেনেন নি। কাজেই আমাকে তার মনে রাখবার কথা নয় তবে সামান্য উল্লেখেই যিনি স্মরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তারও বেশ কিছুকাল পর। তখন সাহিত্যিক স্বীকৃতিলাভ করেছি। তখন একাধিক গ্রন্থের গ্রন্থকর্তা আমি। উপন্যাস 'রাইকমল' আর গল্প-সংকলন 'জলনাময়ী' প্রকাশিত হয়েছে। বই দু'খানি অনেক সংখ্যা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ডাকযোগে পাঠিয়ে দিলাম তাঁর কাছে। সাত দিনের মাথায় উত্তর এসে গেল। সে পত্রে মত অকুণ্ঠ প্রশংসা সস্নেহ তার তুলনা হয় না। পত্রখানি বিধাতার আশীর্বাদের মত শিরোধার্য করে নিয়েছি। এই সময় তার সঙ্গে সাহিত্যিক হিসেবে সাক্ষাৎ করতে যাব কিনা তাই নিয়ে মনে মনে ইতস্ততঃ করছি। এই অবসরে আমার কিশোর পুত্র আমাকে না জানিয়ে আমার অজ্ঞাতেই তাকে প্রণাম করতে গেল।

তার কাছেই শুনেছি—সেদিন তারিখ ২রা চৈত্র। মধ্যাহ্নের সময় সে যখন মহাকবির কাছে গিয়ে পৌছুল তখন অবারিত কাঁচের জানলা দিয়ে হু হু করে গরম বাতাস এসে একখানা পত্রিকার পাতা ক্রমাগত উড়িয়ে চলেছে। পত্রিকাখানি সে মাসের প্রবাসী। সেই প্রবাসীতে আমার 'অগ্রদানী' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে। আমার ছেলে ঘরে কবারচু

পূর্ব মুহূর্তেই তিনি সেই গল্পটি পড়া শেষ করেছেন। পিতামহ যেমন করে পৌত্রকে সকৌতুক ও সস্নেহ সমাদর করেন তেমনিভাবে তাকে গ্রহণ করে তার সঙ্গে আলাপ করলেন মহাকবি। 'অগ্রদানী' গল্পটি তাঁর বিশেষ ভাল লেগেছে, আমার লেখা তাঁর খুব ভাল লেগেছে— একথা বার বার তাকে জানিয়ে তারই মারফৎ তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য বলে পাঠালেন।

সে আহ্বান উপেক্ষা করে এমন সাধ্য কি ? গেলাম। সাহিত্যিক হিসাবেই পেলাম। এ কিশোর পল্লীবাসীর সাক্ষাৎ নয়, যুবক কর্মীর সাক্ষাৎ নয়, এ সাহিত্যিক। সাক্ষাৎ পেলাম শান্তিনিকেতন।

চৈত্রের দুপুর। বীরভূমের উত্তাপ। আমি পান্থনিবাসের উত্তর দিকের ঘরের জানালার ভিতর দিয়ে পথের দিকে চেয়ে রয়েছি। দেখলাম একখানা গামছা মাথায় দিয়ে সুধীনবাবু আসছেন। কবি তখন তাঁর নতুন বাসগৃহে 'পুনশ্চ'তে থাকতেন। সুধীনবাবু এসেছেন আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে।

ঘরের দরজায় এসে বুক গুড়গুড় করে উঠল। থমকে দাঁড়িয়েগেলাম সুধীনবাবু ভিতরে ঢুকেই আবার পর্দা সরিয়ে ইশারা করলেন -আসুন।

ঢুকলাম। একটা মোড় ফিরেই একখানা ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াতেই দেখলাম—প্রশস্ত, সৌম, স্বর্ণকান্তি দীর্ঘকায় কবির উজ্জ্বল দৃষ্টির সম্মুখেই আসি। কবির সামনে টেবিলের উপর লেখা কাগজ, হাতে কলম, কাগজের ও পাশে একটি পাথরের পাত্রে পূর্ণপাত্র গোলাপফুল ও পাশে খোলা জানলার ওধারে বিস্তির্ণ মুক্ত লালমাটির প্রান্তর দুপুরের রোদ ঝলসে যাচ্ছে ; পাতা উড়ছে চৈতালী হাওয়ায়, কয়েকটি গাছে নতুন পাতার সমারোহ। উত্তপ্ত বাতাসে ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। আমি তাঁকে ভালো করে দেখবার অবকাশ পেলাম না। চকিত হয়ে উঠলাম তাঁর প্রশ্নে।

দৃষ্টিতে তাঁর প্রশ্ন ফুটে উঠেছে। বললেন—একি! তোমার মুখ তো আমার চেনা মুখ। কোথায় দেখেছি তোমাকে?

আমি হতভম্ব হলাম।

তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—কোথায় দেখেছি তোমাকে?

পূর্বে যে সাক্ষাতের উল্লেখ করেছি তার কথা তখন আমার স্মরণে আসেনি। আমি নিজেকে সংযত করে বললাম—আমার বাড়ী তো এ দেশেই। হয়তো বোলপুরে দেখে থাকবেন। বোলপুরে কয়েকবার আপনাকে দেখেছি। প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে।

তিনি তখনও স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে।

বোলপুর ষ্টেশনে এমনি সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখেছিলাম নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে। এমনি স্মৃতিমন্থন করা, প্রশ্ন ভরা সন্ধানী দৃষ্টি।

আমার কথায় কবি ঘাড় নেড়ে বললেন—না না। তোমাকে যে আমি আমার সামনে বসে কথা বলতে দেখেছি মনে হচ্ছে।

মুহূর্তে পুরনো কথা আমার মনে পড়ে গেল। বছর-পাঁচেক আগে ১৯০৩ সালে সমাজ-সেবক কর্মীদের সঙ্গে কবি দেখা করেছিলেন। আমি ছিলাম কর্মীদের মুখপাত্র। আমিই কথা বলেছিলাম। কবি কে সেই কথা বলেছিলাম। কবি কি সেই কথা বলছেন? সেই অল্পক্ষণে স্মৃতি কি তাঁর মনে আছে?

আমি সংকোচে সেই কথা নিবেদন করলাম।

তিনি বার কয়েক ঘাড় নাড়লেন। তারপর বললেন—হ্যাঁ! মনে পড়েছে তুমি ছিলে কর্মীদের মুখপাত্র। ঠিক আমার সামনে বসেছিলে তুমি। বস তুমি বস।

একটা মোড়ায় বসলাম।

আরম্ভ হল কথা। আমার সকল প্রশ্ন মূক হয়ে গিয়েছিল। তিনিই প্রশ্ন শুরু করলেন।

—কি করব?

বললাম—করার মতো কিছুতেই মন বসে নি। চাকরিতেও না

বিষয় কর্মও না। কিছুদিন দেশের কাজ করেছি—

—অর্থাৎ জেল খেটেছ ?

হ্যাঁ।

—ও পাঁক থেকে ছাড়ান পেয়েছ ?

—জানি না। তবে এখন ভাবি পেয়েছি।

—সেইটে সত্যি হোক। তা হলে তোমার হবে। তুমি দেখেছ অনেক। এত দেখলে কি করে ?

—কিছুদিন সমাজ সেবার কাজ করেছি। আর কিছুদিন বিষয় কর্ম করেছি, সামান্য কিছু জমিদারী আছে। ওই দুই উপলক্ষে গাঁয়ে গাঁয়ে অনেক ঘুরেছি, লোকের সঙ্গে অনেক মিশেছি। কারবারও করেছি।

—সেটা সত্য হয়েছে তোমার। তুমি গাঁয়ের কথা লিখেছ। খুব ঠিক ঠিক লিখেছ। আর বড় কথা গল্প হয়েছে। তোমার মত গাঁয়ের মানুষের কথা আগে আমি পড়িনি।

তারপর হেসে বললেন—ওবে একথায় শুরু আমিই প্রথম করেছি। আমি যখন বাংলা দেশের গাঁয়ের ঘাটের কথা লিখি তখন বাংলা সাহিত্যে রাজপুতনার রাজত্ব চলছে।

আবার বললেন—তুমি দেখেছো। আমি তো দেখবার সুযোগ পাই নি, তোমরা আমাকে দেখতে দাওনি। আমাদের তো পতিত করে রেখেছিলে তোমরা।

আমি মাথা হেঁট করে রইলাম।

আবার বললেন—দেখবে, দু'চোখ ভরে দেখবে। দূরে দাঁড়িয়ে নয়। কাছে গিয়ে পাশে বসে তাদের একজন হয়ে যাবে। সে শক্তি এবং শিক্ষা তোমার কাছে।

এবার আমি চললাম—পোস্টমাস্টারের পোস্টমাস্টার, রতন, ফটিক ছিদাম রুই, দুখীরাম রুই, এদের কথা—

ওদের দেখেছি। পোস্টমাস্টারটি আমার বজরায় এসে বসে থাকত। ফটিককে দেখেছি আমার ঘাটে। ছিদামদের দেখেছি আমাদের

কাছারীতে। এই সারা কাছে এসেছে, তাদের কতকটা দেখছি কতটা বানিয়ে নিয়েছি।

—এর পরই কথা উঠল লাভপুরের।

সেখান থেকে কেমন করে যেন কথাটার মোড় ফিরে গেল সাহিত্য-সমালোচনার প্রসঙ্গের দিকে। আমার কলমের স্থূলতার অপবাদের কথা উঠল। হঠাৎ যেন রক্তোচ্ছ্বাসে মুখখানি ভরে উঠল।

বললেন—ও দুঃখ পাবে। পেতে হবে। যত উঠবে তত আমাকে ক্ষত বিক্ষত করবে। এ দেশে জন্মানোর এই কঠিন ভাগ্য। আমি নিষ্ঠুর দুঃখ পেয়েছি।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন—মধ্যে মধ্যে ভগবানকে বলি, কি জান তারাশঙ্কর। বলি—ভগবান পূর্ণজন্ম যদি থাকে তবে এ দেশে যেন না জন্মাই।

আমি বিহ্বল হয়ে গেলাম। বিবেচনা করলাম না কাকে বলছি, কি বলছি। বলে উঠলাম—না না একথা আপনি বলবেন না। না না।

হাসলেন তিনি এবার। আবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—তোমার এইটুকু যেন চিরকাল বেঁচে থাক, বাঁচিয়ে রাখতে পার যেন।

আবার কথা হল—তখনকার লীগ রাজত্বে বাঙলা ভাষাকে যে আরবী-ফরাসী শব্দ যুগল করবার চেষ্টা হচ্ছিল তাই নিয়ে।

বললেন—তাই তো ভাবি যা করে গেলাম তা কি এর পরে শিলা—লিপির ভাষার মতো গবেষণার সামগ্রী হয়ে তাকে তোলা থাকবে? অনেকক্ষণ উদাসদৃষ্টিতে উত্তর দিকের রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

কোথায় যেন ডাকছিল একটা চিল।

হঠাৎ আমার দিকে ফিরে চেয়ে বললেন—তোমার "ডাইনীর বাঁশী"র চিলটার কথা মনে পড়ছে। গল্পটি খুব ভাল লেগেছে আমার।

আমি যেন আর সইতে পারছিলাম না এমন সস্নেহ সমাদরের ভার।

কথার জের টেনে তিনি বললেন—কলকাতার একজন বড় পণ্ডিত সাহিত্যিক এই গল্পটির কথা শুনে কি বললেন জান ?

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রশ্ন তুলে নীরবে চেয়ে রইলাম।

কবি বললেন—তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন শুনে। বললেন—উইচক্র্যাপট নিয়ে বাংলা গল্প ? এ নিশ্চয় ইউরোপের গল্প। ওদের দেশের গল্প পড়ে লিখেছ।

অর্থাৎ চুরি করেছি আমি।

আমি একেবারেই গ্রাম্য লোকের মত বলে উঠলাম—না না-স্বর্ণা ডাইনি যে আমাদের পাড়ায় থাকে। এখনও আছে। আমাদের কাছারী বাড়ীর সামনে পুকুরের ঈশান কোণে তার বাড়ি। আর······

এতক্ষণে একটু সংযত হয়ে সবিনয়ে বললাম—আমি তো ইংরাজীও ভাল জানি না। যেটুকুও জানি তার উপযুক্ত পড়বার বইও পাই না আমাদের দেশে। কোথায় পাব ? ওদের দেশের গল্প ত আমি বেশি পড়িনি।

কবি হেসে বললেন—আমি জানি, আমি বুঝতে পারি। তোমাকে আমি বুঝেছি। দেখবার আগেই বুঝেছি। ও কথাটা তোমাকে বললাম কেন জান ? বললাম, আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের দেশের সংগে পরিচয় কত সংকার্ণ তাই বোঝাবার জন্য। ডাইনি মানে ওঁদের কাছে উইচক্র্যাফট হলেই সে ইউরোপে ছাড়া এ দেশে কি করে হবে ? আমাদের দেশের ডাইনী এরা দেখেন নি, জানেন না, বিশ্বাস করেন না। তাই আমি তাঁদের বললুম—উঁহু, উঁহু! এ তারাশঙ্করের চোখে দেখা। আমি যে নিজে দেখতে পাচ্ছি গ্রীষ্মকালের দুপুরে তালগাছের মাথায় বসে চিলটা লম্বা ডাক ডাকছে, গলাটা তার ধুক ধুক করছে। আর নিজের ঘরের দাওয়ায় বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে স্বর্ণ ডাইনী বসে আছে আচ্ছন্নের মত। আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি। তাই তো চিলের ডাক শুনে ছবিটা চোখে ভেসে উঠল, গল্পটা মনে পড়ে গেল।

ওদিকে অপরাহ্নের আভাস ফুটে উঠল প্রান্তরের রৌদ্রকীর্ণতার মধ্যে। সেই দিকে চেয়ে রইলেন তিনি।

বললেন—এখানে চলে এস। যখন ক্লান্তি হবে এখানে চলে এস। দরজা খোলা রইলো।

আমি ইঙ্গিত বুঝলাম। প্রণাম করলাম। সুধীনবাবু এসে দাঁড়ালেন। বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। সুধীনবাবু আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন পান্থ নিবাসে।

আমি আর এক মুহূর্ত দেরী করলাম না। আমার আর ঠাঁই নেই। সব পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। চলে এলাম লাভপুর।

ফিরে ফিরে চাই

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

আজ থেকে সত্তর বছর পূর্বের কথা। বাংলাদেশে তখন ইংরেজ ও ইংরেজীয়ানার মোহ কাটেনি। মফঃস্বল শহরে আমাদের বাস—দেশ-বিদেশের খবর সরবরাহের মাধ্যম কয়েকটি ইংরেজী দৈনিক ও দু'-একখানা বাংলা সাপ্তাহিক। 'প্রদীপ' মাসিক সদ্য প্রকাশিত হয়েছে—বাড়িতে আসে। কাকা ইংরেজী জানতেন না বলে বাংলা কাগজ পড়তেন। আর সবাই পড়তেন দৈনিক 'বেঙ্গলী' বা 'অমৃতবাজার' ইংরেজী পত্রিকা। তাও টাটকা নয়—একদিনের বাসি কাগজ ডাক-ঘরের মারফৎ বিলি হতো। আজকের মত দৈনিক বিলির ব্যবস্থা তখন অজ্ঞাত। আগেই বলেছি, যুগটা তখন ছিল ইংরেজীয়ানার—ইংরেজী ভাষা শেখা, ইংরেজীতে বক্তৃতা করা ছিল শিক্ষার চরম আদর্শ।

আমি তখন হাইস্কুলে নীচের ক্লাশে পড়ি। একদিন হেড মাষ্টার মহাশয়ের নোটিশ এলো—বিকেলে সভা হবে, কলকাতা থেকে বক্তা আসছেন সকল ছাত্ররা যেন উপস্থিত থাকে। স্কুলের হলঘরে সভা হলো। বক্তার নাম মনে আছে ললিতবাবু—বোধহয় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যাপক ললিতমোহন ঘোষাল। ইংরেজী বক্তৃতার একবর্ণও বুঝি নি। তবে বক্তৃতা শুরু হবার পূর্বে যে গানটা হয়েছিল, তার কথা ও সুর আজও মনে আছে—

> "তোমারি রাগিনী জীবনকুঞ্জে
> বাজে যেন সদা বাজে গো।
> তোমারি আসন হৃদয় পদ্মে
> বাজে যেন সদা বাজে গো॥

তব নন্দনগন্ধমোদিত
ফিরি সুন্দর ভুবন
তব পদরেণু মাখি লয়ে তনু
সাজে যেন সদা সাজে গো ॥…”

গান গেয়েছিলেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্ররা—যাঁরা কলকাতায় কলেজে পড়েন এবং হয়তো যাঁদের উৎসাহে ললিতবাবু এই মফঃস্বল শহরে বক্তৃতা দিতে আসেন। যাই হোক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই গানটির মাধ্যমেই আমাদের প্রথম মানস পরিচয়।

রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ছিলেন বসু পরিবারের ছেলেরা। সুধীর বসু স্থানীয় স্কুলের পড়া শেষ করে মেডিক্যাল কলেজে পড়েন। আসেন মাঝে মাঝে। বৈকালে আমাদের বাড়িতে জমে আসর—তাঁদের কেউ কাকাদের সহপাটি, কেউ দাদার, কেউ আমার সুধীরদার মুখে প্রথম শুনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা-আবৃত্তি—'পুরাতন ভৃত্য' ও 'দুই বিঘা জমি'। পরে কত জায়গায় কতবার এ কবিতাদ্বয়ের আবৃত্তি শুনেছি, কিন্তু সেই বাল্য বয়সে কবিতা দুটি যেভাবে মনকে নাড়া দিয়েছিল তার স্মৃতি আজও মনে আছে। 'কেষ্টা আয়রে কাছে'—কী করুণভাবে আবৃত্তি করতেন সুধীরদা। 'দুই বিঘা জমি'র আবৃত্তি শুনতে শুনতে নিজ গ্রামে কাকাদের সংগে আম কুড়োবার চিত্রটি মনে পড়ে যেতো।

বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলন এলো। রাখি বন্ধনের গান গাই—'বাংলার মাটি বাংলার জল'…রাখি বাঁধি সকলের সাথে। জানলাম গানটির রচয়িতা 'রবিঠাকুর'। বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হলো—মিছিল বের হয় পথে। বালক, কিশোর, যুবকরা গান গায় পথে তাল-বেতাল, সুর অসুরের পালা। সবাই প্রাণপণে চেঁচাই—

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক,
জগতজনের শ্রবণ জুড়াক,
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক—
মুখ তুলে আজি চাহো রে।

দাড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজলি—
প্রভাত গগনে কোটি শির তুলি
নির্ভয়ে আজি গাহো রে”

মনে হতো সত্যিই বুঝি আমাদের গান শুনে হিমালয় গলে যাবে। নতুন গান আনলেন কলকাতার ছাত্ররা—

“বিধির বাঁধন কাটবে তুমি
এমন শক্তিমান—
তুমি কি এমন শক্তিমান।
আমাদের ভাঙপড়া তোমার হাতে
এমন অভিমান—
তোমাদের এমনি অভিমান।...ইত্যাদি।

কী দম্ভের সঙ্গে আমরা গাইতাম এ-রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে বেড়াই পথে পথে। আর গাইতায রজনীকান্তের গান “মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই”। বরিশালের প্রাদেশিক সভা পণ্ড হলো—পুলিশ নববর্ষের দিন বাঙালী যুবকদের লাঠির ঘায়ে আহত করলো। আমরা গাই কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের গান—বরিশাল পুণ্যে বিশাল হলো লাঠির ঘায়ে” এবং রবীন্দ্রনাথের গান—

“ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
ততই বাঁধন টুটবে
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
রদের যতই আঁখি রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুটবে,
অতই মোদের আঁখি ফুটবে।”...ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের সংগে মানস-পরিচয় এইভাবে বেড়ে চলেছে। তার বাণী শুনেছি, কিন্তু এখনো তাঁকে চোখে দেখি নি। প্রথম চোখে দেখলাম গিরিডিতে। গিরিডিতে আমরা যাই ১৯০৬ সালের পূজার সময়—

কবিকে দেখি সেখানেই সর্বপ্রথম। রবীন্দ্রনাথের আ-যৌবনের বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার তখন গিরিডিতে ল্যানড একুয়্যিজিশন অফিসার। গ্রন্ড কর্ড রেলওয়ে নির্মানকাকে যে সব জমি গর্ভনমেন্ট দখল করেন সে সব মূল্যদান-ব্যবস্থার জন্য এই অফিস খোলা হয়। রবীন্দ্রনাথ বিশ্রামের জন্য বন্ধুর গৃহে আশ্রয় নিতেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বাবা যান—আমি সঙ্গে গেলাম। তখন গিরিডি হাইস্কুলে সেকেন্ড ক্লাশে পড়ি। রবীন্দ্রনাথের সংগে বাবা কেন দেখা করতে যান সেটা বলা দরকার। সেই সময়ে শহরের যে অঞ্চলে আমরা থাকতাম সেখানে ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য একটা বিদ্যালয়ের সূচনা হয়েছে—রবীন্দ্রনাথ-এর পৃষ্ঠপোষকতা পাবার জন্য বাবা বিদ্যালয়ের সম্পাদকরূপে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। বোধহয় ইতিপূর্বে শ্রীশচন্দ্রেব নিকট শুনে থাকবেন যে, রীবীন্দ্রনাথ ছোটনাগপুর অঞ্চলে শান্তিনিতেন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বিকল্প একটি স্থান সন্ধানের জন্য বন্ধুকে বহুবার পত্র দিয়েছেন! তাই বোধহয় শিশুবিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে কবির অভিপ্সিত বিদ্যা-আশ্রম গ:ড় তোলবার কথা বার্তাপক্ষের মনে হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ সব শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। এবং এই বিদ্যালয়ের জন্য একটি আবেদনপত্র মুসাবিদা করে দিলেন—তাঁর নামে আবেদনপত্রটি মুদ্রিত হয়েছিল। তখন কবির সয়স ৪৫।৪৬—ঋজুদেহ, প্রৌক, প্রৌঢ় রূপ।

কয়েক বৎসর পরে ১৯০৮ সালে জোড়াসাঁকোর মহর্ষিভবনে মাঘোৎসবের দিন কবির কণ্ঠে প্রথম ভাষণ শুনলাম। তখন ন্যাশানল কলেজে পড়ি—মেসে থাকি। ঠাকুরবাড়ি সম্বন্ধে কতো গল্পই না শুনি। এ-সময়ের একটি কৌতুক-কাহিনী না বলে পারছিনে। কে যেন বলেছিল—রাতে যারা মাঘোৎসবের বক্তৃতা শুনতে যায়, তারা সেখানে খেতে পায়। অবশ্য টিকিট না পেলে প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু আমার স্থান জুটে গেল। গিরিডিতে পরিচিত এক যুবক ঠাকুরবাড়ীর আত্মীয় —তাঁর সুপারিশে আমি স্থান পেলাম দোতলার বারান্দায়। ঠাকুরবাড়ীর গান ছিল সেকালে বিখ্যাত—গান শুনলাম, একটি ছোট হলে বেদির

পাশে বসে হাতে তাল দিয়ে গান করছিল। তখন তো কাউকেই চিনতাম না—পরে জানলাম সেই বালক আজকের যশস্বী সাহিত্যিক ও সাংগীতিক সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সভা হয়ে গেল—খেতে কেউ ডাকলো না। মেসে ফিরলাম পাচক ঠাকুরকে আমার জন্য চাল নিতে বারণ করে বলে গিয়েছিলাম রাতে খাবো না—সুতরাং রাতটা কিভাবে কাটলো তা সহজেই অনুমেয়।

জীবনে নানা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। পিতার মৃত্যুর পর বর্ধমানে সবাই এসেছি মাতুলালয়ে—মাতামহ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। তখনও কলকাতায় পড়ে। আমি জানতাম বর্ধমান থেকে কয়েকটা ষ্টেশন পরেই বোলপুর—সেখানে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রম বা বিদ্যালয়ে আছেন আমাদের পরিচিত গিরিডির হিমাংশুবাবু। ইনি ওখানকার শিশু বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। মনে আছে, তিনি রবীন্দ্রনাথের সদ্য-প্রকাশিত ইংরেজী শ্রুতিশিক্ষা প্রভৃতির আদর্শে শিশুদের ইংরেজী পড়াতেন। সেই শিশু বিদ্যালয় কালে বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং অন্যদের পরিচালনাধীনে চলে যায়—তখন হিমাংশুবাবু শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতার কাজ নিয়ে আসেন। আমি ঠিক করলাম বোলপুরে গিয়ে কবির বিদ্যালয় দেখবো। অবশ্য আরও একটি উদ্দেশ্য এই—বিধুশেখর বিদ্যালঙ্কার শাস্ত্রীকে দেখার ইচ্ছে। বিধুশেখরের প্রতি আমার আকর্ষণের কারণটা এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কলকাতার ন্যাশনাল কলেজে আমি সাহিত্য ও ভাষাবিষয়ক কোর্স নিয়েছিলাম—অন্যান্য ভাষার সঙ্গে পালি ভাষাও পড়তাম। কিন্তু বাংলা হরপে পালি বই তখন কোথায়? বোধহয় চারুচন্দ্র বসু 'ধর্ম্মপদ'ই একমাত্র বই ছিল। বিধুশেখর অল্পকাল পূর্বে 'মিলিন্দ পঞ্হো' নামে বিখ্যাত পালিগ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। আমার বেশ মনে আছে কয় মাসের বৃত্তির অনেকগুলো টাকা পেয়ে যে সব বই কিনি মনে হয়েছিল অনুবাদককে বোলপুরে গিয়ে দেখবো। আমাদের অধ্যাপক চট্টগ্রামের ভিক্ষু পূর্ণানন্দ শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা বলেছিলেন ক্লাসে।

আজ সকালে যে গাড়ি ১২টায় বোলপুরে আসে সেই গাড়িতেই এসেছিলাম—সেদিন পয়লা বৈশাখ। কিভাবে শান্তিনিকেতনে এলাম তৎকালীন বোলপুরের অবস্থা কি ছিল প্রভৃতির আলোচনা ইতিপূর্বে অন্যত্র করেছি—তাই এখানে পুনরুক্তি করলাম না।

হিমাংশুবাবুর অতিথি হয়ে তাঁর কাছে দোতলা ঘরে থাকি; গ্রন্থাগারের উপর বিরাট চালাঘর—ছাত্রাবাস। পরদিন ভোর বেলায় হিমাংশুবাবু ডেকে বললেন—"মন্দিরে যাবে? কবি উপাসনা করেন। উঠে পড়ো।" অন্ধকার রাত্রি। উঠে কুয়োতলায় গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে মন্দিরে গেলাম। সে সময় আশ্রমে বিজলীবাতি আসেনি—অন্ধকারের শোভা সভ্যজগতে আজ অজ্ঞাত। মন্দিরে গিয়ে দেখি পূর্বতোরণে কবি ধ্যানস্থ হয়ে আছেন, অদূরে সিঁড়ির নীচে ডিজ লণ্ঠন মৃদু করে জ্বালানো। বুঝলাম শান্তিনিকেতন অতিথিশালা থেকে বেশ অন্ধকার থাকতেই কবি এসেছেন—আসবার সময় লণ্ঠনটি সংগে করে আনেন। কয়েকজন আমরা বসেছি অদূরে; কবি আস্তে আস্তে তাঁর মনের কথা বলে গেলেন—মনে হলো যেন ভিতর থেকে কথাগুলি উৎসারিত হয়ে আসছে। শুনেছিলাম গত অগ্রহায়ণ মাস থেকে প্রতি প্রাতে একটি করে ভাষণ দান করেন। উপাসনা অন্তে সবাই ফিরে যাই; সকালের সমবেত উপাসনায় যোগ দিয়ে প্রাতরাশ গ্রহন করার পর অনেকেই কবির সাথে দেখা করতে গেলেন, আমিও সংগী হলাম। গিয়ে দেখি কবি তাঁর অভ্যাসমতো প্রাতের ভাষণটি লিখেছেন: তাই প্রণাম করে সকলে নীরবে ফিরে এলাম।

আমার দিন কাটে বিধুশেখর শাস্ত্রীর ঘরে। সেটি ঘরও বটে, লাইব্রেরীও বটে। চারদিকে শুধু বই—মাঝখানে দু'খান চৌকি পাশাপাশি পাতা; সেখানে শাস্ত্রী মহাশয় রাতে থাকেন পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিয়ে। আমি বইগুলি দেখি কখনো কিছুটা পড়ি। বেশ মনে পড়ছে জেম্‌ প্রিন্সেপের অশোকলিপি পাঠের ইতিহাস উপন্যাসের মতো আনন্দ নিয়ে পড়েছি।

সেইদিন বিকালে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো বিধুশেখরের ঘরের মতো আরেকটি কামরায়—সে ঘরটি এখন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের রেফারেন্স রুম। হিমাংশুবাবু আমার পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি কলিকাতার ন্যাশনাল কলেজের ছাত্র। ন্যাশনাল কলেজের নাম শুনেই কবি আমাকে সেই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করলেন—সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে বিশেষভাবে। তিনি যে আরম্ভকালে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সে কথাও বললেন। আমার মতো অত্যন্ত সাধারণ বালকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে এমনভাবে আলাপ করবেন তা আমি ভাবতেও পারিনি।

ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা বিশেষ বলবো না। সংক্ষেপে বলি, কলকাতায় শরীর টিকলো না—প্রায়ই জ্বর হয়। সেখানকার পড়াশুনায় ছেদ পড়লো; ১৯০৯ সালের পূজার পর আর আমি কলকাতায় ফিরলাম না। বছরের শেষদিকে শান্তিনিকেতনে আশ্রয় পেলাম হিমাংশুবাবুর মাধ্যমে পত্রাদি বিনিময়ের পর। আশ্রমে থাকি, খাই দাই ঘুরে বেড়াই। কিন্তু ক্রমে ক্রমে লাইব্রেরী আমাকে টেনে নিল তার পিছনে। কত ঘটা করে যে পড়তাম তা লিখে বললে বিশ্বাস করানো কঠিন হবে। কি পড়তাম তার হদিস পাওয়া শক্ত। ইতিহাসের প্রতি আমার অনুরাগ বহুকালের, জানতাম ইতিহাস মানুষটিকে চিনতে হলে, তার সাহিত্য—তার মনের কথা জানতেই হবে। লাইব্রেরীতে পেলাম গ্রীক, লাতিন সাহিত্যের অনুবাদ বই কতকগুলতে কবির সহি বোধহয় তিনিই কিনে বইগুলি পড়েছিলেন—তা না হলে বিদ্যালয়ের জন্য এ-সব বইয়ের কি প্রয়োজন। হোমারের কাব্য দু'খানির অনুবাদ পড়লাম। ইতিপূর্বে Chapman-এর কবিতা অনুবাদ পড়তে চেষ্টা করেছিলাম; একে কবিতা, তার উপর পুরানো ইংরেজ—সত্যি কথা বলতে কি আমার ভাল লাগেনি। India-Andrew Lang-কৃত গদ্য অনুবাদ এবং Odyssy-র Dutcher ও Leaf-কৃত তর্জমা পড়েছি—খুব ভাল লাগলো। এই বৃদ্ধবয়সে এখনো 'লো-এব-ক্লাসিকস্' এনে পড়ে সফোক্লিসের গ্রীক নাটকগুলি যে কতোবার পড়েছি বলতে পারিনে।

সারাদিন পড়তে দেখে কবি ভাবলেন ছেলেটাকে তাঁর বিদ্যালয় সেবার কাজে লাগানো যেতে পারে। ১৯১০-র গ্রীষ্মাবকাশের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেলাম।

শান্তিনিকেতন এসে পড়েছিও যেমন লিখেছিও তেমন। সে সব লেখার বেশীভাগ মহাকাল দয়া করে নিশ্চিহ্ন করেছেন। তবে ছাপার হরপে যেগুলি একবার রূপ পেয়েছে সেগুলিকে নিরাকৃত করা কঠিন। বোধহয় সেইসব লেখা দেখেই কবি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণের পর অমাদের মতো অর্বাচীনদেরও আহ্বান জানালেন। তখন আমি পড়েছি ইউরোপের মধ্যযুগীয় ইতিহাস প্রাচীন যুগ পাঠের পর ইতিহাস ছাড়া পড়ছি সন্ত ও সাধ্বীদের জীবনী ও বাণী মধ্যযুগের ইতিহাস তাঁরাই বেঁচে আছেন আজও।

'ভারত মহিলা'য় লিখেছিলাম ম্যাডাম গঁ্যায়োর কথা তাঁর আত্ম-জীবনী দুই খণ্ডসহ লাইব্রেরীতে এসেছে—পড়লাম খুব মনোযোগ দিয়ে। তারপর লিখলাম দু'টি প্রবন্ধ। অমৃতলাল গুপ্ত তার 'তাপসী' গ্রন্থে এই প্রবন্ধ দু'টি ব্যবহার করেছিলেন। প্রসঙ্গত বলি 'ভারত মহিলা, বোধহয় মেয়েদের দ্বারা সম্পাদিত (সরযুবালা দত্ত) প্রথম পত্রিকা—যা ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এবার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্য লিখলাম সাধু এবোলার্ড এবং এবোলার্ড ও হিলোইসির প্রেম পত্রাবলীর কথা মনে পড়ে। কবি বিলাত থেকে পাঠালেন মন্তেসরি শিক্ষা সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তিকা। কবির নির্দেশে মন্তেসরি-শিক্ষাপ্রণালী' প্রবন্ধটি লিখি—এটি তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়।

বোধহয় বাংলা ভাষায় মন্তেসরি শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে এইটি সর্বপ্রথম আলোচনা। কবির জীবন-কথা যারা সামান্যতমও জানেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, কী দেশী কী বিদেশী—নানা সাময়িক পত্র-পত্রিকা সম্বন্ধে কবি খুব ওয়াকিবহাল থাকতেন। ভারতী, সাধনা, বঙ্গদর্শন পত্রিকাদির মধ্যে তার বহু নিদর্শন আছে। তত্ত্ববোধিনীর ভার নিয়েও কবি সেই রীতির অনুসরণ করেন—পাঠক যদি তত্ত্ববোধিনীর

পত্রিকার পুরানন ফাইল কখনো দেখেন, তবে এই তথ্যের সত্যতা বুঝবেন। এর পরেই 'প্রবাসী' মাসিকে 'সংকলন' নামে একটি বিভাগ সংযোজিত হয়। এর অধিকাংশই কবির নির্দেশ রচিত হতো। রামানন্দবাবু বহু বিলাতী মাসিক, ত্রৈমাসিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা পাঠাতেন—তা থেকে কবি বেছে বেছে দাগ দিয়ে দিতেন এবং কে কি লিখবে তাও সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিতেন। জ্ঞান চট্টোপাধ্যায় অজিতকুমার চক্রবর্তী, শরৎকুমার রায় প্রমুখ অনেকেই নিয়মিত লেখক ছিলেন—সেই গোষ্ঠীর এক কিনারায় আমারও স্থান হলো। প্রবন্ধগুলি কবি নিজে দেখে দিতেন অনেক সময় সবটাই নিজে লিখে ফেলতেন। এইভাবে লেখার 'মকৃসা' শুরু হয়।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলি, আমাদের যুগে বাংলা ভাষায় চর্চা ছিল না থার্ডক্লাশ পর্যন্ত বাংলা পরীক্ষণীয় বিষয়ই ছিল। গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান এমন কি সংস্কৃত ভাষায় প্রশ্নোত্তরত ইংরেজীতে করতে হতো। বাংলার প্রতি আকর্ষণ ছিল খুবই কম···লজ্জার বিষয় নিশ্চয়ই তবে ভুলে গেলে চলবে না সে-সময়টার কথা।

ইতিপূর্বে গিরিডিতে থাকাকালীন কিশোর ও যুবকেরা মিলে হাতে লিখে পত্রিকা বের করে 'হাতেখড়ি উৎসাহটা' ছিল। হিমাংশুবাবুর বেশি তবে কাজের লোক ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ বিমলাংশু—কলকাতায় স্থাপিত বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিউটের ছাত্র। সত্যিই এখানেই আমার হাতেখড়ি। যখন ন্যাশন্যাল কলেজে পড়ি, তখন মেসের ছেলেদের নিয়ে 'পথিক' নামে পত্রিকা বের করি—বলা বাহুল্য এটিও হাতে লেখা। মাঘোৎসবে গিয়ে যে সব গান শুনতাম তার একটা গানের কলি হলে এক পত্রিকার Capaoin।

মুখরিয়া দিক চলিবে পথিক,

অমৃত পথের যাত্রী।'

তারপর শান্তিনিকেতনে এসে পড়বার ও লেখার যে সুযোগ পেলাম—কবির কাছ থেকে যে উৎসাহ পেলাম তাতেই আমি আজ যা হয়েছি তা হতে পেরেছি।

রবীন্দ্রনাথ আমি

অন্নদাশংকর রায়

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের কথা কবির নিজের জবানীতেই বলা যাক। রবীন্দ্র রচনাবলীর ত্রয়োবিংশ খণ্ডের গ্রন্থ পরিচয়ে "সাহিত্যের পথে"র রচনাংশ থেকে তুলে দিই।

"আমি অনেক দিন থেকেই প্রতিশ্রুতি আমি রক্ষা করতে পারি নি, তার কারণটা আবার প্রকৃতিগত।...

এবার যখন সুদূর চীন-যাত্রা করবার নিমন্ত্রণ পেয়েছি, তখন বহুমান-ভাজন আমাদের সভাপতিমশায় আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন আমার প্রতিশ্রুতির কথা

অল্প কিছুদিন হল একটি ছাত্র—ভারতেরই একটু পশ্চিমের কোনে কলেজের ছাত্র—হঠাৎ একদিন আমার প্রভাত ভ্রমণের সময় আমার সঙ্গ ধরলেন। তিনি বললেন, একটি প্রশ্ন আছে। ইংরাজী শুরু করলেন: Is art too good be human nature's dasly food ?"

বুঝলাম এই প্রশ্নের মূলে বহুলোকের মধ্যে প্রচলিত একটা তর্ক আছে। সে তর্কটি এই যে, যে সকল সাহিত্য বা শিল্পরচনার প্রভাব আমাদের জীবন-যাত্রায় আনুকূল্য করে মানুষকে ভালো করে বা সমৃদ্ধ করে বা সুদক্ষ করে, তার সামাজিক বা বা অন্য কোন প্রকার সমস্যাপূরণের সহায়তা করে, সেই আর্ট শ্রেষ্ঠ কিনা। অর্থাৎ, কেবলমাত্র চিত্তবিনোদন আর্টের উৎকর্ষের আদর্শ কিনা। সেই ছাত্রটির এই প্রশ্নের আমি আজকের সভায় মনের মধ্যে করে নিয়ে এসেছি। এই

প্রশ্নের সূত্রটিকেই অবলম্বন করে, চিন্তা ও ব্যাখ্যা করে যাওয়া আমার পক্ষে সহজ হবে।"

কবি সেদিন লিখিত ভাষণ দেননি। তাঁর মৌখিক ভাষণের অনুলিখনে হয়তো কিছু ভুলচুক ছিল। 'অর্থাৎ' না হয়ে 'অথবা হলে ঠিক হতো।'

যা হোক, সে ভাষণ শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কবি আমাকে বলেছিলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় এসো, তোমার প্রশ্নের উত্তর সেইখানেই দেবে।" কিন্তু পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমন করে যাই? সরস্বতীপূজার ছুটিতে শান্তিনিকেতনে গিয়ে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পাটনার ছেলে পাটনায় ফিরে যাই।

তখন আমি তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পড়ি। আর্ট নিয়ে তখন থেকেই ভাবছি। আমি জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারতাম না এক রবীন্দ্রনাথ, আরেক প্রমথ চৌধুরী। দুজনের মধ্যে একজনের সঙ্গেও আমার যোগাযোগ ছিল না। যদিও আমি উভয়েরই ভক্ত। একদিন কলেজের ছুটিতে শান্তিনিকেতনে গিয়ে বার বার তিনবার চেষ্টা করে তৃতীয়বার কবিকে নিভৃতে পাই। সে আর কতক্ষণের জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজ এসে হাজির। কবি আমাকে বিদায় দিলেন।

তখন কি আমি জানতুম যে পরে একদিন আমি "পথে প্রবাসে" লিখব ও সেইভাবে আত্মপরিচয় দেব? প্রথম সাক্ষাৎকারে কবিকে আমার নাম বলিনি তিনিও উল্লেখ করেননি। বিলেত থেকে ফিরে আসার পর তাঁর সংগে দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার। পাঁচ-ছয় বছরের ব্যবধানে তিনি আমার নাম জেনেছেন রচনা পড়েছেন পড়ে প্রশংসা করেছেন। তাই আলাপটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে নয়, পাশাপাশি বসে।

প্রথম সাক্ষাৎ চীন-যাত্রার প্রাক্কালে। তার মানে ১৯২৪ সালে। শেষ সাক্ষাৎ তাঁর মৃত্যুর বছরখানেক আগে। অর্থাৎ ১৯৪০ সালে। ইতিমধ্যে কয়েকবার দেখা হয়েছে। একবার তো তাঁকে আত্রাই নদীর

বোট থেকে স্বাগত করে, নিয়ে গিয়ে আত্রাইঘাট ষ্টেশনের প্লাটফর্মে বসাই ও ট্রেন এলে তাঁর সঙ্গে এক কামরায় নাটোর অবধি যাই। ততদিনে আমি রাজশাহী জেলার শাসক। প্রথম সাক্ষাতের তেরো বছর বাদে। আর্ট তখন মাথায় উঠেছে। আলাপ হলো বিচিত্র বিষয়ে। সাহিত্যও তার মধ্যে ছিল।

রবীন্দ্র রচনাবলীতে আমার উল্লেখ আরো এক জায়গায় আছে। কবির শেষ জন্মদিনের কবিতাটি আমাকে উদ্দেশ্য করে লেখা। বাঁকুড়ায় থাকতে হঠাৎ একদিন অপ্রাত্যাশিতভাবে ওটি পাই। বাংলা টাইপ মাটারে অন্য কাউকে দিয়ে লেখানো। নীচে হিজিবিজি স্বাক্ষর। তাঁর অত সুন্দর হাতের লেখার করুণ পরিণতি। দেখে দুঃখ হলো। কিন্তু কল্পনাও করতে পারিনি যে তিন মাসের মধ্যেই তাঁকে হারাব। কবির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের বহু পূর্বেই আমি তাঁর একজন অন্ধ ভক্ত। তেমন ভক্তি আমি আর কারো প্রতি অনুভব করিনি। মনে মনে তাঁকে অনুকরণ করেছি। কিন্তু চিঠিপত্র লিখে বিরক্ত করিনি। আমার নিজেরই নিজের সাহিত্যিকতার উপর ভরসা ছিল না। সূচনাটা একান্ত প্রতিশ্রুতিহীন।

প্রস্তুত হচ্ছিলুম আমি ইংরেজী ভাষায় সাংবাদিক হতে। ইংরাজী চর্চার ফাঁকে ফাঁকে বাংলা ওড়িয়া দুই ভাষায় সাহিত্যের শৌখীন শিক্ষ-নবিশী করতাম। আশ্চর্য হয়ে যেতুম "প্রবাসী" ও "ভারতী" তে আমার কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে দেখে। আর "উৎকল সাহিত্যে" আমার ওড়িয়া প্রবন্ধ ও কবিতা। একটি ওড়িয়া বারোয়ারি উপন্যাসের গোটা তিনেক পরিচ্ছদ লিখতে গিয়ে আমি নিজের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করি। এর পরে ওড়িয়া একেবারেই ছেড়ে দিই। বাংলাও বোধহয় ছাড়তুম যদি সত্যি সত্যি সাংবাদিক হতুম ইংরেজী ভাষায়। তা না হয়ে হলুম আই-সি এস। বাংলাদেশে কাজ করতে এলুম। চাকরির জন্যে বাংলা ছাড়তে হলো না। বাংলার জন্যেই চাকরি ছাড়তে হলো একুশ বছর বাদে।

আমার সাহিত্য সাধনার আদিপর্বে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন আমার দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক। কিন্তু ক্রমেই আমি আপনার বক্তব্য বিষয় ও লিখনশৈলী আবিষ্কার করি। স্বাধীনতা ঘোষণা করি। তারপর থেকে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক দুই স্বাধীন লেখকের। গুরু-শিষ্যের নয়। তখন আর আমি তার অন্ধ সমর্থক নই। তবে বিরূপ সমালোচকও নই। ধীরে ধীরে আমার চিন্তাধারা পশ্চাত্য হয়ে যায়। পরে গান্ধী-মার্গী। টলস্টয়মার্গী। রবীন্দ্রনাথ তা বলে আমার মনের আড়ালে চলে যাননি। রামমোহন থেথে রবীন্দ্রনাথ অবধি যে প্রবাহ নেমে এসেছে, আমি সেই প্রবাহেরই সামিল।

রবীন্দ্রনাথই বাংলার রেনেসাসের পরিপূর্ণতা। আমরা যারা পরে জন্মেছি, তারা সেই পরিপূর্ণতাকে অতিক্রম করতে পারব কি? তাঁর প্রয়াণের সময় থেকেই এ প্রশ্ন আমাদের আকুল করেছে, আমরা বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে ও প্রকারে উত্তর দিতে চেষ্টা করেছি। অনেকেই আমার রেঁনেসাঁসকেই অতিক্রম করতে চান। সেটা আমার মতে অ-পথ। বাংলার রেনেসাঁস এখনো অসমাপ্ত। রামমোহন, রবীন্দ্রনাথকে অগ্রাহ্য করে রেভেসাঁসের সমাপ্তি হতে পারে না।

আমি যখন স্কুলের ছাত্র, তখন আমাদের হেডমাস্টার মশায় আমাদেয় দিকে চেয়ে যেন আমাকেই বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথকে লোকে শ্রেষ্ঠ কবি বলে, কিন্তু সে বিষয়ে অতটা নিশ্চিত নই। তবে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে তিনি গদ্যলেখক হিসাবে শ্রেষ্ঠ।" মাস্টার মশায় বোধ হয় জানতেন যে আমি একজন রবিভক্ত। সেই সময় থেকেই আমিও বার বার ভেবেছি যে কাব্যে তিনি যতো বড়ো, তার চেয়ে কম বড় নন গল্পে-উপন্যাসে প্রবন্ধে। তাঁর মতে সব্যসাচী লেখক তো এদেশের সাহিত্যে নেই-ই, বিশ্বসাহিত্যেই বা কোথায় ও ক'জন।

তাঁকে অতিক্রম করতে হলে একটা বা দুটো শাখা বেছে নিতে হবে। তাছাড়া আর উপায় নেই। কিন্তু রেনেসাঁসের বাইরে গিয়ে

নয়। তার ভিতরে থেকেই। বাইরে গেলে হয়তো আমরা আর্টের চৌহদ্দির বাইরেও চলে যাব।

রবীন্দ্রনাথ যদিও বলেছিলেন যে, তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন তবু তাঁর ভাষণ আমার জিজ্ঞাসার সম্যক উত্তর হয়নি। পরে সেই একই প্রশ্ন নিয়ে আমি সুইজারল্যাণ্ডে রমাঁ রলাঁর দ্বারস্থ হয়েছিলুম তাঁর উত্তরেও আমি পরিতৃপ্ত হইনি।

এখনো আর্ট মানব প্রকৃতির দৈনন্দিন ভোজ্য হয়ে ওঠেনি। যেখানে হয়েছে সেখানে তার উৎকর্ষ বজায় থাকে নি। কী করে তার উৎকর্ষ অক্ষুণ্ণ রেখে তাকে সর্বজনের ভোজ্য করা যায়, এটা যেমন কালকের প্রশ্ন ছিল তেমনি আজকেরও প্রশ্ন।

রবীন্দ্রনাথ আমাকে একথাও বলেছিলেন যে আর্ট হবে উচ্চতর গণিতের মতো তাকে সরল করা চলবে না, তাতে জল মেশানো চলবে না। যারা তাকে চায়, তাদেরকেই আরো উচ্চ উঠতে হবে।

আমি নিজের জন্যে একটা মধ্যপন্থা বেছে নিয়েছে। পাঠকের খাতিরে আমি যথাসম্ভব সরল করব, সহজ করব, কিন্তু আমার খাতিরে পাঠকেও অর্ধেক পথ এগিয়ে আসতে হবে।

কবির সঙ্গে আমার চিঠিপত্রের আদান প্রদান সামান্যই ছিল। যতদূর মনে পড়ে তাঁর কাছ থেকে বার দুই টেলিগ্রাম পেয়েছিলুম। বৈষয়িক টেলিগ্রাম। আর চিঠি মাত্র একখানি। আমার নিজের কাব্যগ্রন্থের সম্বন্ধে দু'কথা।

রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায়ঃ জন্মদিন

প্রিয়তোষ ভট্টাচার্য

প্রান্তিক (১৯৩৮) থেকে আরম্ভ ক'রে রোগশয্যা, আরোগ্য, জন্মদিনও শেষলেখা পর্যন্ত কালটিকে রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায় ব'লে গৃহীত হয়ে থাকে। বুধমণ্ডলীর মতে এই পর্যায়টি এক নবযুগের সূচনা করেছে। কারও কারও মতে রবীন্দ্রনাথ বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যেন একটু বেশী আধুনিক হবার চেষ্টা করেছেন, আবার রবীন্দ্র-সমসাময়িক কোন কোন উগ্রপন্থী তরুণদল রবীন্দ্রনাথের সমকালীন সাহিত্যকে "বুর্জোয়া ব'লে উন্নাসিকতাও দেখিয়েছেন।

এই সকল মতদ্বৈধের মধ্যে প্রবেশ না করে সাদা চোখে যদি রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলিকে তাঁর প্রথম পর্যায়ের কাব্যগুলি থেকে একটু আলাদা করে দেখতে যাওয়া যায় তা প্রথমেব পার্থক্যটুকু চোখে পড়ে। সে হ'ল উপযুক্ত শব্দ-চয়ন-ক্ষমতা ও প্রয়োগবৈশিষ্ট্যের অভিনবত্ব, পদ-বিন্যাসের অনায়াস স্বচ্ছতা, ছন্দভাঙ্গা ছন্দের গতি ছন্দ ও সঙ্গে সঙ্গে দুরবগাহ অনুভূতির একরূপ আর্ষ নির্লিপ্তি। নইলে, বিষয়বস্তু বা কাব্যজীবিদের দিক থেকে শেষ পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থগুলি যে নূতন কোন কাব্য-সত্যের দর্শন প্রতিপাদিত করেছে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় না।

বস্তুতঃ, যে রবীন্দ্রকাব্যসত্যগুলি একের পর এক বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের ভিতর দিয়ে প্রোজ্জ্বিত হ'তে হ'তে কবির নিগূঢ় অন্তরপ্রদেশে একরূপ 'সংস্কার'-রূপে অবস্থান করে এসেছে এবং যৌবন ও প্রৌঢ়ের পালা বদলের মধ্যেও যে সংস্কার একরূপ সুখসংস্কৃত রূপ পেয়েছে মাত্র, ঠিক সেই কাব্য-সত্যগুলিই শেষ পর্যায়ে এসে মৃত্যুর নিকষ-কঠিন কষ্টি

পাথরে পরীক্ষিত হয়ে অনেকটা শুদ্ধার 'আটপৌরে' রূপ নিয়ে উপস্থিত হ'তে দেখা যায়, প্রান্তিক ও প্রান্তিকোত্তর কাব্যগুলির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়।

এখানেও দেখি কবির সেই স্বভাবানুগ মানব ও মর্ত্য, মৃত্যু ও অমর্ত্য, 'আমি আর 'তুমি'র অভীক্ষণ, এখানেও সেই মিষ্টিক লীলাবাদ আর ক্লাসিক ঋষিবাদের অবাধ সঞ্চরণ, সেই 'প্রীতি' ও পৈতি'র প্রবুদ্ধ পদপাতন। কবির স্বয়ং-উপলব্ধ শ্রেষ্ঠ অনুভবগুলির কোনটিরই অনুপস্থিতি ঘটেনি তাঁর বার্ধক্যের গোধুলি বেলায়।

অভিনবত্বের মধ্যে এই অতি প্রিয় অনুভব ক্রিয়াগুলির কোনটির সময়পযোগী পরিশোধন, পরিবর্ধন বা পরিমার্জন ঘটেছে, কিন্তু পরিবর্তন বা পরিবর্জন ঘটেনি কোনমতেই। খেয়া-গীতিমাল্য-গীতাঞ্জলী যুগের লীলাবাদ প্রান্তিক-সেঁজুতি-জন্মদিনে এসে উন্নীত হয়েছে উপনিষদের ঋষিবাদে, আবার মানসীর 'প্রীতি' ও বলাকার প্রৈতি (স্থিতিতত্ব ও গতিতত্ব) উপরেই এসে সাধু-সঙ্গম লাভ করেছে প্রান্তিক ও জন্মদিনের প্রশান্ত নির্লিপ্ত জ্যোতিঃসমুদ্রের নিস্তরঙ্গ গভীরে। এ যুগেরই প্রবাহিনী, আকাশ-প্রদীপ ছেলে-ভুলান ছড়া ইত্যাদি স্মরণ করিয়ে দেয় পূরবী, মহুয়া বীথিকার কৌতকপ্রিয় কবির প্রসন্ন মর্তপ্রীতিটিকে আবার, এই যুগেরই আরোগ্য নবজাতক শ্যামলী শেষসপ্তকের আধ্যাত্মিকতা থেকে খুব বেশী দূরে নয়। কিন্তু প্রকৃতই অবগাঢ়রূপে যে দুটি সত্য দেখা দিয়েছে, এ যুগের শেষ লেখা কাব্যগুলিতে তার একটি হ'ল মানবপ্রীতি, আর একটি অমর্ত্য-প্রীতি।

মানবপ্রীতি ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্রকাব্যের সর্বত্রই। কিন্তু সেই মানব যত বেশী 'মানবিক' তত বেশী 'মানুষ' নয়। মাটির গন্ধ তাতে কম। সে শুধু মার্জিত, সাদামাটা নয়। কিন্তু মৃত্যুর উপান্তে এসে রবীন্দ্রনাথ ওপারের দিকে যত বেশী পা বাড়িয়েছেন এ-পারের মাটির মানুষ তত বেশী নিবিড় আত্মীয়তার তার আতিথ্য পেয়েছে। তার বিশ্বময় বৈরাগ্যের বীর্যবান অনুরাগে 'মূক যারা দুঃখে, নতশির স্তব্ধ

যারা বিশ্বের সম্মুখে'—তারাও উপেক্ষিত হয়নি। সুদূর পরবাসী স্বল্প-পরিচিত বিদেশীর দল।

"বিদেশী ফুলের বনে অজানা কুসুম ফুটে থাকে
বিদেশী তাহার নাম বিদেশে তাহার জন্মভূমি
আত্মার আনন্দক্ষেত্রে তার আত্মীয়তা
অবারিত পায় অভ্যর্থনা।" (জন্মদিন, ৩নং)

নৃত্যরত নটরাজের এক পদবিক্ষেপে রূপলোক ও অন্য পদবিক্ষেপে রসলোক যদি উন্মোচিত হয়ে থাকত রবীন্দ্র-জীবনে মৃত্যুরাজের এক পদবিক্ষেপে মর্ত্যলোক ও অন্য পদবিক্ষেপে অন্য অমর্ত্যলোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

"দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীবন-প্রান্তে মম
রজনীর চন্দ্র আর প্রত্যুষের শুকতারা সম।"

এমন কি, রোগশয্যা রোগ জর্জর দেহে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেও কবির এই দুই আলো কিন্তু নিষ্প্রভ হয়নি। এক আলো এসে যদি কবির 'অচেতন আমি'কে করে উত্তপ্ত উদ্বেল—

"হে সংসার
আমাকে বারেক ফিরে চাও; পশ্চিমে যাবার মুখে—
বর্জন করো না মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মত।"

অন্য আলো এসে পরক্ষণেই কবির 'সচেতন-আমি-'কে করে সজাগ—

"এ কি অকৃতজ্ঞতার বৈরাগ্য প্রলাপ ক্ষণে ক্ষণে
বিকারের রোগীসম অকস্মাৎ ছুটে যেতে চাওয়া
আপনার আবেষ্টন হতে।"

'আরোগ্য' লাভ করতেই দুই আলোর বোঝাপড়া হয়ে গেছে। তখন মৃত্যুই মুক্তি হয়ে উঠেছে:

"আজি মুক্তি-মন্ত্র গায়
আমার বক্ষের মাঝে দূরের পথিক-চিত্ত মম
সংসার যাত্রার প্রান্তে সহমরণের বধূ সম।"

তারপর, 'জন্মদিনে' আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনি যখন কবি শুনতে পেলেন, তখন মুক্ত স্থৈর্যে সমাসীন।

"আসন্ন বিরহস্বপ্ন ঘনাইয়া নেমে আসে মনে।
জানি, জন্মদিন
এক অবিচিত্র দিনে ঠেকিবে এখনি
মিলে যাবে অচিহ্নিত কালের পর্যায়ে।"

কিন্তু তবুও, এই অমর্ত্য-লোকচারী রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতির মধ্যে 'দার্শনিক' জেগে থাকলেও তাঁর 'কবি'কে পরাস্ত করতে পারেনি। তাঁর 'কবি'টি বলেন, "সুন্দরের দূরত্বের কখনও হয় না ক্ষয়, কাছে পেয়ে না পাওয়ার দেয় অফুরন্ত পরিচয়।"—তাঁর 'দার্শকি' বলেন,

"আজি এই জন্মদিনে
দূরত্বের অনুভব অন্তরে নিবিড় হয়ে এল।
যেমন সুদূর ঐ নক্ষত্রের পথ
নীহারিকা জ্যোতির্বাষ্প-মাঝে
রহস্যে আবৃত্ত,
আমার দূরত্ব আমি দেখিলাম তেমনি দুর্গমে—
অলক্ষ্য পথের যাত্রী, অজানা তাহার পরিণাম।"

পরিণাম অজানা হ'লেও সেই অজানার প্রতি কবির মনে কোন সংশয়-ব্যাকুলতা আর নাই :

অন্ধ তামস গহ্বর হ'তে
ফিরিনু সূর্য্যালোকে
বিস্মিত হয়ে আপন পানে
হেরিনু নূতন চোখে। (সেঁজুতি)

বিস্মিত হয়ে আপনার পানে নূতন চোখে তিনি যে প্রত্যয়গুলি হেরিলেন সেগুলি বিশুদ্ধ উপনিষদ। তিনি দেখলেন :

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

তিনি দেখলেন—

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥

তিনি দেখলেন—

বায়ুরনিলামমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্ ॥
সৃষ্টি লীলা প্রাঙ্গণের প্রান্তে দাঁড়াইয়া
দেখি ক্ষণে ক্ষণে
তমসের পরপার
দেখা মহা-অব্যক্তের অসম চৈতন্য ছিনু লীন।
করো অপাবৃত, হে সূর্য, আলোক-আবরণ
তোমার অন্তরতম পরম জ্যোতির মধ্যে দেখি
আপনার আত্মার স্বরূপ।
যে আমি দিনের শেষে বায়ুতে মিশায় প্রাণবায়ু
ভস্মে যার দেহ অস্ত হবে,
যাত্রাপথে সে আপনা না ফেলুক ছায়া
সত্যের ধরিয়া ছদ্মবেশ। (জন্মদিন, ১৩ নং)

অথবা,

ম্লানিমার ঘন আবরণ
দিনে দিনে পড়ুক খসিয়া
অমর্ত্যলোকের দ্বারে
নিদ্রায়-জড়িত রাত্রি-সম
সে সবিতা, তোমার কল্যাণতম রূপ
করো অপাবৃত,
সেই দিব্য আবির্ভাবে
হেরি আমার আপন আত্মারে
মৃত্যুর অতীত।
(জন্মদিন, ২৩ নং)

এইরূপে উপনিষদের ঋষি-বাক্যের মাঝেই রবীন্দ্রনাথ সমাধান খুঁজে পান জন্ম-মৃত্যুর রহস্যের :

জন্মদিনে মৃত্যুদিনে দোঁহে যবে করে মুখোমুখি
দেখি যেন সে মিলনে
পূর্বাচলে অস্তাচলে
অবসন্ন দিবসের দৃষ্টি-বিনিময়—
সমুজ্জ্বল গৌরবের প্রণত সুন্দর অবসান।

(জন্মদিন, ২৬)

এই "প্রণত সুন্দর-অবসানের" প্রশান্তিতে কবি বলেছেন সেই দেশে—

যেথা নাই নাম
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়
যেখানে অখণ্ড দিন
আলোহীন অন্ধকারহীন,
আমার অমিয় ধারা মিলে যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর সংগমে।

(জন্মদিন, ১২ নং)

পরিণাম সম্পর্কে এইরূপ দ্বিধাহীন নিঃসংশয়-চিত্ত কবির কিন্তু আজন্ম "চেয়ে-থাকা" বাসনার বিরাম নেই।

"প্রচ্ছন্ন বিরাজে
নিগূঢ় অন্তরে যেই একা,
চেয়ে আছি যদি দেখা (জন্মদিন)

এই অন্তর-পুরুষের চাক্ষুষ দেখা কবি পেয়েছিলেন কি ?

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—

কে তুমি
মেলেনি উত্তর।
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম-সাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়
কে তুমি
পেল না উত্তর॥ (শেষ লেখা)

যদি পেতেন, রবীন্দ্রনাথ হতেন সাধক-শ্রেষ্ঠ সিদ্ধচৈতন্য। পাননি বলেই তিনি হয়েছেন কবিশ্রেষ্ঠ বিশ্বপ্রেমিক। মৃত্যুতে তাঁর প্রেম পূর্ণ হয়েছে কিন্তু 'রহস্য' শেষ হয় নাই। রহস্যের আলো-আঁধারকে বাঁচিয়ে রেখেই তিনি কবির শিল্পীসত্তাকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে গেছেন। রহস্যের চাক্ষুস উন্মোচন হ'লে সৃষ্টির অর্থ থাকে না কিছু—সৌন্দর্য হয় ব্যর্থ; তাই,

'কে তুমি
পেল না উত্তর।'

জন্মদিন :

মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে প্রকাশিত এই কাব্যগ্রন্থটি কয়েকটি কারণে বিশেষ মূল্যের দাবি রাখে। 'রোগশয্যা'র রোগক্লান্ত কবির সংকোচ হয়েছিল বুঝি তার কল্পন', ভাষা ও ছন্দ ক্ষীণ, আড়ষ্ট ও শিথিল হয়ে এসেছে।

"তাই মোর কাব্যকলা হয়েছে কুণ্ঠিত
তাপতপ্ত দিনান্তের অবসাদে;
কী জানি শৈথিল্য যদি ঘটে তার পদক্ষেপ তালে।"

'জন্মদিনে' ও দেখি নিজের রচনা নৈপুণ্যের প্রতি সংকোচকে কবি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

"করিয়াছি বাণীর সাধনা
দীর্ঘকাল ধরি।

আজ তারে ক্ষণে ক্ষণে উপহাস পরিহাস করি।
বহু ব্যবহার আর দীর্ঘ পরিচয়
তেজ তার করিতেছে ক্ষয়।"

মজা এই যে রবীন্দ্রনাথের স্বভাব-সুলভ এ হেন বিনম্র বাচন-ভঙ্গি কে সত্য ভেবে নিয়ে একদল সমালোচক রবীন্দ্রনাথের এ-যুগের রচনার প্রতিভার দৈন্য খুঁজে পেয়েছেন। এই ধরণের অশিক্ষিত পটুত্ব যাঁদের, নিকট জন্মদিন, একটা মূর্তিময়ী (challenge) অশীতিপর বৃদ্ধ কবির লেখনী-প্রসূত রচনার এই বিদগ্ধ যৌবন কোন কোন ক্ষেত্রে কবির যৌবনের অনেক ছন্দোময়ী রচনাকেও কিঞ্চিত লজ্জা দেবার স্পর্ধা রাখে। উদাহরণতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে জন্মদিনের ৮নং কবিতার। ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে কবি লিখলেন:

সায়াহ্ন বেলার ভালে অস্তসূর্য্য দেয় পরাইয়া
রক্তোজ্জ্বল মহিমার টীকা,
স্বর্ণময়ী করে আসন্ন রাত্রির মুখশ্রীরে'
তেমনি জলন্ত শিখা মৃত্যু পরাইল মোরে
জীবনের পশ্চিম সীমায়

এখানে সে মৃত্যুপরবর্তী অন্ধকারের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য সৃষ্টি কারিণী শিল্পী-প্রতিভারও এক চমৎকার প্রমাণ পাই।

অথবা, ৭নং কবিতায় যেখানে সংপুর পাহাড়িয়ারা রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে হাতে এনেছিল পুষ্পমঞ্জরী ভক্তি-নিবেদার্থ; কী অনবদ্য কাব্যসৃষ্টি করে সেই মুহূর্তটিকে ধরে রাখলেন কবি সৌন্দর্য্যের চিরন্তন স্মৃতিশালায়।

ধরণী লভিয়াছিল কোন ক্ষণে—
প্রস্তর আসনে বাস,
বহু যুগ বহ্নিতপ্ত তপস্যার পরে এই বর—
এ পুষ্পের দান
মানুষের জন্মদিন উৎসর্গ করিবে আশা করি

...নক্ষত্রচিত মহাকাশে
কোথাও কি জ্যোতিঃ সম্পদের মাঝে
কখনো দিয়েছে দেখা এ দুর্লভ আশ্চর্য সম্মান ॥

এমন আরো অনেক উদাহরণ সংগ্রহ করা যেতে পারে যার দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যেতে পারে যে, বৃক্ষ বৃদ্ধ হ'লে ফুল বৃদ্ধ হয় না। মৃত্যুর দ্বারদেশে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ স্বাস্থ্য হারিয়েছিলেন কিন্তু সৃষ্টি হারাননি। 'অবিচিত্র ধরণী' সাবিত্রী 'পৃথিবী' 'পার্বতী জনতা' 'সমুচ্চ শান্তি'; 'নারায়ণী ধরণী'; ইত্যাদি বিশেষণের অর্থপূর্ণ চমক, অথবা,

"তারি আজ দেখিনু প্রতিমা
গিরিন্দ্রের সিংহাসন পরে।"

—এখানে 'প্রতিমা' শব্দের প্রয়োগচাতুর্য্য—কবির অপূর্ব নির্মাণক্ষম অনন্ত স্বাক্ষর।

'জন্মদিন' কাব্যগ্রন্থ দার্শনিক প্রত্যভঙ্গ ছাড়াও কয়েকটি বিশেষ বিশেষ কবিতা আছে যাতে কবির মনের আটুট চপলতা অদ্ভুত যৌবশক্তির পরিচয় দেয়।

১৯নং কবিতায় একের এক চিত্র এঁকে কবি ছেলেবেলার যে স্মৃতিচারণ করে গেছেন সেগুলিকে কালির আঁচড় না বলে তুলির আঁচড় বলা উচিত।

পুরাতন নীলকুঠি দোতলার' পর
ছিল মোর ঘর।
সামনে উধাও ছাত—
দিন আর রাত
আলো আর অন্ধকারে
সাথীহীন বালকের ভাবনারে
এলোমেলো জাগাইয়া যেত···
কর্ম্মসমুদ্রের মাঝে নৈষ্কর্ম্মদ্বীপের পারে
বালকের মনখানা মধ্যাহ্নে ঘুঘুর ডাক যে।

২০নং কবিতায়, ভাষার সৃষ্টি, শব্দের শক্তি, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বিজয় অভিযান—এইসব মিলিয়ে এক অদ্ভুত রূপছড়া বেঁধেছেন কবি বলাকা-যুগের ভঙ্গ-পয়ারের গতিছন্দ দিয়ে। এই কবিতাটি নানা দিক দিয়ে তাৎপর্য্য পূর্ণ। শক্তির অপব্যবহারে বন্দী যখন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তখন তাকে সামলানো দায়। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একথা সমান প্রযোজ্য। বোধ করি আধুনিক কবিতার বেপরোয়া শব্দ-ব্যবহারের উপর কবির এই সার্থক কবিতা। যার ইঙ্গিত ইউরোপীয় সমাজবাদকে লক্ষ্য করেও।

"দীর্ঘকাল ব্যাকরণদুর্গে বন্দী রহি
অকস্মাৎ হয়েছে বিদ্রোহী
অবিশ্রাম সারি সারি কুচকাওয়াজের পদক্ষেপ—
উঠেছে অধীর হ'য়ে খেপে......"
"মনে মনে দেখিতেছি, সারাবেলা ধরি
দলে দলে শব্দ ছোটে অর্থ ছিন্ন কার—
আকাশে আকাশে যেন বাজে
আগড়ুম বাগড়ুম ঘোড়াড়ুম সাজে ॥

সেদিনের যুগ হ'ল বিগত দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে সৃষ্টি বিধ্বংসীকর যুদ্ধের যুগ। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে এই ব্যাধিগ্রস্ত কবির মনে যুদ্ধের ব্যাধি কীরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তারই সাক্ষ্য বহন করেছে ২১নং ও ১৬নং কবিতাগুলি।

"দামামা ঐ বাজে...
...শুরু হবে নির্মম এক নূতন অধ্যায়—
নইলে কেন এতো অপব্যয়,
আসছে নেমে নিষ্ঠুর অন্যায়......
দামামা তাই ঐ উঠেছে বাজি।

(১৬নং)

রক্তমাখা দন্তপংক্তি হিংস্র সংগ্রামের

শত শত নগর গ্রামের

অন্ত্র আজ ছিন্ন ভিন্ন করে

চলে ছুটে বিভীষিকা মূর্ছাতুর দিগন্তরে।"—(২১নং)

কবির ভবিষ্যদ্বাণী যুদ্ধদগ্ধ নরনারী পীড়িত প্রাণে আনে নূতন জীবনের বলিষ্ঠ ইঙ্গিত।

"এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান,

বীভৎস তাণ্ডবে

এ পাপযুগের অন্ত হবে,

মানব তপস্বীবেশে

চিতাভস্ম-শয্যাতলে এসে

নবসৃষ্টি ধ্যানের আসনে,

স্থান লবে নিরাসক্ত মনে—

আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান

ঘোষিছে কামান" (২১নং)

২২নং কবিতায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধ তীব্র সন্তোষ ঘোষিত হয়েছে।

সিংহাসনতলচ্ছায়ে দূরে দূরান্তরে

যে রাজ্য জানায় স্পর্ধাভরে

রাজায় প্রজায় ভেদমাপা,

পায়ের তলায় রাখে সর্বনাশ চাপা।…

…সমুচ্চ আকাশ হ'তে ধুলায় পড়িবে অঙ্গহীন—

আসিবে বিধির কাছে হিসাব চুকিয়ে-দেওয়া দিন—

অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের চূর্ণীভূত পতনের কালে

দরিদ্রের জীর্ণদশা বাসা তার বাঁধিবে কঙ্কালে।"

"জন্মদিন" কাব্যগ্রন্থের সবচেয়ে বহুল প্রচারিত কবিতা হ'ল ১০নং কবিতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে ছাত্রমহলে যা "ঐক্যতান" নামে পরিচিত। এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের যুগনির্দেশী আত্মসমীক্ষণ।

বোধ করি এমন একটি সমীক্ষণের প্রয়োজন ছিল রবীন্দ্রজীবনে—যার মূল্য কেবল রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ নয়, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-পুরুষ ও তর্কবহুল একটি সাহিত্যাদর্শের সমাধানের জন্যেও প্রয়োজন। কবিতা হিসাবে শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে এটি একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। বিষয়বস্তুর দিক থেকে তাবৎ সকল কবিতা থেকে এর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাদ পৃথক ও বিচিত্র। আত্মসমালোচনার মাধ্যমে সাহিত্য-সমালোচনাকে কেন্দ্র করে অশীতিবর্ষ বয়সে যে একটি যুগনির্দেশকারী ধ্রপদী কবিতা লেখা চলতে পারে—এর নজির তাবৎ বিশ্ব-সাহিত্যে আর একটিও নেই। জগতে এমন লেখক খুব কমিই আছেন যিনি আপনার প্রতিষ্ঠিত-গৌরব থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে সাহিত্য-বিচারকের তুলাদণ্ডের নিজের রচনা ত্রুটিবিচ্যুতি নিরপেক্ষ দেখার সাহস রাখেন। একমাত্র রবীন্দ্রনাথেই তা' দেখিয়েছেন এবং এমনভাবে সেটা যুগোপযোগী করে সমকালীন সাহিত্যের দিক নির্দেশ করেছেন যে তাতে তার প্রতিষ্ঠা-গৌরব আরো অনেক পরিমাণে বেড়ে গেছে।

"পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার
বাধা হয়ে আছে রোম বেড়াগুলি জীবন যাত্রায়।"

মানুষের হৃদয়ে অবাধে প্রবেশের অক্ষমতাকে বিনা ভূমিকায় কী গভীর স্বীকারোক্তির সঙ্গেই না প্রকাশ করেছেন কবি। অথচ, এই স্বীকারোক্তিকে এরূপ বিনয়জ্ঞাপন বা ভনিতা ভেবে নিয়ে কোন কোন সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে গৌরব দিতে গিয়ে বরং তাকে আরো ছোট করে দেখেছেন যেখানে কবি বলেছেন,

"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি"—সেখানে এই শ্রেণীর সমালোচক মন্তব্য করেছেন—যে রবীন্দ্রনাথ পাঁচ পাঁচবার বিশ্বপরিক্রমা করেছেন তিনি জানবেন না ত আর কে জানবে? বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর মন্তব্য দ্বারা রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের পশ্চাতে যে বিশেষ একরূপ তাৎপর্য থাকে তারই মর্মস্থানে আঘাত করা হয়। আসলে রবীন্দ্রনাথের এইরূপ অসঙ্কোচ স্বীকারোক্তির মাঝে একরূপ উদার সত্য দর্শন আছে।

তিনি বলতে চেয়েছেন, পৃথিবী কেবল মাটি দিয়ে তৈরী নয়, পৃথিবী মানুষ দিয়ে গড়া। পৃথিবীর এই মাটির রূপ—তা সে যত বিচিত্র, যত দুর্গমই হোক না কেন, তাকে চেনবার বা জানবার বিভিন্ন উপায়ে আছে। কখনও ভ্রমণের দ্বারা, কখনও গ্রন্থপাঠ ক'রে কখন বা কল্পনায়। কিন্তু

সব চেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে,
তার কোন পরিমাপ নাই বাইরের দেশে কালে।
সে অন্তময়,
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।

এই যে অন্তর মিশিয়ে মানুষের অন্তরের পরিচয় নেওয়া—সেটা অনেকগুলি কারণে কবি জীবনে সর্বত্রই সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সেই কারণগুলির একটি হল সামাজিক সংস্কার, অপরটি হ'ল বংশাভিজাত্য। এই জন্যই মানুষের রক্ত মাংসের সাংসারিক রূপটি তাঁকে দেখতে হয়েছে সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসে সংকীর্ণ বাতায়ন পথ দিয়ে। এই অসাম্যকে চেনার বেদনাই কবিকে ভিতরে ভিতরে সুরের অপর্ণতার কথা জানিয়ে দিয়েছে।

জীবনে জীবন যোগ করা
না হ'লে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পশরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।"

এই ত্রুটিটুকু তাঁর সাহিত্যে ঘটে গেছে বলেই অনুতাপদগ্ধ কবি প্রতীক্ষা করে আছেন:

নিজে যা পারিনি দিতে নিত্য আমি থাকি তারি
খোঁজে।"

সত্যাভিমুখ কবি কোনরূপ প্রবঞ্চনা মনে রেখে আগামী দিনের গণ-সাহিত্যকে সম্মানে আহ্বান করেছেন:

"কৃষাণের জীবনের শরীক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যাদর্শের প্রশ্ন না এসেই যায় না। গণ-সাহিত্যের নাম ক'রে এক শ্রেণীর চটকদারি মজদুরী সাহিত্যকে কবি কিছুতেই সহ্য করতে পারেননি। শিল্পের অসুন্দরকে কোনদিনই প্রশ্রয় দিতে পারেননি কবি। কেননা, সাহিত্য বা শিল্পের সৌন্দর্য ভঙ্গিসর্বস্ব নয়, এবং ভিত্তির মূলাধার হচ্ছে সত্য অভিজ্ঞতা। তাই,

"সত্যমূল্য না দিয়েই খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয়, নকল সৌখিন মজদুরি!"

এই সাবধানবাণী আধুনিক সাহিত্যের মান নির্ধারণের এক সুনিশ্চিত পথনির্দেশ।

'জন্মদিন' কাব্যগ্রন্থের আর একটি দিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য মানবপ্রীতি ও মহামানব পূজা এই দুটি বোধ মৃত্যুপথযাত্রী কবির স্বভাবোচিত-বিশ্বমানবিকতাকে তীব্রভাবে আলোড়িত করেছিল। মহা-মানবের অসম্মান যে মানুষের অন্তরের মানুষকেই অসম্মান এই কথাটিকে কবি আরও একটু জোরের সঙ্গে বলেছেন ১৮নং কবিতায়।

যারা অন্যমনা, তারা শোনো,
আপনারে ভুলো না কখনো,
মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ,
সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ,
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদেরই নিত্য পরিচয়।

এমন কি যে মানব মহৎ উদ্দেশ্যে অকৃতকার্যও হয়েছে জীবনে জীবনে-ইতিহাসের ক্রমবিকাশের খতিয়ানে তাঁদের অবদানও তুচ্ছ নয়; তাঁদের স্মরণেও মানব আত্মা অন্তরে পূজিত হন।

দলে দলে যাঁরা
উত্তীর্ণ হননি লক্ষ্যে, তৃষ্ণা নিদারুণ
মরুবালুতলে অস্থি গিয়েছেন রেখে
সমুদ্র যাঁদের চিহ্ন দিয়েছে মুছিয়া,
অনারুদ্ধ কর্মপথে
অকৃতকার্য হন নাই তারা—
…শক্তি যোগাইছে (তার) অগোচরে চিরমানবেরে
তাঁহাদের করুণার স্পর্শ লভিতেছি
আজি এই প্রভাত আলোকে,
তাহাদের কবি নমস্কার।

(১৭নং কবিতা)

প্রবাসী—১৩৭৩

———

কবির গ্রাম বাংলা ও স্বদেশ প্রেম

জয়শ্রী দে

১৮৬১ সালের ৭ই মে (২৫ শে বৈশাখ) ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন।

ঐ পুণ্য দিনে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে একটি শিশুর জন্ম হয়। কেউ কল্পনাও করতে পারেনি এই শিশুর একদিন ভারতবর্ষ তথা সারা বিশ্বের শীর্ষস্থান অধিকার করতে পারবে। যা বিশ্বকে সত্যের ও প্রেমের সন্ধান দিয়েছিলেন নিজের লেখনির মাধ্যমে।

বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন বলে শোনা যায়। শৈশবে তিনি শ্লেটে শব্দের মল দিয়ে কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। এবং যেটা নিজের মনের মতো সেটাই তিনি খাতায় লিখে রাখতেন। এবং পরে লোককে ডেকে তিনি তার স্ব-রচিত কবিতা শোনাতেন। এই ভাবে চলে তাঁর সাধনার সূত্রপাত।

আরও জানা যায় তিনি খুব সুন্দর ছবি আঁকা ও সুগাহক হিসাবেও তো পরিচিত ছিলেন। তিনি নিজের গীত রচনায় প্রথমে নিজেই সুর দিয়ে নিজেই গাইতেন।

তিনি তো মাত্র সতেরো বৎসর বয়সে বিলেতে গিয়েছিলেন বলে শোনা যায়।

তিনি সেখানে গিয়েও সোনার বাংলার কথা ভুলতে পারেননি তিনি সেখানে গান ও কবিতাও প্রচুর রচনা করেন।

ঠিক এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের কবি জীবনের দেখা দিল পরিবর্তন।

নিজেদের জমিদারি দেখার জন্য কবিকে যেতে হল শিলাইদহে। পদ্মার তীরে অবস্থিত কবি নৌকায় করে নিজের বাংলা মাকে খুব ভাল ভাবে চিনতে পারলেন বুঝতে পারলেন। এবং দু'ধারের মানুষদের উল্লেখ করে কবি তখন ফুটিয়ে তুলেছেন বাংলার সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতি—গানে গানে, ও কবিতায়—

"সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি,
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।"

তিনি আরও উক্তি করেছিলেন—"ঘরের হয়ে, পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে?" তাদের সংগে এক হয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তিনি উক্তি করেছিলেন—"বাস্তবিক এরা যেন আমার দেশজোড়া এক বৃহৎ পরিবারের লোক। এই সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্ত নির্ভরপর সরল মানুষগুলিকে আপন লোক মনে করতে একটা সুখ আছে।"

এমন দরদভরা লেখায় তার সুবৃহৎ "ছিন্নপত্র" বইখানি ভরা—

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড় ধরে থাকে হাল।
ওরা মঠে মাঠে
বীজ বোনে পাকা ধান কাটে।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ' পরে
ওরা কাজ করে।

পল্লী বাংলার রূপের বর্ণনা করেছিলেন "গীতাঞ্জলির" ভাব মধুর গানগুলোর মধ্যে ১৯১৩ সালেই তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্বকে জানালেন বাংলা বলে একটা জায়গা আছে।

তিনি ১৯০৫ সালের রাখীবন্ধন উৎসবে সকেলের হাতে রাখী বেঁধে দিয়ে বলেছিলেন—

"বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন।
এক হউক এক হউক
হে ভগবান।"

গ্রাম বাংলা পল্লীকে বা পল্লবাসীকে ভালবেসে তাঁর বহু উদ্যোগ ছিল। সব গুলির শেষ রক্ষা হয়তো হয়নি, কিন্তু শেষে—তথা পথের প্রান্তকেই তীর্থ, তিনি মানেননি, জীবন পথেব দু'পাশে ছিল তাঁর দেবালয়। এখন আমাদের তীর্থস্থান হয়ে রয়েছে তার অমর কীর্তি শান্তি শান্তি নিকেতন। প্রতিটি মানুষের শান্তির স্থান।

কবি তাঁর দেশের প্রিয় গ্রাম্য মানুষের প্রতি তিনি বলে গিয়েছেন—

"আজকের মতো বলো সবাই মিলে—
যারা এতদিন মরেছিল তারা উঠুক বেঁচে
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে,
তারা দাঁড়াক মাথা তুলে।"

আরও কবি ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করেছিলেন—

বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ—
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, হে ভগবান।'

রবীন্দ্রনাথের "শেষ সপ্তক"—এ প্রেমানুভূতি

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ অখিল বিশ্বকে ভালবেসেছেন, কেননা, তারি মধ্যে তিনি 'দুটো নয়ন মেলে, দেখেছেন অপরূপকে। বিপুল সৃষ্টির মধ্যে আবার আমাদের এই পৃথিবীকে ভালবেসেছেন তার সব খুঁটিনাটি ও ভালমন্দ নিয়ে 'পাকে পাকে ফেরে ফেরে' ভালবেসেছেন তাকে। কারণ ভালবাসাই তাঁর সাধনা। অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় যে মুক্তি তাই তাঁর সাধ্য, তাঁর পুরুষার্থ।

মহাকবির জীবনের অন্যতম কাব্যগ্রন্থ "শেষ সপ্তক"-এ তার পূর্ব-জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী মোটামুটি বজায় আছে; কিন্তু ভাবের সমাবেশ ও বাচনশৈলী অর্থাৎ শিল্পকলার পারিপাট্যে কাব্যরূপের নবীনতা ও চমৎকারিতা ঘটেছে।

সংকীর্ণ জীবনের কারাবাস হতে উন্মুক্ত উদার মহাজীবনের মহাসাগরে পাড়ি দিতে চেয়েছে কবিচিত্ত; তার পরিচয় মেলে এই কয় ছত্রে:

'এই ছায়ার বেড়াই বদ্ধ দিনগুলো থেকে
বেরিয়ে আসুক মন
শুভ্র আলোকের প্রাঙ্গণতায়।
অনিমেষ দৃষ্টি ভেসে যাক
কথাহীন ব্যথাহীন চিন্তাহীন
সৃষ্টির মহাসাগরে। (৪)

তিনি অনন্ত বিশ্ব-জীবনের পূজারী; তাইসব কিছুর সঙ্গে আত্মীয়তা আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর জীবন-সাধনা। কবির কথায় এক প্রমাণ মেলে;—

'যাব লক্ষ্যহীন পথে,
সহজে সব দেখব দেখা
শুনব সব সুর,
চলন্ত দিন-রাত্রির
কলরোলের মাঝখান দিয়ে
আপনাকে মিলিয়ে নেব
শস্যশেষ প্রান্তরের
সুদূর বিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে। (ঐ)

এটি হচ্ছে কবির সৃষ্টি ও জীবনের উপলব্ধি। একেই বলা যেতে পারে তাঁর জীবনপ্রেম। এই গভীর ও জীবনদর্শনের জন্যেই জীবনের বহু বিচিত্র রূপের স্বীকৃতি রয়েছে তাঁর কাব্যে :—

'চার দিক থেকে অস্তিত্বের এই ধারা
নানা শাখা বইছে দিনে রাত্রে।'

মানুষের জীবন ধারার মধ্যেও রয়েছে সেই মহাবিশ্বজীবনের বিচিত্র প্রকাশ ভাঙা-গড়া, জীবন-মৃত্যুর ওঠা-পড়ার মধ্যে দিয়েই নব নব বিকাশ :

'অতি পুরাতন প্রাণের বহুদিনের নানা পণ্য নিয়ে
এই সহজ প্রবাহ—
মানব-ইতিহাসের নূতন নূতন
ভাঙা-গড়নের উপর দিয়ে
এর নিত্য যাওয়া আসা' (ঐ)

সৃষ্টি ও জীবনের এই রূপই কবির দৃষ্টিতে সত্য ; সৃষ্টির যেন 'নিত্যবহমান অনিত্যের স্রোতে' ; এর একদিকে স্থিতি, অপরদিকে গতি ; একদিকে পুরাতন, অপরদিকে নিত্য নতুনত্ব। এই দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হয়েই তো কবি বিশেষ বিশেষ জীবনরূপের বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন। যেমন তেমনি পারেন রূপান্তরনার সময় এলে তাদের বিদায় দিতে আসক্তি মুক্ত চিত্তে।

তাই তো তাঁর প্রেমভাবনায় জীবনের বৈচিত্র ও নবনবায়মানতায় উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে।

মৃন্ময়ী ধরণীর কত বিচিত্র লীলায় মুগ্ধ হয়ে কবি তার অনুরাগী হয়েছেন তা বোঝা যায় যখন তাঁর একথা শুনি :—

চিরদিন মাটি আমাকে ডেকেছে
পদ্মার ভাঙনলাগা
খাড়া পাড়ির বনঝাউ বনে
আমার দু চোখ ভরে
মাটি আমায় ডাক পাটিয়েছে
শীতের ঘুঘুডাকা দুপুরবেলায়
রাঙা পথের ওপারে
যেখানে শুকনো ঘাসের হলুদ মাঠে
চড়ে বেড়ায় দুটি চারটি গোরু।

(শেষ-সপ্তক—৪৬)

এই নিখিল সৃষ্টিকে যে কবির এত ভাল লাগে তার কারণ এই রূপের নিত্যনবীনতা। নিত্যকালের নবীনের আবির্ভাব হয়ে চলেছে তার মধ্যে।

বিরহই প্রেমকে নিশ্চিত বাঁচাও। বিচ্ছেদই প্রেমকে দেয় নবনবায়মান হয়ে ওঠার সুযোগ।

কবি বলেছেন, একদিন যক্ষের যে-প্রেম ঢাকা ছিল আপনারই আলিঙ্গনের আচ্ছাদনে, ঢাকা ছিল তার আপনাকে দিয়ে, ছিল সংকীর্ণ সংসারের পরিধির সীমায় বন্দী তা বিরহের তপস্যায় হল স্বর্গীয় গরিমার কান্তিমতী, যে-প্রেয়সী ছিল, 'একান্তে, নিভৃত ঘরের সঙ্গিনী' তার রস-রূপটি আসন পেল যেমন অন্তরের আনন্দ-মন্দিরে, তার অন্তরে।'

বিরহ-বেদনা সয়েও যে অনুরাগ থাকে অকম্প, অচঞ্চল তাই প্রেম। অঘটন-ঘটন পটীয়সী, অসাধ্যসাধিকা তার শক্তি :

ভালবাসার সম্ভবের মধ্যে
নিয়তই অসম্ভব,
জানার মধ্যে অজানা,
কথার মধ্যে রূপকথা।' (ঐ—১৯)

বস্তুর স্বরূপ সত্তার সত্য পেতে চাই প্রেমের দৃষ্টি ; সে দৃষ্টি লাভ হলে দেখা যাবে, যাকে চেনা গিয়েছিল বলে মনে হত তার সত্তার অনেকটাই ছিল অপরিচিত। তার দাক্ষিণ্যেই বোঝা যাবে, যাকে তুচ্ছ ও সামান্য বলে ভাবা হত, যে কত মহিমাময়, কত অনির্বচনীয়।

অজানা মানুষ 'আপনার রহস্যে আপনি একাকী চলেছে' তাকে তারস্বরূপে চেনার উপায় ভালবাসা ছাড়া উপায় নেই। কবির কথা স্মরণ করা যাক :

"এমন সময় কোথা থেকে
ভালবাসার বসন্ত হাওয়া লাগে—
সামার আড়ালটা যায় উড়ে,
বেরিয়ে পড়ে চির অচেনা।
সামনে তাকে দেখি স্বয়ংস্বতন্ত্র অপূর্ব, অসাধারণ—
তার জুড়ে কেউ নেই।'

অপরূপের অধরনীতা প্রমাণিত হয় ধরা দেয়ার মধ্যেই। প্রেমে মিলনের মধ্যেও বিরহ থাকে গোপনে বাসা বেঁধে। একেই তো বলে প্রেম-বৈচিত্র। রূপের মধ্যে অপরূপের দর্শন পেলেই বলতে হয় :

'অচিন পাখী তুমি,
মিলনের খাঁচায় থাকে—
সেখানে বিরহ নিত্য থাকে পাখীর পাখায়
...ওড়ার মধ্যে

(ঐ—১৩)

শুধু উদার বাতাসে থেকে থেকে বেদনাতুর স্মৃতি বিদেহ স্পর্শ দিয়ে

মনকে দেয় উতলা করে; স্মৃতি হয়তো বা ধ্বনিতে হয়ে ওঠে কখনো কখনো অমনি করুণ ভাষায়:

এখানে ছিল হাওয়ায় ছড়ানো যে স্পর্শ
চুলের যে অস্পষ্ট গন্ধ,
তারই একটা বেদনা লাগল
ঘরের সব কিছুতেই

(ঐ – ৩১)

এ যেন মনের সেই অবস্থা যখন মন বলে উঠতে চায় —
কেন উর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ,
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ।

কিন্তু, তবু প্রেমের জন্য বেদনাকে ও লাগে ভালো। বেদনাকে অতিক্রম করে প্রেমের দান আর স্মৃতিই দেয় জীবনের শূন্যতাকে ভরে। সব মিলিয়ে প্রেমই জীবনের অমূল্য অক্ষয় সম্পদ। প্রেমেরই কল্যাণে জীবন। কবির বহু কবিতায় সহৃদয় স্বীকৃতি আছে তার।

প্রেম যে অদ্ভুত, অপরূপ সন্দেহ নেই তাতে, এমন কি, এক হিসেবে অসীম তাও বলেছেন কবি। তবু অপরদিকে সীমাও আছে তার। যে পরিবর্তন প্রেমকে দেয় নব নব রূপ সেই তাকে দেয় সীমার বন্ধন। প্রেম সীমার মধ্যে অসীম অর্থাৎ সীমিত হলেও তার রূপে আভাসিত হয় সীমোত্তর ব্যঞ্জনা। কবির দৃষ্টি এমনি সুমিত, সুষম, নিরপেক্ষ, সত্যদর্শী ও মুক্ত। তাই তিনি প্রেমকে দেখেন তার যথাস্থানে, মর্যাদা দেন তাকে যথোচিত। তবু কিন্তু প্রেম অবুঝপনা করতে ছাড়ে না; 'দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে' তার গরব টুটলেও পরাভব মানকে চায় না সে কিছুতেই, বোঝে না যে—

'ব্যথিত হৃদয় হতে বহু ভয়ে লাজে,
মর্মের প্রার্থনা শুধু ব্যক্ত করা সাজে
এ জগতে।

তাই স্পর্ধাভরে সে বলতে চায়—

—আমি ভালোবাসি যারে

সে কি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে ?"

কিন্তু সে বুঝতে চায় না যে এমনি করে ধরে রাখতে চাওয়াতেই তার সর্বনাশ, সব লীলার, সব মাধুরীর সমাপন।

এই জীবনকে ভালবেসেছিলেন বলেই তিনি মহাজীবনে ভালোবাসার প্রেরণা পেয়েছেন ; এই জীবন দিয়েই বুঝেছেন মহাজীবনের রহস্য-সৌন্দর্যকে। জীবন-সাধনায় যথার্থ জীবনপ্রেম হয়েছে বলেই তিনি আসক্ত হয়ে পড়েননি ছোট জীবনের মোহে। তাই তো স্বচ্ছন্দে বলতে পেরেছেন,—

আজ নেব মুক্তি।

সামনে দেখছি সমুদ্র পেরিয়ে

নতুন পার।

তাকে জড়াতে যাব না

এ পারের বোঝার সঙ্গে।

এ নৌকায় মাল নেবে না কিছু,

যাব একলা

নতুন হয়ে নতুনের কাছে।

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয় :

অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়

লভিব মুক্তির স্বাদ।

—নৈবেদ্য ৩০

সংসারের কর্মজাল থেকে মুক্তি পাবার উপায় সংসারকে ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে গিয়ে নয়, তাকে স্বীকার করেও পেরিয়ে গি। অনাসক্তি নিশ্চয়ই চাই, কিন্তু সেটা কর্মের প্রতি নয় কর্মফলের প্রতি। প্রয়োজন তাই কর্ম ত্যাগ নয়, কর্মফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ। ফলের প্রতি দৃষ্টি রেখে

কাজ করলে কর্মই আমাদের উপর কর্তৃত্ব করতে থাকে। কারণ ফলের লোভই কানে ধরে আমাদের কাছ থেকে আদায় করে নেয়। কিন্তু রনাসক্ত কর্মে আমরা কর্ম করতে করতেই তার বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে থাকি।

এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে। কর্মের মূলে যদি কোনোরকম প্রেরণা না থাকে কোনো আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তবে সাধারণ মানুষ কর্ম করবে কিসের জন্য? তার কর্মোৎসাহ যে আপনিই নিস্তেজ হয়ে আসবে। গীতিকার এ সম্বন্ধে নীরব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নীরব থাকেন নি। নিষ্কাম কর্মের প্রেরণা কোথায়, তার সন্ধানও তিনি দিয়েছেন। তিনি বলেন, নিছক কর্তব্যবুদ্ধির নীরসতা থেকে কর্মকে মুক্তি দিতে হবে প্রেমে ও আনন্দে। মনকে যদি শুধু নীতি উপদেশে শুষ্ক রেখে কাজ করি তবে কর্মের মধ্যে রস থাকে কই, আনন্দ থাকে কোথায়? কিন্তু এই নীরব কর্তব্যই সরস হয়ে ওঠে যখন তার পশ্চাতে থাকে প্রেম। মানুষ যখন ফলকামনার পরিবর্তে প্রেমের প্রেরণায় চালিত হয়ে কর্ম করে তখন তার সেই কর্মের মধ্যে বন্ধনের দুঃখ থাকে না, থাকে মুক্তির আনন্দ। এমন কি, তখন ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখ বরণের মধ্যেই সে পায় চরিতার্থতার পরম পরিতৃপ্তি, ভালবাসার মধ্যেই পায় অমৃতের স্বাদে। এই নিঃস্বার্থ কর্মই হল যথার্থ নিষ্কাম কর্ম। বেতনভোগী ভৃত্যও যখন তার প্রভুর জন্য প্রাণ পর্যন্ত পণ করে বসে, তখন তার ত্যাগের মূল্য কি টাকায় শোধ করা যায়? মানুষ যখন মানুষের জন্য অথবা কোনো মহৎ আদর্শের জন্য সব বাধাবিপত্তি তুচ্ছ করে এগিয়ে যায় তখনই সে নীরস কর্তব্যের বেড়া যায় ডিঙিয়ে। তখন তারই থেকে উচ্ছ্বলিত হত আত্মবিসর্জনের আনন্দ। কর্মের মূলে যেখানে প্রেমের বদলে লোভ সেখানেই কর্মের দাসত্ব, তার শূদ্রত্ব। আর ব্যক্তিস্বার্থের প্রতি বৈরাগ্য ফলভোগের প্রতি অনাসক্তিতে যে কর্ম করি তাতেই পাই অমৃতের স্পর্শ।

রবীন্দ্রনাথ নানা সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে আনাসক্তকর্ম-তত্ত্বের যে সব ব্যাখ্যা করেছেন, নিম্নে তার থেকে কয়েকটি অংশে সংকলন করে দেওয়া গেল। উদ্ধৃতিগুলি সাজানো হল কালক্রমে অনুসারে। আশা করি তাতে যেমন তাঁর ব্যাখ্যার বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য, সহজভাবে প্রকাশ পাবে তেমনই তাঁর মননধারায় ক্রমাভিব্যক্তিটাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ভারতবর্ষ মানুষকে লঙ্ঘন করিয়া কর্মকে বড়ো করিয়া তোলে নাই। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মকে মহাত্ম্য দিয়া সে বস্তুত সংযত করিয়া লইয়াছে। ফলের আকাঙ্ক্ষা উপাড়াইয়া ফেলিলে কর্মের বিষদাঁত ভাঙিয়া ফেলা হয়। এই উপায়ে মানুষ কর্মের উপরেও নিজেকে জাগ্রত করিবার অবকাশ পায়। 'ভারতবর্ষ', নববর্ষ (১৩০৪)

আমাদের দেশের পূজনীয় শাস্ত্র ফলের আসক্তি ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। কারণ, ফল লক্ষ্য নহে, ধর্মই লক্ষ্য। দেশের কাজেও ভারতবর্ষ যেন এই শাস্ত্রবাক্য কদাচ বিস্মৃত না হয়। দেশের হিত-সাধনের জন্য আমরা প্রাণ সমর্পণ করিব, সেইরূপ মঙ্গলের পন্থ প্রাণ সমর্পণ করাই ধর্ম; কিন্তু কোন ফল—সে ফলকে ইতিহাসে যত লোকনীয় বলিয়াই প্রচার করুক-না কেন—সেরূপ কোনো ফললাভ করিবার জন্য ধর্মকে বিসর্জন দিব এরূপ নাস্তিকতাকে প্রশ্রয় দিলে রক্ষা পাইব না। বাইবেলে কথিত আছে, ফলের লোভে ধর্মকে ত্যাগ করিয়া আদিম মানব স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া মরণধর্ম লাভ করিয়াছে। ফললাভ চরম লাভ নহে ধর্মলাভেই লাভ, একথা যদি কেবল দেশহিতের বেলাতেই না খটে তবে দেশহিত মানুষের যথার্থ হিত নহে।

—'সমূহ', দেশহিত (১৩১৫, আশ্বিন)

গীতা সেই যোগকেই কর্মযোগ বলেছেন যে-যোগে আমার পূর্ণ অধিকার জন্মে; অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলেই কর্মের উপর আমার পূর্ণ অধিকার জন্মে; নইলে কর্মের সঙ্গের জড়ীভূত হয়ে পড়ি, আমরা কর্মী হইনি।

—'শান্তিনিকেতন' ত্যাগ (১৩১৫, অগ্রহায়ণ ২৭)

মানুষের বিপুল চাওয়া, ক্ষুদ্র নিজের জন্যে হলে তাতেই যত অশান্তির সৃষ্টি। যেখানে তার সাধনা সকলের জন্যে সেইখানেই মানুষের আকাঙ্ক্ষা কৃতার্থ হয়। এই সাধনাকেই গীতা যজ্ঞ বলেছেন: এই যজ্ঞের দ্বারা লোকরক্ষা। এই যজ্ঞের পন্থা হচ্ছে নিষ্কাম কর্ম সে কর্ম দুর্বল হবে না, সে কর্ম ছোটো হবে না, কিন্তু সে কর্মের ফলকামনা যেন নিজের জন্য না হয়।

—জাভাযাত্রীর পত্র, পঞ্চম পত্র (১৩৩৪, শ্রাবণ ১)

গীতা বলেছেন, 'কর্ম করো, ফল চেয়োনা। এই চ চাওয়ার রাহুটাই কর্মের পাত্র থেকে অমৃত ঢেলে নেবার জন্যে লালায়িত। ভিতর-কার সহজ হওয়াটি সার্থক হয় বাইরেকার সহজ কর্মে। অন্তরের সেই সার্থকতার চেয়ে বাইরের স্বার্থ প্রবল হয়ে উঠলেই কর্ম হয় বন্ধন; সেই বন্ধনেই জড়িত যত হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, নিজেকে ও অন্যকে প্রবঞ্চনা।...

ফলে চাওয়া কর্মের নাম চাকরি, সেই চাকরি, মনিব আমি নিজেই হই বা অন্যেই হোক। চাকরীতে মাইনের জন্যেই কাজ। কাজের জন্য কাজ নয়। ভিতর থেকে নিজে যখন কিছুই রস জোগায় না, সম্পূর্ণ বাইরে থেকেই যখন আপন দাম নেয় তখনই মানুষকে বে অপমান করে...

সাধারণ মানুষের সমস্যা এই যে কর্ম করতেই হবে। জীবনধারণের গোড়াতেই প্রয়োজনের তাড়া আছেই। তবুও কি করলে কর্ম থেকে প্রয়োজনের চাপ যথাসম্ভব হালকা করা যেতে পারে? অর্থাৎ কী করলে কর্মে পরের দাসত্বের চেয়ে নিজের কর্তৃত্বটা বড়ো হয়ে দেখা দেয়? কর্ম থেকে কর্তৃত্বকে যতই দূরে পাঠানো যাবে কর্ম ততই মজুরির বোঝা হয়ে মানুষকে চেপে মারবে, এই শূদ্রত্ব থেকে মানুষকে উদ্ধার করা চাই।...

ভৃত্যকে রেখেছি তাকে দিয়ে ঘরের কাজ করাতে। মনিবের সঙ্গে তার মনুষ্যত্বের বিচ্ছেদ একান্ত হলে সেটা হয় ষোল আনা দাসত্ব।

যে সমাজ লোভে দাম্ভিকতায় মানুষের প্রতি দরদ হারায়নি সে সমাজ ভৃত্য আর আত্মীয়ের সমীরেখাটাকে যতদূর সম্ভব ফিকে করে দেয়। ভৃত্য সেখানে দাদা খুড়ো জেঠাই কাছাকাছি পৌঁছয়। তখন তার কাজটা পরের কাজ না হয়ে আপনারই কাজ হয়ে ওঠে। তখন তার কাজের ফল কমন টা যায় সম্ভব ঘুচে। সে দাম পায় বটে, তবুও আপনার কাজ সে দান করে, বিক্রি করে না।

গুজরাটে কাঠিয়াবাড়ে দেখেছি গোয়ালা গরুকে প্রাণের চেয় বেশী ভালবাসে তার দুধের ব্যবসায়ে ফলকামনাকে তুচ্ছ করে দিয়েছে তার ভালবাসায়। কর্ম করেও কর্ম থেকে তার নিত্য মুক্তি। এ গোয়ালা শূদ্র নয়। যে গোয়ালা দুধের দিকে দৃষ্টি রেখেই গোরু পোষে, কসাইকে গোরু বেচতে যার বাধে না, সেই হল শূদ্র। কর্মে তার অগৌরব, কর্ম তার বন্ধন। যে কর্মের অন্তরে মুক্তি নেই, যেহেতু তাতে কেবল লোভ, তাতে প্রেমের অভাব, সেই কর্মের শূদ্রত্ব। জাত শূদ্রেরা পৃথিবীতে অনেক উঁচু উঁচু আসন অধিকার করে বসে আছে। তারা কেউ বা শিক্ষক, কেউ বা শাসনকর্তা, কেউ বা ধর্মযাজক। কত ঝি, দাই, চাকর, মালী কুমোর, চাষী আছে যারা ওদের মতো শূদ্র নয়।

—'জাভাযাত্রী পত্র পঞ্চম পত্র (১৯২৭, জুলাই ৮)

এর চেয়ে সুন্দরতর ওমহত্তর ব্যাখ্যা আর কারও রচনায় আছে কিনা জানি না।

———

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা।

জয়দেব রায়

রবীন্দ্রসঙ্গীতের উৎস ধারায় সন্ধান ক'রতে হলে আমাদের বাংলা-দেশের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ধারায় অনুধাবন করতে হবে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে কথার কোন বিশেষ স্থান ছিল না, রবীন্দ্রনাথ গানের বাণীকে মহীয়সী রাণীর আসনে বসিয়াছেন বাংলা গানে। কবি রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর কাব্যকলারই পরিচয় সাড়ম্বরে ঘোষণা করেছে। এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে—

"সঙ্গীত যেখানে আপন স্বাতন্ত্র্যে বিরাজ করে, সেখানে তাঁর নিয়মসংযমের যে শুচিত প্রকাশ পায়, বাণীর সহযোগে গানরূপে তার সেই শুচিত তেমন করে বাঁচিয়ে চলা যায় না বটে, কিন্তু পরম্পরাগত সঙ্গীত রীতিকে আয়ত্ত করলে তবেই নিয়মের বাতায় সধনে যথার্থ অধিকার জন্মে।"

তাঁর গানের দ্বিতীয় ব্যতিক্রম তান প্রয়োগে। হিন্দুস্থানী রীতির গানে তানের যথেচ্ছ ব্যবহার করেন গায়করা বস্তুতঃ তানের সাহায্যেই গানগুলি ছন্দিত তালে নেচে চলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে তান প্রয়োগ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মতে—"গানের এই তানগুলি গানের আনন্দ হইতে যেমন নানা ধারায় উৎসারিত হইতে থাকে, তেমনই তাহারা সেই আনন্দের মধ্যেই ফিরিয়ে আসে। বস্তুতঃ এই তানগুলি বাহিরে ছোটে, কিন্তু গানের ভিতরকারই আনন্দকে তাহারা ভরিয়া তোলে। কিন্তু যদি এ আনন্দের সঙ্গে তানের যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় তাহা হইলে উল্টাই হয়। তাহা হইলে তানের দ্বারা গান কেবল দুর্বল হইতে থাকে। সে তানে

নিয়ম যতই জটিল ও বিশুদ্ধ থাক না কেন, গানকে সে কিছুতেই রস দেয় না, তাহা হইতে সে কেবল হরণ করিয়াই চলে।"

রবীন্দ্র সঙ্গীতের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর গীতিরীতিতে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গীতিরীতি স্বতন্ত্র একটি বিশিষ্ট রীতি। তাঁর আড়াই হাজার গান প্রায় সবই একটি বিশেষ ভঙ্গীতে একটি লীলায়িত ঢঙে গাওয়া হয়। ব্রহ্মসঙ্গীতেই হোক, মায়ার খেলার গানই হোক আর চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের গানই হোক—সমস্ত গানেরই একটি নিজস্ব শ্রী ও বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁর গানের 'ঢান' বা সুররসটিকে চিনতে ভুল হয় না। এই গায়কী সম্পর্কে শ্রীঅমিয়নাথ সান্যালের মন্তব্যটি এখানে তুলে দেওয়া গেল—

"রবীন্দ্রগীতি গীতিকারগুলি যে অত্যন্ত সুকুমার, তাদের শ্রী ও সুগমা-কোনোরকম বিজাতীয় গায়কীর স্পর্শমাত্র সহ্য করতে পারে না এ কথা শুধু সত্য নয়, যে সকল আধুনিক উন্মার্গগমী শিল্পী রবীন্দ্রগীতি নিয়ে খেলা করবার চেষ্টা করেন, অর্থাৎ তাঁদের স্বপোকল্পিত গায়কী দিয়ে রবীন্দ্রগীতির উদ্ভট রূপ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন, সেই সকল Free Lance-এর ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়ার মতো অপ্রিয় কাজ আর কিছু নেই। প্রশ্ন হতে পারে, রবীন্দ্রগীতি এত স্পর্শসহিষ্ণু কেন? প্রশ্নের উত্তর যদি নাও পাওয়া যায় তা হলেও ঘটনাকে অস্বীকার করা যায় না।"

"পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের উৎসধারার সন্ধান করতে হলে আমাদের বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতধারার ইতিহাস অনুধাবন করতে হবে।"

নিধুবাবু পশ্চিমাঞ্চল থেকে শোরী মিঞার টপ্পাভঙ্গী কণ্ঠে নিয়ে এলেন, বাংলায় টপ্পাগান তথা উচ্চাঙ্গ গানের চলন হ'ল। তার আগে কীর্তন পল্লীসঙ্গীত ছাড়া বাংলায় অন্য গান ছিল না।

শোরীর টপ্পা ছিল—

যে প'রি জা তাঁতে তাঁতে পর
বন রঁাদিয়া বেহেঁ মিসা ফুল লুয়া
রলসকদে পরিয়ঁা না বে সাবরু বরু ।।
পরিরঁা বে প'রি বন বঁদিরা আওরণ
শকদে শোরী দে টেপে দিয়া বরু ।।

রবীন্দ্রনাথ অনুকরণ করলেন—

কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে ভুবনেশ্বর প্রভু,
জাগাইলে অনুপম সুন্দর শোভা, হে হৃদয়েশ্বর।
সহসা ফুটিল ফুলমঞ্জরী শুকানো তরুতে,
পাষাণে বহে সুধাধারা ।।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুকৃত টপ্পা গানের শোবরী 'জমজমা' অলঙ্করণের সাহায্যে একই কথার অংশকে হেরফের করার প্রচেষ্টাও নেই।

নিধুবাবু বাংলাভাষা উচ্চাঙ্গের গানের চলন করলেন, কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দীভাষায় রচিত উচ্চ সঙ্গীতের চর্চা তার বহু আগে থেকেই চলে আসছিল।

সঙ্গীতের জগতে জগতে 'ঘরোয়ানা' বলে একটি কথা আছে। গুরুর কাছ থেকে ঘরোয়ানায় অধিকার পায় শিষ্যেরা।

মোগল বাদশাহের পৃষ্ঠপোষকতায় একদিন দরবারী সঙ্গীতের বিশেষ প্রসার ঘটেছিল, মিঞা তানসেনের ঘরোয়ানা ছিল সুপ্রসিদ্ধ। তার এই সেনীঘরোয়ানা'র বাহাদুর সেন নামে একজন সঙ্গীতবিদকে নিয়ে আসেন বাংলাদেশে বিষ্ণুপুরের মল্লবংশীয় রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ। বাহাদুর সেনের সঙ্গে এসেছিলেন পীরবক্স নামে একজন পাখোয়াজ সঙ্গীতকারী।

বাহাদুর সেনের বাঙালী শিষ্য তৈরী হল, তাদের মধ্যে ছিলেন গদাধর চক্রবর্তী, রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, নাজির ভ্রাতৃদ্বয়। গদাধরের ঘরোয়ানা তৈরী হল শ্যামচাঁদ গোস্বামী অনন্তলাল চক্রবর্তী, নীলমাধব চক্রবর্তী প্রভৃতি ধ্রুপদীদের প্রযত্নে। রামশঙ্করের ঘরোয়ানার

ধারা চলে এল ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী যদুনাথ ভট্ট, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই যদুভট্টেরই শিষ্য।

কলকাতার রাজা-মহারাজাদের বৈঠকে গুণী সঙ্গীতবিদরা তখন সসম্মানে আশ্রয় পেতেন। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী পাথুরিয়াঘাটার রাজা যতীন্দ্রমোহন ও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দরবারে প্রতিষ্ঠিত হলেন জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে। যদুভট্টের সুর ও তার নাম ছিল 'রঙ্গনাথ'—তাঁর নিজেরও গান রচনার প্রতিভা ছিল আর ছিল তাঁর কণ্ঠে বিষ্ণুপুরী ঘরোয়ানার গজল হিন্দী উচ্চাঙ্গের গান।

সঙ্গীতের উপপত্তিকদের আরো একজন সার্থক নিয়ামক কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ও ঠাকুরবাড়ীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

ব্রাহ্মসমাজ তখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, রাজা রামমোহন রায়ের ডান হাত তখন প্রিন্স দ্বারকানাথ। ব্রাহ্মসমাজে খ্রীষ্টিয় যাজনসঙ্গীতের অনুকরণে 'ব্রহ্মসঙ্গীত' নামে এক শ্রেণীর ভাগবতী গীতিরচনার সূত্রপাত করেন স্বয়ং রাজা রামমোহন রায়। এগুলিতে সুর দিয়ে গাইতেন ব্রহ্মসমাজের পেশাদার গায়করা। এই সব গায়কদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও কৃষ্ণপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী।

আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে প্রকাশিত ব্রহ্মসঙ্গীতে ষষ্ঠ ভাগ পর্যন্ত প্রায় সকল গানের সুরই তিনি দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাল্যবয়সে তাঁর কাছে গান শিখেছিলেন। বিষ্ণুচন্দ্রের নিজের রচক গান বিশেষ পাওয়া যায় না।

ব্রাহ্মসঙ্গীতের প্রায় সব গানই কৃতবিদ্য সুরকারদের সংযোজনে ও কৌশলী গায়কদের কণ্ঠে ধ্রুপদ ও ধামার রীতিতে গাওয়া হ'ত। এর ফলে গানগুলি এক শ্রেণীর পবিত্রতাময় গাম্ভীর্য অর্জন করেছিল; অনভিজ্ঞ অদক্ষ গায়কেরা এগুলি অনুকরণ করতে পেত না। গানগুলি গাওয়া হ'লে একটা স্বতন্ত্র পরিবেশ গড়ে উঠত।

বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তীর পর ব্রাহ্মসমাজের গায়ক নিযুক্ত হ'ন যদুনাথ ভট্ট। ব্রাহ্মসঙ্গীত রচনায় এবার নতুন চঙ এসে পড়ল। যদুভট্ট জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতেই থাকতেন, তাঁর কাছ থেকে হিন্দী গান শুনে শুনে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর দাদারা ব্রাহ্মসঙ্গীত রচনা করতেন হুবহু সেই সব সুরে। যদু ভট্টের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"তাঁকে গাইয়ে বলে বর্ণনা করলে খাটো করা হয়। তাঁর প্রতিভা অর্থাৎ সঙ্গীত তাঁর চিত্তের মধ্যে রূপ ধারণ করত। তাঁর রচিত গানের মধ্যে যে বিশিষ্টতা ছিল তা অন্য কোন হিন্দুস্থানী গানে পাওয়া যায় না।"

দেবেন্দ্রনাথও ব্রাহ্মসঙ্গীত রচনা করেছেন। তাঁর নিজের সঙ্গীত-সম্পর্কে বিশেষ অনুরাগও ছিল। দেবেন্দ্রনাথের রচিত ব্রাহ্মসঙ্গীতের মধ্যে একটির উল্লেখ করা হ'ল --

কেন ভোল, ভোল চির সুহৃদে? ভুলনা চির সুহৃদ।
ধন প্রাণ মান সকলি যা হতে, এমন সুহৃদে।
কেন ভোল?
থেকনা, থেকনা, তাঁ হ'তে অন্তর'
তাঁরে ছেড়ে ত্রাণ কোথায়, কোথা শান্তি বল?
চির জীবন সখা চির-সহায়ে, করুণ নিলয়ে
কেন ভোল?

উপরের গানটির সুরও ছিল খুব উচ্চাঙ্গের, উদ্ধৃত রাগিণীতে আড়াঠেকা তালে গাওয়া হ'ত।

তাঁকে ব্রাহ্মসঙ্গীত শোনাবার জন্য রবীন্দ্রনাথের ডাক পড়ত— "যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে ব্রাহ্মসঙ্গীত শোনাবার জন্য আমার ডাক পড়িত। চাঁদ উঠিয়াছে গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, আমি বেহাগে গান গাহিতেছে—

তুমি বিনা কে প্রভু সঙ্কট নিবারে
কে সহায় ভব অন্ধকারে,—

তিনি নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন—সেই সন্ধ্যাবেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে।

রবীন্দ্রনাথের গাওয়া উপরে উল্লিখিত গানটি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা বেহাগে রচিত উক্ত গানটি হচ্ছে—

তুমি বিনা কে সঙ্কট নিবারে,
কে সহায় ভব-অন্ধকারে
রয়েছি বন্দীসম মোহের আগারে,
কলুষিত পাপ বিকারে।
বিষয়-রসে রত, তব প্রেমাবৃত ছাড়ি
মনোভৃঙ্গ বিহারে।।
(কাওয়ালী)

দ্বিজেন্দ্রনাথ একজন বহু বিশেষজ্ঞ গুণী ছিলেন, ক্লারিওনেট বাঁশিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। নতুন একটা স্বরলিপি পদ্ধতিরও তিনি প্রচলন করেন। তাঁর ব্রহ্মসঙ্গীত—

সকল মঙ্গল নিদান, ভবমোচন, অরূপ, চেতনারূপে
বিরাজো।
তুমি অকৃত, অমৃত পুরুষ বিশ্বভুবনপতি,
সুন্দর অতি অপূর্ব।
জীব-জীবন, দীনশরণ, দুঃখ সিন্ধু তারণ হে।
কৃপা বিতর কৃপাসাগর, তার ভব অন্ধকারে।
পরমব্রহ্ম, পরমধাম, পরমেশ্বর সত্যকাম,
পরমশরণ চরম শান্তি তুমি সার।।

উপরের গানটি ইমন কল্যাণ, চৌতালে, রচিত একটি উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদ।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অসংখ্য ব্রাহ্মসঙ্গীত রচনা করেছিল, যদু ভট্টের সুর অবলম্বনে বাংলা কথা বসিয়ে ব্রাহ্মসঙ্গীত রচনার ধারার সূত্রপাতও করেন তিনি।

তাঁর ব্রাহ্মসঙ্গীত—

হয়েছি ব্যকুল অন্তর বিরহে তোমার,

তৃষিত চাতক-সমান।

করিয়ে শীতল তাপিত প্রাণে, হৃদয়ে বিরাজ আমার।

অভয় মুরতি দেখা দিয়ে কর যে অভয়দান;

তব বলে কর বলী যে জানে, কি ভয় কি ভয় তাহার?

উপরের গানটি যদু ভট্টের গাওয়া হিন্দী গান অবলম্বনে সিন্ধুড়া-ধামারে রচিত।

ছায়ানট ঝাঁপতালে রচিত তার একটি ব্রাহ্মসঙ্গীত—

বিপদ-ভয়-বারণ যে করে ওরে মন তাঁরে কেন ডাক না।

মিছা ভ্রমে ভুলে সদা রয়েছে ভবঘোরে মজি

এ কি বিড়ম্বনা।

এ ধন জন না রবে হেন, তাঁকে যেন ভুল না।

ছাড়ি অসার ভজহ সার, যাবে ভব যাতন ॥

হেমেন্দ্রনাথও ছিলেন সুরতন্ময়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধ্যবসায়ের কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"সেজদাদা শিখতেন বটে তিনি সুর ভাঁজছেন তো ভাঁজছেন গলা সাধছেন তো সাধছেনই, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত।

এছাড়া ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তিনিই রবীন্দ্রসঙ্গীতের এ অজস্রমুখী সঙ্গীতস্রোতের কর্ণাধারের কাজ করেছেন বহুদিন ধরে।

পুনর্মুদ্রণ ভারতবর্ষ—১৩৭৭

রবীন্দ্রনাথ ভগ্নহৃদয় গ্রন্থে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব

ডক্টর দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈষ্ণব পদাবলীর রসমাধুর্য রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করে কবির কিশোর বয়স থেকেই। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বলরামদাস প্রভৃতি পদকর্তাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনায় দেখতে পাওয়া যায়। ব্রজবলির ভাষা ভাব ও ছন্দ কবিকে বিশেষভাবে অনুপ্রেরিত করে। কবির বয়স যখন ষোল বৎসর' তখন তিনি 'ভারতী'তে সাতটি পদ প্রকাশ করেন; পরে কয়েক বছরের মধ্যে তিনি আরও তেরটি পদ লেখেন। এইভাবে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী রচনা সম্পূর্ণ হয় কবির পঞ্চবিংশতি বয়ঃক্রমকালে। ১৩১৭ সালের ২০ শে আষাঢ়ের এক পত্রে তিনি লিখেছেন, 'আমার বয়স যখন তের চৌদ্দ তখন থেকে আমি অত্যন্ত আনন্দ আগ্রহের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করেছি; তার ছন্দ রস ভাষা সমস্তই আমাকে মুগ্ধ করে। যদিও আমার বয়স অল্প ছিল তবু অস্পষ্ট অস্ফুট রকমের বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের মধ্যে আমি প্রবেশলাভ করেছিলাম।' (দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রজীবনী, পৃষ্ঠা ৬১, পরিবর্ধিত সংস্করণ)। বৈষ্ণব ধর্ম তত্ত্বের সত দর্শন করে তিনি নানা রচনার মধ্যে তা প্রকাশ করে গেছেন। 'খেরা কাব্যগ্রন্থের 'শুভক্ষণ' ও 'ত্যাগ' কবিতাদ্বয় এর অন্যতম নিদর্শন। বৈষ্ণব কবিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগের আর একটি নিদর্শন হচ্ছে কবির সম্পাদিত পদরত্নাবলী' নামে পদ সংকলন গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১২৯২ সালে। এই গ্রন্থ সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বৈষ্ণব বিদগ্ধ মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

'খেয়া' কাব্যগ্রন্থে 'শুভক্ষণ' ও 'ত্যাগ' কবিতাদ্বয়ে রবিন্দ্রনাথ যে বিশিষ্ট পরকীয়া প্রেমের নিদর্শন দিয়াছেন, তাই অন্যভাবে রূপায়িত হয়েছে কবির রচিত 'ভগ্নহৃদয়' নামক গীতিকাব্যে। 'শুভক্ষণ কবিতায় মেয়ে মাকে বলছে,—

রাজার দুলাল যাবে আজ মোর
ঘরের সমুখ পথে,
আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ লয়ে
রহিব বল কি মতে
বলে দে আমার কি করিব সাজ,
কি ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,
পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে
কোন বরণের বাস।
মাগো, কি হ'ল তোমার, অবাক নয়নে
মুখপানে কেন চাস।
আমি দাঁড়াব যেথায় বাতায়ন কোণে,
সে যাবে না সেথা জানি তাহা মনে,
ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ,
যাবে সে সুদূর পুরে,
শুধু সঙ্গের বাঁশি কোন্ মাঠ হতে
বাজিবে ব্যাকুল সুরে।
তবু রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখ পথে,
শুধু সে নিমেষ লাগি না করিয়া বেশ
রহিব বলো কি মতে।

বহুদিনের আকাঙ্খিত রাজার দুলালকে ক্ষণিকের তরে দর্শনাশায় যে-মেয়ে সমস্ত গৃহকাজ ফেলে বাতায়ন পথে দাঁড়াবে, সেই রাজপুত্র তার পানে হয়ত চাইবেন না, তা সে জানে তথাপি তার হৃদয়বাঁশিটি তার জন্য তো ব্যাকুল সুরে অনুক্ষণ বাজবেই থাকবে। 'ভগ্নহৃদয়,-এর নায়িকা মুরলাও এই মেয়েটির মতো নায়ককে ভালবাসে, কিন্তু তার ভালবাসা সে কখনও প্রকাশ করেনি।

'ত্যাগ' কবিতায় বলা হয়েছে,—

রাজার দুলাল চলি গেল মোর
ঘরের সমুখ পথে,
প্রভাতের আলো জ্বলিল তাহার
স্বর্ণশিখর রথে।
ঘোমটা খসায়ে বাতায়ন থেকে
নিমেষের লাগি নিয়েছি মা দেখে
ছিঁড়ে মণিহার ফেলেছি তাহার
পথের ধুলার' পরে।
মাগো কি হ'ল তোমার, অবাক নয়নে
চাহিস কিসের তরে।
মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয়নি কুড়ায়ে
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে
পড়ে আছে শুধু আঁকা।
আমি কি দিলেম কারে জানে না কেউ—
ধুলায় রহিল সেই ঢাকা
তবু রাজার দুলাল চলি গেল মোর
ঘরের সমুখ পথে—
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়ে দিয়ে
রহিব বল কি মতে।

যে মণিহারটি রাজার ছেলের উদ্দেশ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে, সে মণিহারটি তুচ্ছ বস্তুমাত্র নয়, তা পরম দায়িত্বেরই উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত প্রেমমণি। এর মধ্যেই প্রজ্জ্বোল হয়ে উঠেছে পরকীয়া প্রেমালোকস্নিগ্ধা বলা বাহুল্য, এ-প্রেম বৈষ্ণব পদাবলী অনুসৃত ঠিক পরকীয়া প্রেম নয়। কারণ যার উদ্দেশ্যে এ-প্রেম নিবেদন, সে তো আর কিছুই জানেনা। সেই জন্য পূর্বেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের এই প্রেম বিশিষ্ট পরকীয়া প্রেম। এই প্রেম সুগভীর অথচ অব্যক্ত, এই তবক্ত সুগভীর পরকীয়া প্রেমের বিশেষ নিদর্শন আছে কবিগুরুর 'ভগ্নহৃদয়' গীতিকাব্যে।

'ভগ্নহৃদয়' গীতিকাব্যখানি প্রকাশিত হয় ১৮০৩ শকাব্দে। তখন কবির বয়স কুড়ি বৎসর। গ্রন্থটি ৩৪ সর্গে সম্পূর্ণ গ্রন্থে পাত্র-পাত্রীর উল্লেখ আছে অথচ নাটক নয়। এর কারণস্বরূপ কবি ভূমিকায় বলেছেন—'এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক মনে না করেন। নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই মূল, কাণ্ড, শাখা পত্র এমন কি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই। বর্তমান কাব্যটি ফুলের মালা, ইহাকে কেবল ফুলগুলি মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, দৃষ্টান্তস্বরূপেই উল্লেখ করা হইল।

গ্রন্থের প্রধান নায়ক কবি, আর নায়িকা কবির বাল্যসখী মুরলা। নালিনী এক চপলস্বভাবা কুমারী সকলের হৃদয় লইয়া খেলা করে, কবিও তার বিলাস-বিভ্রমে চঞ্চল। মুরলা কবিকে অন্তর দিয়ে ভালবাসে, কবি তা জানতে পারেনি। ললিতা নামে সরল বালিকাকে ভালবেসে বিয়ে করেছে মুরলার ভাই অনিল; কিন্তু ললিতার প্রেম আবেগময় ও উচ্ছ্বাস পূর্ণ নয়। এই প্রেম অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো, অথচ সুগভীর এবং অব্যক্ত। অনিল এই প্রেমের নাগাল না পেয়ে দূরে সরে যায় এবং নলিনীর চটকে ভোলে। শেষে মুরলা ও ললিতা উভয়েই অন্তর্দাহে জ্বলে মরণের পথে পা দেয়। মুরলাকে যখন কবি বুঝতে পারলেন, তখন সে মৃত্যুপথযাত্রী; সেই যাত্রাতেই তাদের মালা বদল হল, আর মৃতকল্প ললিতার পাশে এসে অনিল সবই বুঝতে পারল।

'ভগ্ন হৃদয়' এ উল্লিখিত এই প্রেম বৈষ্ণবোক্ত পরকীয়া প্রেম থেকে স্বরূপতঃ ভিন্ন। পূর্বেই বলা হয়েছে, এই প্রেম বিশিষ্ট পরকীয়া প্রেম, কারণ নারীর দিক থেকে এই প্রেম বরাবরই অব্যক্ত অর্থাৎ নারী তার দয়িতকে মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসলেও সে এই ভালবাসা মুখে কখনও প্রকাশ করেনি। গীতিকাব্যখানির নারী চরিত্র মুরলা ও ললিতার মধ্যে তা সুপ্রকট। মুরলা মনে প্রাণে কবিকে ভালবাসে, কিন্তু এ ভালবাসা সে কারোর কাছে প্রকাশ করতে পারে না। নির্জনে আপন হারা হয়ে মুরলা বসে থাকে। যেখানে জনপ্রাণী নেই, যে স্থান অতি নির্জন

সেখানে ছুটে যায় মুরলা। সখী চপলা মুরলাকে খুঁজে খুঁজে সারা হয়ে শেষে তাকে দেখতে পায় অন্ধকার বনানীতে। এই নির্জন স্থানে সখীকে একলা বসে থাকতে দেখে চপলা জিজ্ঞাসা করে,—

সখি' তুই কি হলি আপন-হারা?
এ ভীষণ বনে পশি একেলা আছিস বসি
খুঁজে খুঁজে হোয়েছি যে সারা।
এমন আঁধার ঠাঁই জন প্রাণী কেহ নাই'
জটিল-মস্তক বট চারিদিকে ঝুঁকি।
দুয়েকটি রবিকর সাহসে করিয়া ভর
অতি সন্তর্পনে যেন মারিতেছে উঁকি।
অন্ধকার চারিদিক হতে মুখপানে
এমন তাকায়ে রয়, বুকে বড় লাগে ভয়,
কি সাহসে রোয়েছিস বসিয়া এখানে?

রাধিকার এই দশা দেখতে পাই পদাবলীতে। নব অনুরাগিণী রাধা কৃষ্ণপ্রেমে আপনহারা হয়ে বিরহে মগ্ন থাকে। রাধিকা এমনই কৃষ্ণময় যে কারোর কথা পর্যন্ত তার কানে পৌছায় না; আহার-বিহারে তার ভ্রূক্ষেপ নেই কৃষ্ণের রূপ-সন্দর্শনে মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকে; কখনও বা ময়ুরীর কণ্ঠদেশ নিরীক্ষণ করছে। ভক্তকবি চণ্ডীদাসের পদে রাধিকার পূর্ব-রাগের এ চিত্রটি সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ন-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমত যোগিনী পারা॥

এলাইয়া বেনী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘ-পানে
কি কহে দুহাত তুলি।
একদিক করি ময়ুর—ময়ুরী—
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বধুর সনে।

রবীন্দ্রনাথ ভগ্নহৃদয়-এর নায়িকা মুরলাকেও এই ভাবেই চিত্রিত করেছেন। প্রশ্নের উত্তরে সখীকে মুরলা বলছে,—

সখি, বড় ভালবাসি এই ঠাঁই।
বায়ু বহে হুহু করে, পাতা কাঁপে ঝরঝরি
স্রোতস্বিনী কুলু কুলু করিছে সদাই।
বিছায়ে শুকনো পাতা বটমূলে রাখি মাথা
দিনরাত্রি পারি, সখি, শুনিতে ও ধ্বনি।
বুকের ভিতরে গিয়া কি যে উঠে উথলিয়া
বুঝায়ে বলিতে তাহা পারি না সজনি!

এখানে রাধিকা ও মুরলা উভয়েরই দশা এক।

মুরলার এই অবস্থা দেখে সখি চপলার বড় কষ্ট হয়; সে সখীকে বনমাঝে একলা রেখে যেতে চায় না; সখীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে যদি সে পুরুষ হত তবে,—

সারাদিন তোরে রাখিতাম ধরে
বেঁধে রাখিতাম হিয়ে,
একটুকু হাসি কিনতাম তোর
শতেক চুম্বন দিয়ে।

শুধু সখীর মুখে হাসি ফুটিয়েই চপলা ক্ষান্ত হত না; সে অমিয়া-মাখানো মুরলার মুখখানি বুকের মধ্যে রেখে অনিমেষলোচনে চেয়ে

থাকত অনুক্ষণ। এইভাবে দুঃখ করে শেষে চপলা সখীর দুটি হাত ধরে জিজ্ঞাসা করল,— সখি কার তুমি ভালবাসা তরে

ভাবিছ অমন দিন রাত ধরে,

পায়ে পড়ি তব খুলে বল তাহা—

কি হবে রাখিয়া ঢাকি ?

সখীর এই প্রশ্নে মুরলা হৃদয়াবেগ আর সংবরণ করতে না পেরে বলে ওঠে,— ক্ষমা কর মোরে, সখি, সুধায়োনা আর।

মরমে লুকানো থাক মরমের ভার।

যে গোপন কথা, সখি সতত লুকায়ে রাখি

ইষ্টদেবমন্ত্র সম পূজি অনিবার

তাহা মানুষের কানে ঢালিতে যে লাগে প্রাণে—

লুকানো থাক তা, সখি হৃদয়ে আমার।

ভালবাসি, শুধায়োনা কারে ভালবাসি।

সে নাম কেমনে, সখি, কহিব প্রকাশি।

আমি তুচ্ছ হতে তুচ্ছ সে নাম যে অতি উচ্চ,

সে নাম যে নহে যোগ্য এই রসনার।

ক্ষুদ্র রই কুসুমটি পৃথিবী কাননে,

দিন দিন পূজা করি, শুকায়ে পড়ে সে ঝরি,

আজন্ম নীরব প্রেমে যায় প্রাণ তার—

তেমনি পূজিয়া তারে এ প্রাণ যাইবে হা রে,

তবুও লুকানো রবে এ কথা আমার।

মুরলার এই কথায় সখীর মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে অজানা আশঙ্কায়; সেই প্রণয়াস্পদের নামটি শুধু চপলা জানতে চায় সখীর মঙ্গলের জন্য, সেই নাম রসনার সাধের খেলনার মতো ; উলটে পালটে সেই নিয়ে রসনা কতই না খেলা করতে পারে। তাই চপলা সখীকে বলে,—

নাম যদি তার বলিস, তাহলে

তোরে আমি অবিরাম

শুনাব তাহারি নাম—
গানের মাঝারে সে নাম গাঁথিয়া
সদা গায় সেই গান।
ফুলের মালায় কুসুম আখরে
লিখি দিব সেই নাম—
গলায় পরিবি, মাথায় পরিবি,
তাহারি বলয় কাঁকন করিবি
হৃদয়-উপরে যতনে ধরিবি
নামের কুসুমাদাম।

এই নামের মাহাত্ম্য নিয়ে অনুরূপ একটি বিখ্যাত সুন্দর পদ আছে দ্বিজ চণ্ডীদাসের। রাধিকার কৃষ্ণদর্শন তখনও হয়নি; শুধু তিনি নাম শুনেছেন, তাতেই তিনি উন্মাদিনী। সখীকে রাধিকা বলেছেন,—

সখি কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে-পাইব সই তারে॥

রবীন্দ্রনাথের ভগ্নহৃদয়-এ চপলার উক্তিতে যে নাম মাহাত্ম্যের বর্ণনা উল্লিখিত হয়েছে, তাতে দেখা যায়, পদটির উপর যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে দ্বিজ চণ্ডীদাসের।

চপলা ও মুরলার কথোপকথনকালে হঠাৎ সেই বনে মুরলার প্রেমাস্পদ কবির আবির্ভাব হল। তিনি ভাবনাবিহ্বলা মুরলাকে দেখতে পেলেন বনদেবীর মতো। কবি জানতে চাইলেন, মুরলা কি প্রকৃতি কাছে উদার ভাষা শিখছে অথবা তটিনীর কলধ্বনিতে কোনো ছন্দের সন্ধান পেয়েছে? পরে কবি চপলাকে বললেন, সখি মুরলাকে

বনদেবীর মত সাজিয়ে দাও, তার এলোমেলো কেশপাশ লতাদিয়ে বেঁধে তৃণফুল দিয়ে অলক সাজিয়ে দাও; সপত্রপুষ্প দিয়ে তার বস্ত্রাঞ্চল গেঁথে দাও; হরিণ শিশু এসে সখীর পদতলে আশ্রয় করে পরম নিশ্চিন্ত হবে, আর সবিস্ময়ে সুকুমার গ্রীবাটি বাঁকিয়ে অবাক নয়নে তার দিকে চেয়ে থাকবে। আর—

আমি হয়ে ভাবে ভোর দেখিব মুখখানি তোর
কল্পনার ঘুমঘোর পশিবে পরাণে।
ভাবিব, সত্যই হবে বনদেবী আসি তবে
অধিষ্ঠান হইলেন কবির নয়ানে।

কবি ও মুরলার পরস্পরের প্রতি এই অনুরাগ বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবধারা থেকে গৃহীত। পরকীয়া প্রেমের কি যে জ্বালা তা যেমন রাধিকায় প্রকাশ, তেমনি ভগ্নহৃদয়ের নায়িকা মুরলাও সেই তীব্র দহন বুঝতে পেরেছে কবিকে ভালবেসে। পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের পরস্পরের ভালবাসা উভয়েরই নিকট বিদিত; কিন্তু ভগ্নহৃদয় এ কবি ও মুরলার প্রেম সুগভীর হলেও পরস্পরের নিকট অব্যক্ত সুতরাং এদের প্রেম অধিকতর জ্বালায়। তাই কবি তখন জিজ্ঞাসা করলেন মুরলাকে,—

প্রণয়বারির তরে তৃষায় আকুল
ম্রিয়মাণ হয়ে বুঝি পরেছে সে ফুল ?
পেয়েছ কি যুবা কোন মনের মতন ?
ভালবাসো, ভালবাসা করহ গ্রহণ—
তা হলে হৃদয় তব পাইবে জীবন নব,
উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসময় হেরিবে ভুবন।

নিজের প্রণয়াস্পদের মুখে এই কথা শুনে মুরলার হৃদয় হাহাকার করে বলে,— (স্বগত) বুঝিলেনা কবি গো এখনো

বুঝিলেনা এ প্রাণের কথা।
দেবতাগো বল দাও এ হৃদয়ে বল দাও।
পারি যেন লুকাতে এ ব্যথা।

কবি যে মুরলার প্রেম বুঝতে পারে না তার কারণস্বরূপ মুরলা মনে করে।

যে কবি তাকে এতটুকুও ভালবাসেন না। এই অভিমানে মুরলাও তার ব্যথা প্রকাশ না করে বলে—

তবে থাক থাক সব বুকে থাক গাঁথা—
বুক যদি ফেটে যায়—ভেঙ্গে যায়—চুরে যায়—
তবু রবে লুকানো এ কথা।
দেবতাগো বল দাও—এ হৃদয়ে বল দাও

পারি যেন লুকাতে এ ব্যথা।

বৈষ্ণবোক্ত পরকীয়া প্রেম রবীন্দ্রনাথের কাছে সমাদর পায় নি। অথচ প্রেমের গভীরতা যে রাধার মধ্যে দিয়েই সুপ্রকট তা রবীন্দ্রনাথের অগচর নয়। তিনি সুস্পষ্টভাবে চপলার মুখ দিয়েই তা প্রকাশ করেছেন। 'ব্যথা না পইলে সখি সুখেতে কি সুখ আছে?' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পরকীয়া প্রেমের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য নায়ক নায়িকার মধ্যে তা অব্যক্ত রেখেছেন। এতে প্রেমের বিশুদ্ধিতাও রক্ষিত হয়েছে, আবার তা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে পরমোৎকর্ষতা লাভ করেছে। পরস্পারের ভালবাসা জানতে পেরে কবি ও মুরলার মধ্যে যদি পরিণয় সম্পন্ন হত, তবে সে প্রেমের গাম্ভীর্য হত লুপ্ত। রাধার মধ্যেই যে প্রকৃত সুখোদয় তা তাতে হত না। কবি নলিনীকে ভালবাসে—একথা কবির মুখ থেকে শুনেও কবির প্রতি মুরলার প্রেম বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। বরং মুরলা বলেছে—

অন্তর্যামী দেবতা গো, শুন একবার,
যদি আমি ভালবাসি কবিরে আমার
কবি যেন সুখী হয়, নলিনী সে সুখে রয়—
সখারে আমার আমি ভালবাসি যত
নলিনীবালার যত আছে দুঃখ জ্বালা
সব যেন মোর হয়, সুখে থাক বালা!

তবে চলিলাম কবি, আমি চলিলাম—

মুরলা করিছে এই বিদায় প্রণাম।

মুরলা প্রান্তর দিয়ে চলেছে সন্ন্যাসিনীবেশে। পূর্বস্মৃতি তার ভেসে ওঠে মনে, আর মন ব্যাকুল হলেই সান্ত্বনা দেয় এই বলে—

যার কেহ নাই তার সব আছে,
সমস্ত জগৎ মুক্ত তার কাছে—
তারি তরে ওঠে রবি শশী তারা,
তারি তরে ফুটে কুসুম গাছে।
একটি যাহার নাহিক আলয়
সমস্ত জগৎ তাহারি ঘর,
একটি যাহার নাহি সখাসখী
কেহই তাহার নহেক পর।

হৃদয়ের সর্বস্ব ধন অন্যকে দিয়ে মুরলা এখন রিক্ত, অথচ মুক্ত। জনহীন প্রান্তর এখন তার কাছে নূতনভাবে দেখা দিয়েছে। এখানে কেউ কাউকে আদর করে না; কেউ কারোর কাছে ভালবাসা পায় না; এখানে সুখ-দুঃখের বালাই নেই—দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন চলে যাচ্ছে নীরব চরণে। পূর্বে যে জগতে মুরলা বাস করত, সেখানে ছিল কারও দুঃখ আবার কারোর বা অনন্ত সুখরাশি; কিন্তু এখন যে জগতে সে আসে সেখানে—

সকলেরই চায় সকলেরই মুখে
শুধাই না কেহ কথা—
নাইক আলয়, চলেছে সবলে
মন যায় যার সেথা।

মুরলার শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে, মৃত্যুর ছায়া সে দেখতে পায় অদূরে। এমন সময় তার মনে পড়ে কবির কথা, সখী চপলার কথা, আবার হাহাকার করতে থাকে তার মন, কবি হয়ত এতক্ষণ এসেছে কিন্তু তার জন্য বাতায়নে তো কেউ অপেক্ষা করছে না। তার পদ-

শব্দ শুনে কেউ তো দ্রুত দ্বার খুলে দিচ্ছে না তার জন্য কেউ তো মালা গাঁথছে না। হয়ত কবি ম্রিয়মান হয়ে বসে আছে, কথা বলার কেউ নেই। হয়ত অভাগা মুরলার জন্য তার হৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠেছে। এই সব ভাবনা মুরলাকে আকুল করে তোলে। সে নিজেকে বলে ওঠে—

হা নিষ্ঠুর মুরলা রে কেন ছেড়ে এলি তাঁরে
নিতান্ত একেলা ফেলি কবিরে আমার—
হয়ত রে তোর তরে প্রাণ কাঁদে তাঁর!
বড় স্বার্থপর তুই, নয় দুঃখে তোর
কাঁদিয়া কাটিয়া হত এ জীবন ভোর।

কিন্তু হঠাৎ আবার সন্ন্যাসিনী মুরলার সম্বিৎ ফিরে আসে। এসমস্ত চিন্তা তার কাছে আবার স্বপ্নময় মনে হয়। সে নিজেকে প্রবোধ দিয়ে বলে,—

কোথা কবি? কোন কবি? কে গো সে তোমার?
মাঝে মাঝে দেখিস রে একি স্বপ্ন মিছে!
স্বপনের অশ্রুজল ত্বরা ফেল মুছে।

মুরলা বুঝতে পারে তার জীবনের দিন ফুরিয়ে এসেছে; মৃত্যু তার বক্ষদেশ প্রসারিত করে আছে মুরলার জন্য। মুরলা স্পষ্ট অনুভব করে

এ সংসারে তোরে যদি কেহ ভালবাসে
সে কেবল ওই মৃত্যু—ওই রে আকাশে।
গুরুভার রক্তহীন হিম হস্তে তার
আলিঙ্গন করেছে সে হৃদয় তোমার!
হে মরণ! প্রিয়তম—স্বামী গো জীবন মম;
কবে আমাদের সেই সম্মিলন হবে?
জীবনের মৃত্যুশয্যা তেয়াগিব কবে?

ভাগ্য টেনে নিয়ে আসে কবিকে মুরলার কাছে জীবন সায়াহ্নে। মৃত্যুপথ-যাত্রী মুরলাকে দেখে কবির মন হাহাকার করে ওঠে। তিনি

নিজেকে আর স্থির রাখতে না পেরে উচ্ছসিত হয়ে বলেন

কি করেছি এত তুই হলি রে কঠোর ?
প্রাণ মোর, মন মোর, হৃদয়ের ধন মোর,
সমস্ত হৃদয় মোর, জগৎ আমার
একবার বল বালা, বল একবার
ছাড়িয়ে যাবিনে মোরে ফেলি এ সংসার ঘোরে,
নিতান্ত এ হৃদয়ের রাখি অসহায়।
আয়, সখি বুকে থাক, এই হেথা মাথা রাখ
হৃদয়ের রক্ত ফেটে বাহিরিতে চায়।
মুরলা এ বুক ত্যজিস নে আর
চিরদিন থাক্ সখি হৃদয়ে। আমার।

মুরলার মরুমন শীতল হয়ে যায় কবির প্রেমবারি বর্ষণে। মুরলা বলে সে অতি স্বার্থপর অতি নিষ্ঠুর। নইলে তার কবিকে সে ত্যাগ করে এসেছে। এমন স্নেহময় কবির হৃদয়েও সে আঘাত করতে পারে। একবার তো সে কবির হৃদয়ের কথা ভাবেনি, সে কেবল নিজের ভাবনা নিয়েই ব্যস্ত ছিল। মুরলা আর থাকতে না পেরে কবিকে বলে,

মার্জনা করিও, এই অপরাধ তার,
কবি মোর শেষ ভিক্ষা এই মুরলার।
এমন দুর্বল হৃদি, এত নীচ, হীন,
এমন পাষাণে গড়া, এতই সে দীন,
এ যে ছিল চিরকাল ধরে তব কাছে।
এ অপরাধের, কবি, মার্জনা কি আছে।
সখা, অপরাধ সারা অস্তিত্ব তাহার
মরণে করিবে আজি প্রায়শ্চিত্ত তার।...
ছি ছি সখা, কেঁদো নাকো, মুরলায় কথা রাখো
ও মুখে দেখিতে নারি অশ্রুবারিধার!

কবিও তাঁর হৃদয় খুলে দিলেন। যে প্রেমবারি এতদিন সংগোপনে

ছিল তা আজ সহস্রধারায় প্রবাহিত হল, কবি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন—এতদিন এত কাছে ছিনু এক ঠাঁই

মিলনের অবসর মোরা পাই নাই।

কে জানিত ভাগ্যে, সখী, ঘটিবে এমন

মরণের উপকূলে হইবে মিলন।

কবির এই কথায় মুরলার সুখের পরিসীমা রইল না; সে আর মরতে চায় না। এই মরণের দিন যদি ফুরিয়ে না যায়, যদি মরতে মরতেও বেঁচে থাকা যায় সেই প্রার্থনাই এখন মুরলার। প্রিয়তম কবিকে মুরলা এখন বলে যে সে এখন পরম সুখে একটু জল দেয়।' কবি বললেন, সখি আজ সত্যই আমাদের বিবাহ—

বিবাহ হইবে, সখি আজ আমাদের—

দারুণ বিরহ ওই আসিবার আগে, সই

অনন্ত মিলন হোক এই দুজনের।

আকাশেতে শত তারা চাহিয়া নিমেষহারা,

উহারা অনন্ত সাক্ষী রবে বিবাহের!

আজি এই দুটি প্রাণ হইল অভেদ,

মরণে সে জীবনের হবে না বিচ্ছেদ

হোক তবে, হোক সখি, বিবাহ সখের—

চিতার বাসরশয্যা হোক আমাদের!

মুরলা ফুল তুলে আনতে বলল। সেই ফুলরাশিতে চিতা-শয্যা আকুল হয়ে উঠবে কবে রজনীগন্ধার মালার প্রয়োজন জানিয়ে মুরলা বলল— রজনীগন্ধার মালা গাঁথ গো ত্বরায়,

সে মালা বদল করি দিও এ গলায়—

সেই মালা পরে আমি তোমার সমুখে স্বামী,

কবির শয়ন সুখের চিতায়!

সেই মালা পরে যেন দগ্ধ হয় কায়!

মুরলার সুখের তুলনা নেই সে আশাও করেছিল যে শেষ সময়ে

কবিকে স্বামী বলে চিরবিদায় নেবে। বিধাতা যে তার কপালে এত সুখ লিখেছেন তা স্বপ্নাতীত। তাই কবিকে সে বলল—

ওই যে এসেছে মালা—কবি গো ত্বরায়
পরায়ে দাওগো তাহা এ মোর গলায়
এই লও হাত মোর রাখ তব হাতে—
ছেলেবেলা হতে মোরে কত দয়া স্নেহ করে
রেখেছ এ হাত তব সাথে সাথে।
আবার মোদের যবে হইবে মিলন
এ হাত আমার কবি করিও গ্রহণ
যেথা যাবে সেথা, রব দুই জনে এক হব,
অনন্ত বাধনে রবে অনন্ত জীবন।

কবি মুরলার গলায় মালা পরিয়ে ও তাকে ফুলসাজে সাজিয়ে বললেন,—বিবাহ মোদের আজ হল এই তবে,

ফুল যেথা না শুকায় সদা ফুটে শোভা পায়
সেথায় আরেক দিন ফুলশয্যা হবে!

মৃত্যুর ঘোর অন্ধকার নেমে এল মুরলার চোখে। কবিকে অতি নিবিড় ভাবে কাছে নিয়ে মুরলা শেষ প্রার্থনা জানাল,

আজ তবে বিদায়, বিদায়।
স্বামী, প্রভু, কবি সখা আবার হইবে দেখা
আজ তবে বিদায় বিদায়।

গীতিকাব্যের ললিতা নামে অন্যতম নারীচরিত্রের কথা পূর্বে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা হয়েছে। ললিতার বিষয় একটু স্বতন্ত্র। সে অনিলকে বিয়ে করেছে, কিন্তু ভালবাসা রেখেছে অব্যক্ত। এইখানে মুরলার সঙ্গে তার ঐক্য। মুরলা ললিতা উভয়েই তাদের দয়িতকে ভালবাসে; কিন্তু তাদের প্রেমাস্পদ কবি বা অনিল তা বুঝতে পারে না। ফলে নলিনী নামে অপর এক চঞ্চলা নারীর রূপ-মোহে পড়ে কবি ও অনিল উভয়েই বিভ্রান্ত। নলিনীর স্বভাব হল অন্যের হৃদয়

নিয়ে খেলা ; শেষে তাকেও অনুতপ্ত হতে হয় ; অর্থাৎ যারা তাকে ভালবাসত তারা দূরে সরে যায় তাই নলিনী অপেক্ষা করে বলেছে—

হা অদৃষ্ট, কাল মোরে হেরিয়া যে জন
নলিনী নলিনী বলি হত অচেতন,
নিমেষ ভুলিত না আঁখি, পুরিত না আশ—
আমার সৌন্দর্যরাশি করিত যে গ্রাস,
মোর রাঙ্গা চরণের ধূলি লইবার
হৃদয়ের একমাত্র সাধ ছিল যার,
ধূলিতে যে পদচিহ্ন করিত চুম্বন,
মুখ ফিরয়া আজ গেল সেই জন।

রবীন্দ্রনাথ এই ভাবটি নিয়াছেন বিখ্যাত পদকর্তা গোবিন্দদাসের নিম্নোক্ত পদ থেকে,— একলা যাইতে যমুনা ঘাটে

পদচিহ্ন মোর দেখিয়া বাটে
প্রতি পদচিহ্ন চুম্বয়ে কান,
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ।

উপরি উক্ত আলোচনায় দেখা যায়, ভগ্নহৃদয় গীতিকাব্যখানির উপর বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব বিদ্যমান। পরকীয়া প্রেমই হচ্ছে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধানতম বিষয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিকাব্যে যে পরকীয়া প্রেমের পরিচয় দিয়েছেন, তা বৈষ্ণবোক্ত পরকীয়া প্রেমের পরিচয় দিয়েছেন, তা বৈষ্ণবোক্ত পরকীয়া প্রেমের অনুরূপ হলেও স্বতন্ত্রতা-বিশিষ্ট। রাধা কৃষ্ণ উভয়ে উভয়কে ভালবাসে। এই ভালবাসার মধ্যে পূর্বরাগ, অনুরাগ, মিলন, নাম, আক্ষেপ ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায় ; পক্ষান্তরে ভগ্নহৃদয়ে এ-সমস্ত রসপর্যায় থাকলেও প্রধান চরিত্র কবি ও মুরলার মধ্যে মিলন সংঘটিত হয়নি, কিন্তু অপ্রধান চরিত্র অনিল ও ললিতার পরিশেষে মিলন প্রণয় হয়েছে মাথুরবিরহান্তে রাধাকৃষ্ণ মিলনের অনুরূপেই। রাধিকার প্রণয় লাভান্তে কৃষ্ণ মথুরায় চলে গিয়ে অন্যাসক্ত হয়ে দীর্ঘদিন রাধাকে ভুলে থাকলে রাধা ললিতারই মতো প্রাণবিসর্জনে

কৃতসংকল্প হয়। দূতী তার এই দশা মথুরায় গিয়ে কৃষ্ণকে জানাইলেই কৃষ্ণ বৃন্দাবনে ফিরে আসেন এবং আবার রাধাকৃষ্ণের মিলন হয়।

অনিল ও ললিতার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ললিতার অকৃত্রিম নীরব প্রেম বুঝতে না পেরে অনিল নলিনীর রূপমোহে পড়ে, কিন্তু পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে ললিতারই পাশে এসে দাঁড়ায়; তখন ললিতাও রাধার মতো মরণে কৃত নিশ্চয় হয়েছিল; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অনিল ও ললিতার মিলন-সংঘটন করিয়া তাদের সংসারী করেছেন, কারণ তারা বিবাহিত। মুহূর্তের ভ্রমবশতঃ তাদের সাময়িক বিচ্ছেদ হয়েছিল; কিন্তু সংশোধনের পর তাদেব মধ্যে মিলনের আর বাধা রইল না। বলা বাহুল্য সমাজনীতি৭ এক্ষেত্রে লঙ্ঘিত হয়নি। কিন্তু কবি ও মুরলার মিল ঘটাননি রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কারণবশতঃ। পরকীয়া প্রেমকে স্বীকার করলেও রবীন্দ্রনাথ সমাজের রীতি ও আদর্শকে কখনও ত্যাগ করেন নি। রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেমের মধ্যে বিশুদ্ধি থাকলেও সমাজনীতি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ তার প্রশ্রয় দেননি। সুতরাং সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করে কবি ও মুরলার মিলন ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ চিন্তা করেছেন। অসংযমহেতু কামনা ও রূপে যে মোহ আসে তা কল্যাণকে সৃষ্টি করে না। এ-বিষয় নিয়ে কবিগুরু প্রাচীন সাহিত্য-গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। শকুন্তলার প্রতি দুর্বাসার অভিশাপ ও কুমারসম্ভবের মদনভস্ম ব্যাপারে ঐ কারণই রয়েছে। তবে মৃত্যু-শয্যায় যে কবি ও মুরলার মিলন দেখা যায় তা নিতান্তই পারত্রিক, মরজগতে এ ব্যবস্থার অবকাশ রবীন্দ্রনাথ রাখেননি। এতে তেমন অকৃত্রিম প্রেম রক্ষিত হয়েছে, তেমনি সমাজনীতিও আদর্শচ্যুত হয়নি। এই কারণেই বলা হয়েছে, ভগ্নহৃদয় এ যে প্রেমের অভিব্যক্তি আছে তা রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট পরকীযা প্রেম।

ভারতবর্ষ। ১৩৭৬

রবীন্দ্র প্রতিভা

গোপাল ভট্টাচার্য

"ধন্য কবি, কাব্যলোকে ছত্রপতি, ধন্য তুমি,
ধন্য তুমি, ধন্য তোমার জননী ও জন্মভূমি !
বঙ্গভূমি ধন্য তোমায় ধরি অঙ্গে করি,
ধন্য ভারত ধন্য জগৎ ভাব জগতের নিত্য রবি ।
পূণ্যে তব পুষ্ট আজি বাল্মিকী ও ব্যাসের ধারা,
বিশ্ব কবি সভায় ওগো বাজাও বীণা—
হাজার তারা—"

সত্যেন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে বাংলা দেশ তথা সমগ্র ভারত আজ গর্বিত। তাঁর প্রতিভা বহুমুখী। তিনি একজন সার্থকনামা কবি। জ্যোতির্ময় রবির মতই চির ভাস্বর তাহার সাহিত্য প্রতিভা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রতিভা সম্পূর্ণ বলিষ্ঠ।

কোন এক বইতে তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কোন লেখক কবির পদযাত্রা প্রসঙ্গে একস্থানে এক তেলেগু ভদ্রলোকের বক্তব্য দিয়েই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথকে সবাই ভালবাসতেন তিনি ছিলেন সবার প্রিয়। লেখকের ভাষায় বলি—'রাত্রি নটার দিকে আমরা বেজওয়াড়ায় এলুম। সেখানেও খুব লোক সমাগম। তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) কামরা অন্ধকার করে দেওয়া হয়েছিল তা সত্বেও লোকে তাঁকে খুঁজে বার করলে আলো জ্বালিয়ে তাঁকে দর্শন দেওয়াতে হলো। প্রৌঢ় বয়সের একটি তেলেগু ভদ্রলোক ইংরাজীতে বক্তৃতা শুরু করেছিলেন—'আমরা শেক্সপীয়র পড়েছি কিন্তু আপনাকে পেয়ে আমাদের ক্ষোভ নেই, আমরা ঢের বড় কবি পেয়েছি'

কবি সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন—

জগৎ সভায় মোরা তোমার করি গর্ব।

বাঙালা আজ গানের রাজা বাঙালী নয় খর্ব

কবি শুধু অজস্র কবিতা রচনা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তিনি অনেক গান রচনা করে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির পথ সুগম করে দিয়েছিলেন। এই সমস্ত গানই বিশিষ্ট সঙ্গীত ধারা বলে সুগঠিত। এই সঙ্গীতগুলি 'রবীন্দ্র সঙ্গীত'। কবি গান লিখেই ক্ষান্ত হননি, তিনি ছিলেন একজন নামী সুগায়ক। দেশের ডাকে চারণের মত দেশমাতৃকার বন্দনা করেন—

'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক—

জগৎ জনের শ্রবণ জুড়াক।'

তিনি ভারতীয় সাধনার বাণী—আপন অন্তরের সঙ্গে গ্রথিত করে বলেছিলেন—

'শোনরে—ঐক্যের ডাক'···নব সভ্যতার সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় কবি শঙ্কিত হয়ে দেশমাতার বক্ষে ফিরে যাবার নিমিত্ত বলেছিলেন—

···দাও ফিরে অরণ্য, লহ এ নগর। জালিওয়ানাবাগের ভীষণ হত্যাকাণ্ডের ফলে মনে তাঁর যে আঘাত লেগেছিল তাতে তিনি স্যার উপাধি ত্যাগ করেছিলেন।

ছোট গল্প রচনায় রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য রচনা শৈলীর স্বাক্ষর বহন করে তাঁর 'কাবুলিওয়ালা', 'মণিহার', 'পোষ্টমাষ্টার' প্রভৃতি বিশেষ স্মরণযোগ্য সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথের অন্তর ছিল নির্মল. তিনি ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারী। তিনি অন্তরে ছিলেন শিশু। তাই শিশুদের মর্মব্যথা এত মর্মে-মর্মে বুঝেছিলেন। তিনি শিশুদের জন্য কি অপূর্ব্ব কথাই লিখে গিয়েছেন 'কথা ও কাহিনীতে, 'শিশু, ডাকঘর, শিশু ভোলানাথ' বইগুলিতে তিনি যে পরিচয় দিয়েছেন তার সঙ্গে জগতের কোন সাহিত্যে তার সমতুল জিনিস পাওয়া কঠিন।

এক সময় গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলে সম্বোধন জানিয়ে